শারদীয়
সংখ্যা
১৩৮৭

খাল-বিল-নদীর ভরা যৌবন।
শিশিরে ভেজা মাটিতে এখন পুজোর গন্ধ।
কাঠামো, খড়, মাটি ও ছাঁচ।
তার উপর তুলির রঙে আর ঘামে অপরূপ প্রতিমা।
তার বোধনের আর কত দেরী ?
কলকাতাও এমনি এক অপরূপ প্রতিমা।
তিলে তিলে গড়ে উঠেছে এই তিলোত্তমা।
তার চাল-চিত্র রচনায় আমরা দিন-রাত ব্যস্ত।
বোধনের আর দেরী নেই।

মেট্রো রেলওয়ে

সকল কাজে সকল সাজে

তন্তুজ

বাংলার তাঁতের কাপড়

সঠিক মাপ : পাকারঙ : নিখুঁত বুনন : সর্বাধুনিক রুচিসম্মত
ও তুলনামূলক দামে সস্তা

প্রধান কার্যালয় :
৬৭, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০ ০৪
ফোন : ৫৫-৩৬৫৮

নগর কার্যালয় :
৪৫, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০ ৭২
ফোন : ২৭-৮০১২

তন্তুজ দোকানে 'জনতা' শাড়ী পাওয়া যায়।

দর্পণ

শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৭

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

[illegible] / অশোক মিত্র ৫

[illegible] হবে ? / [illegible] ৯

[illegible] / [illegible] ২১

প্রসঙ্গ : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ / [illegible] সেন ১১৪

[illegible] / [illegible] ঘোষ ১২৪

বাংলা ছবি [illegible] / [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪২

[illegible] উদ্দেশে / [illegible] ১৪৮

কবিতা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৭ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮ পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] [illegible] গঙ্গোপাধ্যায় ৮ [illegible] ১৭ [illegible] ১৭ [illegible] চক্রবর্তী ১৮ [illegible] চৌধুরী ১৯ [illegible] মুখোপাধ্যায় ১৯ [illegible] বসু ২০ [illegible] চট্টোপাধ্যায় ২০ [illegible] মিত্র ২০

উপন্যাস

[illegible] / [illegible] ২৩

ছোটগল্প

[illegible] / [illegible] ঘোষাল ১৬১

মা / মিহির আচার্য ১৩২

সংস্কৃতি সংরক্ষণ বিভাগ / সিদ্ধার্থ ঘোষ ১৩৮

প্রেতপাখি / অশোককুমার সেনগুপ্ত ১৪৫

প্রচ্ছদপট : নিতাই দে ● **অলঙ্করণ :** নিতাই দে / [illegible]

সম্পাদক : হীরেন বসু

সম্পাদক কর্তৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬২, [illegible] লেন, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

জিনিসপত্রের দাম কমানোর জন্য

যত দিন যাচ্ছে বাজারে জিনিসপত্রের দাম নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করাই এখন দুরূহ কাজ। প্রতিদিনই সব কিছুর দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এই তো আমাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। এর কি কোনই প্রতিকার নেই?

খাদ্যশস্য, চিনি, তেল, কেরোসিন, ডিজেল, সার, কয়লা, কাপড় ইত্যাদি ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেঁধে দিয়ে সেগুলি সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা কি একেবারেই সম্ভব নয়? আমরা মনে করি সম্ভব। একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই এই দায়িত্ব নিতে পারেন। এই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই নির্ধারণ করতে পারেন। কারণ রাজ্য সরকারের হাতে বিদেশ থেকে কোন কিছু আমদানি করার ক্ষমতা নেই—এমনকি কেন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া অন্য রাজ্য থেকে তাঁরা কোন কিছু কিনতেও পারেন না। কাজেই সারা দেশ জুড়ে এ ধরনের বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ব মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের। একমাত্র তাঁরাই দেশের যেখানে যে জিনিস পাওয়া যায় কিনে যেখানে প্রয়োজন সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারেন। কারণ এর জন্যে যে বিরাট সম্পদ ও বিশাল পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন—সে সবই তো তাঁদের হাতেই। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই দায়িত্ব পালন করে রাজ্যে রাজ্যে জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, রাজ্য সরকারগুলির তখন দায়িত্ব হবে সেইসব জিনিস সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। একমাত্র এইভাবেই মজুতদার, মুনাফাখোর ও চোরাকারবারীদের জব্দ করা সম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

P29653

আই-পি এ ১৮ ৯২১/৮০

মন্ত্রিমণ্ডল না, যন্ত্রপুতুলমণ্ডল না

অশোক মিত্র

১৯৭৭ সালে লোকসভার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন, হেরে গিয়েছিলেন। ১৯৮০ সালেও দাঁড়িয়েছিলেন, ফের প্রায় সত্তর হাজার ভোটে হেরেছেন। কিন্তু তা'তে কী হয়, কেন্দ্রে পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন, এখন জোর কদমে মন্ত্রিত্ব করে যাচ্ছেন। বলা হচ্ছে, উনি নির্বাচনে হেরে গেছেন তাতে কী হয়েছে, ১৯৮১ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত রাজ্যসভার সদস্য তো আছেন, মন্ত্রী হতে তাই বাধা নেই।

বাধা নেই? জনসাধারণের তাঁর প্রতি আস্থা নেই, সেই আস্থাহীনতার কথা পর-পর দু'বার স্পষ্ট ক'রে ঘোষণা করা হলো, তবু তিনি মন্ত্রী থাকবেন, তাঁকে মন্ত্রী করা হবে? আমাদের নাকি গণতন্ত্র, তা'হলেও তাঁকে মন্ত্রী করা হবে? এটা ব্যাকরণের ব্যাপার নয়, যেহেতু তিনি এখনো রাজ্যসভার সদস্য আছেন সাংবিধানিক ব্যাকরণ অশুদ্ধ হয়নি এই যুক্তি অসার। ব্যাকরণ বাঁচিয়েও পৃথিবীতে কতগুলি আচার-আচরণের প্রশ্ন থাকে, বিবেকবোধের প্রশ্ন থাকে। মানুষ আমাকে চাইছে না, আমার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করেছে, এ-অবস্থায় আমাকে মন্ত্রী করা, আমার মন্ত্রী হতে রাজি হওয়া ঘোরতর পাপকাজ হবে; এই চেতনা তো ছুঁচ ফুটিয়ে অনুপ্রবেশ করানোর ব্যাপার নয়।

জাতি হিসেবে গেলো কয়েক বছরে আমাদের কোথায় টেনে নামানো হয়েছে তার নজির এটা।

কেন্দ্রের আরো এক পূর্ণ মন্ত্রীর কথা ধরি। সমস্ত নিয়ম-কানুন বিসর্জন দিয়ে, যেহেতু তিনি উপস্থিত মুহূর্তে কয়লা দপ্তরের দাপিয়ে, নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রের চেনা-জানা ঠিকাদার উপর লোকের হাতে কয়লার লাইসেন্স দিয়েছেন, লাইসেন্স প্রাপকদের তালিকা'য় এমনকি দু'বছরের বালকের নামও আছে। কয়লা কিন্তু ঐ কেন্দ্রে মানুষ এক-আধ টনও দেখতে পেলেন না, সেসব লাইসেন্স নিয়ে কোটি-কোটি টাকার বেচা হলো, বেশ-কিছু কয়লা এমনকি সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত চলে গেলো। লোকসভায় মুখোমুখি তথ্য দিয়ে এ সমস্ত অভিযোগ পেশ করা হলো, মন্ত্রী ব'সে-ব'সে নির্বাক শুনলেন, সরকার পক্ষ

থেকে একটি অভিযোগও খণ্ডন করা হলো না, মন্ত্রী নিজে জবাব দিতে উঠলেন না পর্যন্ত। অবশেষে আইন মন্ত্রী—অন্য কোনো মন্ত্রী না, খোদ আইন মন্ত্রী, যিনি নাকি দেশের নিয়মনীতির প্রধান রক্ষাকর্তা—উঠে দাঁড়ালেন পাইকের নির্লজ্জ পেশায় দিয়ে প্রস্তাব ধরার চাপতে গেলে একদম সদাচার অগ্রাহ্য করতেই হয়।

প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলবেন না, আইন মন্ত্রী বরখাস্ত দাবি করবেন: মন্ত্রীরা রাজনৈতিক স্বার্থে একটু-আধটু দুরাচারে অবশ্যই লিপ্ত হ'তে পারেন, তাতে নাকি বিচার কিছু নেই।

দেশটাকে রাহু কবলে বলতে কোথায় টেনে নামানো হচ্ছে।

অতএব যোগাযোগ দিয়ে লাভ নেই। নীতিহীনতার শুরু তো একেবারে উপর থেকে। ইন্দিরা গান্ধি যেহেতু লোকসভায় নির্বাচনে জিতে একরকম তো প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন, যাবতীয় কোর্টকাছারি নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি অবধি ওদের তাঁর ব'লে তো মিথ্যে হবার নয়। ইন্দিরা গান্ধি একটি মধ্যযুগীয়, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এই বিশ শতকের শেষ পর্বে এসে কায়েম ক'রে যেতে চাইছেন। তিনি মহারাণী, সর্বশক্তিসম্পন্না সম্রাজ্ঞী, তিনি এবং তাঁর পরিবারের সবাই সকল নিয়মনীতির ঊর্ধ্বে। সরকারি কোষাগারের পয়সাকড়ি তাঁর ছেলে যথেচ্ছ ব্যবহার করবেন, সব বিধিনিষেধ ভঙ্গ ক'রে তাঁর ছেলের কারখানার জন্য নামমাত্র মূল্যে সরকারি জমি পাইয়ে দেওয়া হবে, সরকারি অর্থ প্রতিষ্ঠান থেকে সহজ শর্তে ঋণ পাইয়ে দেওয়া হবে, অন্য-সকলের দাবিদাওয়া তুচ্ছ ক'রে সবচেয়ে আগে সরকারি কারখানা থেকে সে-ছেলেকে ইস্পাত পাইয়ে দিতে হবে, সে-গাড়ির সরকারি প্রত্যয়ন যদিও পরীক্ষাদি অসম্পূর্ণ, যেহেতু সে রাজপুত্রের তৈরি গাড়ি, তাকে মঞ্জুরি দিতেই হবে। মধ্যযুগে এ-সবই হতো, মহারাণী-রাজপুত্র তখন সমস্ত নিয়মনীতির ঊর্ধ্বে, তাঁরা যেমনখুশিমতো যা কিছু করতে পারতেন, যা ইচ্ছে করতেনও তাই, সে-আচরণ থেকে স্বেচ্ছাচার কথাটির উদ্ভব। আমাদের নাকি গণতন্ত্র, এটা নাকি বিশ শতকের অন্তিমবর্তী কাল। ইন্দিরা গান্ধি এই পরিবেশেও কিন্তু দ্বিধা মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারকে, কী অম্লান বিবেকবিহীনতার সঙ্গে, প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন।

যেখানে রাষ্ট্রের যিনি প্রধান, নীতিহীনতা, সর্ববিবেকবিসর্জন যৌবন সূত্র হিসেবে গ্রহণ করে নেন, সেখানে মন্ত্রীপারিষদরাও একই পাঠের পথিক হবেন। রাজা যথা, রাজকর্মচারী অতএব তাই। ললিতনারায়ণ মিশ্র যেন বলি আমরা, সেই দেশকে কোথায় টেনে নামিয়েছেন ইন্দিরা গান্ধি।

রাহু কবলে বছরের মধ্যে।

যেখানে প্রধানমন্ত্রী নিজে নীতিহীন-চরিত্রহীন, কোন্ নীতি শেখানো আমাদের সন্তানসন্ততিদের? আমাদের ছেলেমেয়েরা পাওয়া হয়ে যাবেনা, বিবেকানন্দের সেই গান—নিজেকে বেশ, দুঃখ নাই, আবার তোমা মানুষ হ'—সেই মন্ত্রকে প্রত্যাবর্তন করতে হ'লে তো সবচেয়ে আগে নীতিহীনতার প্রধান উৎস যেখানে, আক্রমণ সেখানে সংহত করতে হয়।

যান্ত্রিক বন্দি? অথবা কুৎসা বন্দি? রাজপুত্রের উড়োজাহাজ চালানোর সমস্ত নিয়মনীতি লঙ্ঘন ক'রে আকাশে খেলে বেড়া-বার কসরৎ দেখাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন। তার পরের ক'দিনের দৈনিক পত্রিকাগুলো যদি কেউ ঘাঁটেন, দেখিও টেলিভিশনে এমন শোকের সমারোহ, যেন মহাত্মা গান্ধির চেয়ে ও বড়ো কেউ গত হয়েছেন। সরকারি খাতে কাগজে-কাগজে বিশেষ ক্রোড়পত্র বার করা হয়েছে। যাতে বেহাতি লোকদের কোনোক্রমে রাজধানীতে শোক-মিছিলে জড়ো করানো যায়। সরকারি উদ্যোগে কোটি টাকা ব্যয়ে শোভাযাত্রা, শবদেহের সামনে সমস্ত বিভাগের মহারথীদের অভ্যর্থিত ভূমিকা, জাতীয় নেতাদের সমাহিতির জন্য সংরক্ষিত পরিসরে রাজপুত্রের দাহের ব্যবস্থা। এক রাজপুত্র গেলেন, এখন আবার অন্য রাজপুত্র হবে উত্তরাধিকারে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ চলছে। মধ্যযুগে এ-সব কিছুই বেমানান হতো না, মধ্যযুগে রাজা-রাজড়ারা প্রকাশ্যে চুরি করতেন, খুন করতেন, ধর্ষণ করতেন, জনসাধারণ ভয়ে কুঁকড়ে থাকতো। ইন্দিরা গান্ধি মধ্যযুগকে ফের নিয়ে আসতে চাইছেন, নীতিহীনতাকে মর্যাদা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন।

আমরা ভয়ে কুঁকড়ে থাকবো? অথবা কয়েকের হাতে রাষ্ট্রের অধিকার অর্পণ ক'রে গুহায় মুখ লুকোবো? সমস্ত দেশের আকাশ, সেকথা বলতে ব'লে ব্রহ্মচারী বেশে পরিক্রমা যাবো?

মহারাণী যদি সেরকম ধারণা ক'রে থাকেন, মস্ত ভুল করবেন তিনি।

এই দেশটা শ্রমজীবী কর্মজীবী মধ্য-জীবনের-স্বপ্ন দেখেন যাঁরা, সংসারে বেঁচে-থাকতে চান যাঁরা, লোকদের উপায়ে একটি সুস্থ-নিরাপদ সমাজে পৌঁছতে চান যাঁরা, সেই সাধারণ মানুষের। কতিপয় চোরের হাতে তাঁরা দেশটাকে ছেড়ে দেবেন না।

কণ্ঠে এই প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হবে দেশে-বাজারে-গঞ্জে-গ্রামে-গ্রামে সর্বত্র। আমাদের স্বাধীন মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকবার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। মহারাণীও না, রাজপুত্রও না।

চোখ এঁকে দিই আয়

সমীর রায়

বরেণ পাল। তুমিতো ঠাকুর বানাও, চোখ আঁকো
নানারকম নিজের চোখ কোথা অবহেলে দিয়ে
আরতি দিতে দিতে
একসময়ে ক্ষীণ হাতে রঙ তুলি দিয়ে।
তুমিতো চোখ দিয়ে চোখ আঁকো বরেণ পাল।
তুমি যাকে আঁকো, বুকে শেকড় গাড়া মানুষ তাকে পূজো করে।
বিসর্জনের বাজির পরে জলে ধুয়ে যায় তোমার ভালবাসা,
তোমার আরতি, তোমার রঙ, তোমার চোখ।

কয়েক হাজার টাকায় তুই খুশি বরেণ, খুশি।

আমার ছোট্ট ছেলেটা জোনাকি চায়, স্কুলে ব'লে জোনাকি চায়।
আমি হাসি। বাবাটা জানে যে তোর পায়ের তলে মাটি কাঁপবে জোরে,
সারাজীবন তব তোকে যে স্কুলেতে হবে সোনা
এখন না হয় বিছানায় মাইরা দিদি
কান্না থামা, কান্না থামা।
আমি তোর চোখ এঁকে দিই আয়—
আর হাতে কুরুক্ষু মিশেল চোখ প্রদীপের মত পুড়িয়ে
তোর চোখ এঁকে দিই।

যারা যখন বাঁ হাতে আকাশের সমস্ত তারাগুলোকে সরিয়ে রেখে
যখন পায়ের নিচে জোনাকিগুলো মাটি ছুঁবে
যখন তুই যে চোখ দিয়ে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে বুড়ো আঙুলে
সাপটে ধরবি মাটি
সেই চোখ এঁকে দিই আয়।
শ্রাবণ জলা দিয়ে নদের বুকে যখন বাড়ুলে হাতের আমন
তখন পায়ের হাঁটু অবধি মাটিতে ডুবিয়ে
যেমনি ছুরাতে ধন আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে
পায়ের গেঞ্জিটা খুলে দেবতাদের বসবি,
খুলে দিলাম এই আমার বুক
দেখে যা ভালোবাসা কোথায় থাকে
দেখে যা দুঃখ কোথায় থাকে
দেখে যা তোদের নীলের চাবুক কোথায় হারিয়ে যায়।
সেই চোখ এঁকে দিই আয়।

পৃথিবীর সব শিশুদের যেমনার কেমন ভালোবাসা পরিচয় রেখে
তুই যে চোখে, 'চোখ গেলো' পাখীদের দাবদা দিদি চাইতাম
যে চোখ পৃথিবীতে খুঁজেছে আলোকে
অন্ধ আর মৃত্যুর মাঝখানে আশ্রয়ের গান
সেই চোখ এঁকে দিই আজ।

হরেন পাল। হরেন, তুমি তোমার মরার আগেই চিতায় চড়ে আছো!
যতদিন পারিস ঠাকুর এঁকে, ছবি এঁকে টাকা চড়ে সে।
হরেন, এখনও তোমার নাম কুকুর চেনে না!

আর আমরা চাষ দিয়াছের পাশাপাশি, সারা গায়ে আগুন
তোমারকাটা হাতে কটা আমা হাত পায়ের দিকে পড়ে!

হরেন, তোর ছবির দাম কত সব জনার
টাকা চাই, লাবণি চাই, প্রেমের পাশে আর চাবুক।
এ কী মেয়ের রেখাচিত্রে যেমনি করে ছিঁড়ে ফেলে বিকিকিনির বাজা
তার হরেন, তোর ছবিটা অমনি করে ফেলে যাবে
কতক টাকার বাজার দিয়ে কেনা!

হরেন, ছুটেছে ঘাস, ছুটেছে ঘাস বনের সব ঘোড়া
আমিই আরো দিনঃ—

উড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে যেন শহর কলকাতাঃ—।

হরেন, সেখানে তুই ডুবে মরিস, পারাবে দিয়ে যাবের পায়ে আলতা!

শুধু চলে যাওয়া

অভীক গঙ্গোপাধ্যায়

সরে যাবনি তো আবার দিনের বেলা
বুকে কেবল ছেঁড়া সবুজ পাতার কথা কয় কত বিষণ্ণতা
সরে যাবনি তো
সবুজ রুক্ষতা—ফিকে আঁধারে জ্বালানো গান—পোকা ঝিমঝিম সময়।
এই দিন কাটে আবার দিনের বেলায়
বুকের সবুজ পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে। এই বড় দিন গাছের মতো
সবুজ তুমি দুহাতের এক ভাইতে রাখতে না পেরে
তাকে দাও সবাই অন্ধকারের অভিমুখে
জীবনের প্রতি ভালোবাসার অক্ষরগুলো অনেক বড়, যেমন,
আর বুকের ভেতর বড় এক আকাশ জেগে বলে ওঠে : এসো, জেগে থা।
জীবন তো শুধু জীবনের প্রেমে
আঁধার জানিয়ে জীবন জ্বলা
জীবন তো শুধু জীবনের প্রেমে
নিজেকে জানিয়ে শুধু চলে যাওয়া।

বিপ্লব কবে হবে?

রণেন নাগ

পরিচিত কোন কোন প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবী প্রায়ই প্রশ্ন করেন, ভারতে কি কোনদিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে? যদি হয় তাহলে কবে? কতদূরে সেই স্বর্ণযুগের সম্ভাবনা? তাঁরা যেন বলতে চান, নতুন যুগের, নতুন উষার স্বর্ণ আভা, "দুনিয়ে বিপ্লব কত দূর?" অন্তঃকোণে সাধারণ আমি, আমার জানা নেই। তবু আমি বিশ্বাস করি ভারতীয় জাতি শোষণের শৃঙ্খল চূর্ণ করে মুক্ত জীবনের প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবেন, শোষণহীন সমাজ, উন্নত সংস্কৃতি আর শোষণহীন ভবিষ্যত অবশ্যই সৃষ্টি করবেন। আপনি, আমি বেঁচে থাকতে না পারি, কিন্তু ভারতীয় মহাজাতি অমর। সুতরাং ব্যক্তি জীবনের দুই আনা মিয়াদের মাপকাঠি দিয়ে একটা জাতির ভবিষ্যত পরিমাপ ও নির্ণয় করা যায় বলে আমাদের বিশ্বাস নেই। প্রখ্যাত মহানায়ক হো চি মিন বলেছিলেন দশ এমন কি হাজার বছর, ভিয়েতনামের জনগণ যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন এবং অবশেষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের পরাজিত করে জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন। এই অটল বিশ্বাস ও কর্তব্য মাত্র আট ত্রিশ বছরের মধ্যেই চূড়ান্ত জয় অর্জন করেছে। ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের কাজে উত্তীর্ণ হয়েছে।

সুতরাং কবে বিপ্লব হবে তা কেউ বলতে পারে না। কবে কে জন্ম নেবে, কবে কার মৃত্যু হবে, কেউ জানে না। শুধু আমরা জন্ম ও মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতাকে মেনে নিই, বিশ্বাস করি এবং তার জন্যে সারা জীবন সংগ্রাম করি। মৃত্যু হবে এই বলে জীবন সংগ্রাম বন্ধ থাকে না।

বিপ্লব এক বিস্ময়কর ঘটনা। বিপ্লব মানে সামাজিক ব্যবস্থার সমূল পরিবর্তন। তা এক দিনে হয় না। এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা দখল করাই বিপ্লবের প্রথম লক্ষ্য। প্রতিবিপ্লবের একই লক্ষ্য। সুতরাং যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, শ্রেণী সংগ্রাম, হিংসা এই বহিঃপ্রকাশগুলি বিপ্লবের মত প্রতিবিপ্লবেও দেখা যায়। তা দেখেই কোনটা বিপ্লব কোনটা প্রতিবিপ্লব নির্ধারণ করা চলে না। বিদ্রোহ মানেই বিপ্লব নয়। তাহলে বিপ্লবের সংজ্ঞা কি হবে?

ইতিহাসের গতিধারায়

আমাদের তাহলে পেছনে তাকাতে হবে। এই দিকে কয়েকটি ঐতিহাসিক সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে। আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, বুর্জোয়া শাসিত সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ এই প্রধান পাঁচটি সমাজব্যবস্থার ক্রমিক বিকাশ ও পরিণতি আমরা লক্ষ্য করেছি।

এই পরিবর্তনগুলির মূল ধারা লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব, বেঁচে থাকার জন্যে মানুষ যে উৎপাদন কার্যে লিপ্ত হয়, সমস্ত পরিবর্তনের আসল চাবিকাঠি সেই উৎপাদনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিহিত। যেমন আদিম সাম্যবাদী সমাজে শ্রম উৎপাদনের চাইতে বেশী করতে হয়। অনেক খেটে খুটে একটা ডুমুর কি পাবার, একটা হরিণ বা একটা পাখী যে দুটি পাওয়া যেত। তখন শ্রম > উৎপাদন অঙ্কের হিসেব এভাবে বলা যায়। পরবর্তী কালে মানুষ কিছুটা উন্নত হল, পশুপালন শিখল, তখন যতটুকু শ্রম ততটুকু উৎপাদন। অর্থাৎ শ্রম = উৎপাদন। তখনো শ্রেণী সমাজের উদ্ভব ঘটে নি কারণ শ্রম ও উৎপাদন সমান সমান হওয়ায় কোন উদ্বৃত্ত শ্রম শোষণ করার মত শ্রেণীর উদ্ভব হয় নি। তারও অনেক পরে মানুষ কৃষি ও পশুপালন, চাকা ও তীর ধনুক আবিষ্কার করল, তাকে দিয়ে বাড়তি ফসল, তীর ধনুক ও অন্যান্য হাতিয়ার দিয়ে শিকার করার মত ক্ষমতা সৃষ্টি হল। এই পর্যায়েই শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল। কারণ সমাজ বিকাশের এই স্তরে শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছে এবং শ্রমের চাইতে উৎপাদন বেশী হচ্ছে। এই সময় যারা শ্রমের উপকরণগুলি দখল করে নিতে পেরেছে তারা এক শ্রেণী এবং যারা ঐ উপকরণগুলির সাহায্যে শ্রম বিনিয়োগ করে উৎপাদন করে তারা অন্য শ্রেণী। এই শ্রেণীগুলির মধ্যে অনেক ভেদ থাকে, কিন্তু মূল পরস্পর বিরোধী দুটি শ্রেণী থাকবেই থাকে। অন্যান্য শ্রেণীগুলি কোন না কোন মূলশ্রেণীর সাথী বা শত্রু। শ্রেণীর উদ্ভব হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। এই রাষ্ট্র আসলেতোই শ্রেণী রাষ্ট্র। যে শ্রেণী উৎপাদন যন্ত্রের মালিক তারাই রাষ্ট্রের মালিক তারাই শাসকশ্রেণী।

এই শাসকশ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে যারা শ্রম করে, যারা উৎপাদন যন্ত্রকে চালু রাখে সেই মেহনতী মানুষের হাতে নিয়ে আসাই বিপ্লব। অর্থাৎ উৎপাদন সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তনই বিপ্লব। শাসকশ্রেণী, মালিক শ্রেণী এই পরিবর্তন চায় না। তারা তাদের শোষণ ব্যবস্থা বজায় রাখতে চায়। তারা তাই কায়েমী স্বার্থ। কায়েমী স্বার্থ প্রথম থেকেই পরিবর্তনকামী শক্তির বিরুদ্ধে তার সমস্ত রাষ্ট্র-

শক্তি, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্থাও প্রয়োগ করে। তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনেই শাসকশ্রেণী বলপ্রয়োগ করে আন্দোলন দমন করে। আইন-আদালত, পুলিশ জেলখানা, মিলিটারী সবই তাদের হাতে। এই সবগুলি মিলেই রাষ্ট্রশক্তি। রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধাচরণ প্রবলে শুরু হয়। বিপ্লবী বা পরিবর্তনকামী শক্তি তা প্রতিরোধ করে। পরিণামে শ্রেণী সংগ্রাম গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়। এই গৃহযুদ্ধে বিপ্লবী শ্রেণীগুলি একপক্ষে, প্রতিবিপ্লবী শ্রেণীগুলি অন্যপক্ষে থাকে। বিপ্লবী শক্তি চায় শোষণ ব্যবস্থার উচ্ছেদ, দারিদ্র্য ও অসাম্যের অবসান। প্রতিবিপ্লবী শক্তি চায় শোষণ বজায় থাকুক, ফলে তাদের প্রতিরোধ তাদের শ্রেণীর স্বার্থে শ্রেণীস্বার্থে পরিচালিত হউক। ঐ উভয়ের দুটি বিরোধী শক্তিই যারা থাকে, যারা সমাজে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত একশ্রেণী অন্য শ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা দখল করে এই ভাবে সামাজিক অবসান ঘটে।

ভারতীয় সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশ

ভারতের বিশেষ ক্ষেত্রেও আমরা বিপ্লবের সর্বজনীন সূত্রগুলি প্রয়োগ করে কি দেখতে পাই? এখানে শোষক শ্রেণী ও শোষিত শ্রেণীগুলির বৈশিষ্ট্য ও অবস্থান কি? ভারতে কি ভাবে বিপ্লবের ক্রমবিকাশ ঘটছে, কি ভাবে কোন্ শ্রেণী এই বিপ্লবে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করছে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর পেতে হলে আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করে দেখা প্রয়োজন। কারণ শোষণের রূপ উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই প্রকাশ পায়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাকে প্রতিফলিত করে, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের পারস্পরিক ভূমিকা ও সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্পর্কের মোট যোগফল রাজনৈতিক ক্ষমতায় টানাপোড়েন, তার সমাধান বিধান করে। ভারতেও আমরা এই ধরনের এক বিকাশমুখী কঠিন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলেছি।

ভারতে সমাজ-বিকাশের ধারায় সার্বজনীন রূপ যেমন আছে, তেমনি বিশেষ স্থানীয় প্রকৃতিও রয়েছে। সব দেশেই থাকে। সুতরাং সার্বজনীন উপাদানগুলির সঙ্গে স্থানীয় বিশেষ প্রকৃতিগুলির সামঞ্জস্যকরণ ছাড়া সফল বিপ্লবের আশা সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে না। সার্বজনীন সত্য হলো সমাজ দেশের মধ্যেই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল ছাড়া আমূল সামাজিক বা উৎপাদনসম্পর্কের পরিবর্তন ঘটানো যায় না। সুতরাং সব বিপ্লবেরই মূল প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্ন। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে একটা মূল শ্রেণী অপর মূল শ্রেণীকে ক্ষমতার আসন থেকে সরিয়ে দেয়। বিপ্লব ক্ষমতা দখল করে। অন্যান্য শ্রেণীগুলি কোন না কোন মূল শ্রেণীর সহায়ক বা বিরোধী হয়ে থাকে। সুতরাং শ্রেণী বিভাজনের সঙ্গে দুটি ছাড়া কোন দেশের বিপ্লবেরই রণনীতি নির্ধারণ করা অসম্ভব। কার্ল মার্কস পি. ভি. অ্যানেনকোভ-কাছে লেখা তার চিঠিতে (নির্বাচিত রচনাবলী. ১ম খণ্ড পৃঃ ৬১৮) লিখেছিলেন, "সব মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মোট ফলই সমাজ" এবং আরো বলেছিলেন যে এই ফলেই শ্রেণীসমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে। সামাজিক বিকাশের মূল চালিকাশক্তি হল শ্রেণী সংগ্রাম। অর্থাৎ নিপীড়িত শ্রেণীগুলির শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়েই নতুন সমাজ ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করে। সুতরাং যারা শাসকশ্রেণীগুলির সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলেন, শ্রেণী সংগ্রাম মুলতুবি রাখার পক্ষে বলেন তারা বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষেও বাধা সৃষ্টি করেন। মহাত্মা গান্ধী ও তার শিষ্যবৃন্দ শ্রেণী সহযোগিতার পক্ষে ছিলেন বলে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী তার আদর্শ প্রচারে এখনো সদা তৎপর। ইন্দিরা কংগ্রেসীরা সুযোগ পেলেই বিনোবাকে খুঁজে আনেন, বিদেশী সর্বা বিদেশী অর্থ, বিদেশজাত মতাদর্শ সম্পর্কে তাদের আপত্তি নেই। কিন্তু মার্কসবাদ লেনিনবাদের বিপ্লবী তত্ত্বকে তারা বিদেশী ভাবধারা বলে মার্কসবাদীদের [illegible] দেন। জাতীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, আনন্দমার্গ, মুস্লিম লীগ এরা সবাই কট্টর কমিউনিস্ট-বিরোধী, কারণ বিপ্লবী মতাদর্শের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মতাদর্শ খাপ খায় না। এক মুহূর্তও চলে না।

বিপ্লবের সার্বজনীন তত্ত্বগুলি কোন দেশের বিশেষ অবস্থায় সফলভাবে প্রয়োগ করাই হল মার্কসবাদ। কারণ তত্ত্ব যদি প্রয়োগসিদ্ধ না হয় তাহলে তত্ত্ব নিষ্ফল।

সুতরাং ভারতের বিশেষ পরিস্থিতি বিচার করার আগে আমরা এদেশে বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ করতে পারি না। কমিউনিস্ট ইশতাহারের শেষ অধ্যায়ে বিপ্লবের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রধানতঃ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব—এই দুটি স্তরের কথা ম্যানিফেস্টোতে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতের বিশেষ পরিস্থিতি হচ্ছে: এই দেশ দুই শতাব্দীরও বেশী সময় ব্রিটিশ উপনিবেশ রূপে অবস্থান করছিল। লেনিন ম্যানিফেস্টোর দুই বিপ্লবের তত্ত্বকে আরো বিকশিত করে দেখালেন যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকেই প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদের অবসান ঘটেছে এবং সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশগুলিতে পুঁজি রপ্তানী করছে এবং উপনিবেশে সস্তা মজুর ও কাঁচামাল পাবার জন্যে স্থানীয় শাসকশ্রেণীর সহযোগিতা চাইছে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সামন্তবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সুতরাং বুর্জোয়া শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারে না। অতএব পরিস্থিতি এমন নয় যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা সম্ভব। হয়তো যেদিন এশিয়া ও ইউরোপের সমস্ত দেশ সমাজতান্ত্রিক শিবিরে যুক্ত হবে সেদিন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার দেশ সমাজ বিকাশের বেগমাত্রাকে অর্থ একবারে অতিক্রম করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে এসে পৌঁছে যাবে। কিন্তু তার আগে সমগ্র বিশ্বেই শক্তির ভারসাম্য সমাজবাদের পক্ষে আরোও ভাবে নির্ধারিত হয়ে যেতে হবে। সুতরাং ভারতের পক্ষে কেন, কোন দেশের পক্ষেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব অর্থাৎ কৃষি-বিপ্লব সম্পূর্ণ না করে সমাজবাদের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এবং অনুমা-বিলাস মাত্র।

এই নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে কমিন্টার্নের তৃতীয় কংগ্রেসে উপনিবেশবাদ সম্পর্কিত প্রস্তাবে এম. এন. রায়ের প্রস্তাবের উপর এক সংশোধনী এনে ভি. আই. লেনিন বলেছেন যে—আমাদের ভূমিকায় বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব অর্থাৎ সামন্ত রাজ উচ্ছেদ করে কৃষি বিপ্লব অথবা এক কথায় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব, সুতরাং "শ্রমিকশ্রেণীকে অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর মূল বিরোধী শক্তিকে এগিয়ে এসেই এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করতে হবে।" লেনিন বিষয়টি এভাবে আরো বিকশিত করে দেখালেন শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে কোন "চীনের প্রাচীর" নেই। গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণ করা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজ ব্যাপার। মাও সে তুং চীনে এবং হো চি মিন ভিয়েৎনামে এই লেনিনীয় তত্ত্বের সফল প্রয়োগ করে সমাজতন্ত্র বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে অবাধানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করেছেন। এখানে আমরা বিশেষ দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সার্বজনীন তত্ত্বের সফল প্রয়োগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

ভারতের বিশেষ পরিস্থিতিতে আমরা যদি নির্ভুলভাবে সার্বজনীন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বকে প্রয়োগ করতে পারি তাহলে এদেশেও গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে পরিকল্পিত পথে কোন "চীনের প্রাচীর" দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

ভারতে শ্রেণী বিভাজন

এখানে জনগণনায় যে সকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাতে দেখা যায় ভারতের শতকরা ৭০.১ জন অধিবাসী কৃষক বা কৃষি নির্ভর। শতকরা ২১ জন বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী এবং শতকরা ৬ জন ব্যবসায়ী দোকানদার, অবশিষ্ট তিন শতাংশ বা তারও কম সম্পন্ন ও বিত্তশালী। এদের মধ্যে ব্যবসায়ী ও বড় শিল্পমালিক থেকে একচেটিয়া পুঁজিমালিক ও উচ্চপদস্থ সরকারী ও বেসরকারী আমলাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। শ্রেণী বিভাজনের উদ্দেশ্য মাত্র করেই এখানে কাজ হতে হল তাই এই বিষয়টি সম্পর্কে এই ক্ষেত্রে আরো বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে এই মোটামুটি অবস্থা লক্ষ করাই যথেষ্ট হবে।

এই শ্রেণীগুলির মধ্যে নিঃস্ব ক্ষেত মজুর, প্রান্তিক চাষী, গরীব ও মাঝারি কৃষক মোট গ্রামীণ অধিবাসীর শতকরা প্রায় ৯০ জন। বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশ অসংগঠিত, আধা সর্বহারা, গ্রামীণ বুদ্ধিজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যাও অনেক বেশী। ছোট দোকানদার, ছোট ব্যবসায়ী ও ফেরিওয়ালাদের সংখ্যাও কম নয়। সমগ্র দেশকার্যে শিল্পের মধ্যেই ভারতের বেশী ভাগ শিল্প বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিদেরই করায়ত্ত। গ্রামের ধনী কৃষক ও জোতদার জমির মালিকদের হাতে দেশের ৬০ শতাংশ কৃষিযোগ্য জমি অথচ এরা মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫/৭ শতাংশ। সুতরাং মাত্র পাঁচ শতাংশ বা তার কম শতাংশ বিত্তবান অংশ বাকী ৯৫ শতাংশ ভারতীয় জনগণকে ক্রমাগত শোষণ করে অধিকার কায়েম করে চলেছে।

এই পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আশা করা যায় না। কারণ বুর্জোয়া শ্রেণী কৃষি ক্ষেত্রে বুর্জোয়াকরণের যথাবিধি প্রয়াস এবং জমিতে মজুরীভোগী শ্রমিক নিয়োগ করে পুরোপুরি ধনতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। কারণ আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এখানে সামন্ততান্ত্রিক প্রথার বর্গাদার বিলোপ এবং ধনতান্ত্রিক মালিকানা আরো কেন্দ্রীভূত করার প্রয়াস অনেক বেশী। যদি শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে পুরোপুরি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন চালু করা সম্ভব হত তাহলে আমাদের দেশে শ্রেণীবিন্যাসের রূপ অনেকটা সহজ ও সরল হয়ে উঠতো। আমরা দুটি মালিক শ্রেণীকে মুখোমুখি দেখতে পেতাম। অন্তত পরস্পর বিরোধী শ্রেণীগুলির একদিকে বা অন্যদিকে মোটামুটিভাবে সমাবেশ হত। অর্থাৎ আমরা দেখতে পেতাম একদিকে বৃহৎ ও একচেটিয়া পুঁজির নেতৃত্বে বুর্জোয়া শ্রেণী, অন্যদিকে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে মজুরী ও বেতনভোগী শ্রমজীবী শ্রেণীগুলি। যেমন ক্ষেত্র হতো বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা পরিষ্কার হবে এটার কল্পনা করা যেত। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য হলেও, আমাদের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর অতিক্রম করে যেতে হবে অর্থাৎ প্রথমেই গ্রামীণ কৃষি বিপ্লব সম্পূর্ণ করতে হবে, সামন্ত প্রথাকে সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে। এই কাজ ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী করতে পারে না। তারা সাম্রা-

শ্রেণীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের মালিক হয়ে বসেছে। একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বেই সামন্তবাদের উচ্ছেদ ঘটানো এবং গ্রামের রূপান্তর ঘটানো সম্ভব। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে এই বিপ্লবকে শুধুই গণতান্ত্রিক বিপ্লব না বলে আমরা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে থাকি। এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিত্তি হবে সামন্তশোষণ ও একচেটিয়া পুঁজি শোষণের শিকার যারা সামাজিক স্তরের লোকজন সমবেত হন। ছোট শিল্পপতি থেকে খুচরো দোকানী, জমিহীন কৃষক থেকে গরীব ও মাঝারি কৃষক, এমন কি একচেটিয়া পুঁজির শোষণে ও অত্যাচারে উৎপীড়িত ধনী কৃষক এই সমাবেশে উপস্থিত হতে পারেন। সুতরাং এই মুহূর্তে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য সাধন ও অগ্রগতি গ্রহণ করলে শ্রমিক শ্রেণীকে এত দিক সামলাতে হবে। একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ত প্রভুদের যুক্ত জোটকে পরাজিত করতে হলে এই ধরনের সংকীর্ণ মনোভাব বিপ্লবের ক্ষতি করবে। সতর্ক হতে হবে।

অর্থাৎ একমাত্র ব্যাপকতম জনগণকে সংগঠিত করেই আমূল পরিবর্তনের পথ সুগম করতে হবে। সামন্তবাদ ও একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজি মালিকদের শোষণে যারা জর্জরিত ব্যাপকতম অংশের জনগণের ঐক্য গঠন করাই হচ্ছে ভারতীয় বিপ্লবের আশু কর্তব্য। সমাজতন্ত্রের শক্তি বামপন্থীদের প্রধান ও এই কাজে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদী গোষ্ঠি পরিচালিত যে কোন সরকারকে অপসারণ করতে হলে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সব কুসংস্কার ও ভুল ধারণা দূর করতে হবে। যে কোন অংশের জনগণ—তারা অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ মনোভাবাপন্ন অংশই হোন, কিংবা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীই হোন তাদের সবাইকে এই আন্দোলনে টেনে আনা সম্ভব কারণ শ্রেণী বিভাজনের হিসেবে শতকরা ৯৮ শতাংশ জনগণই আজ জীবনে সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদের শোষণে জর্জরিত। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে শোষকেরা তাদের উপর দুঃখকষ্টের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। একচেটিয়া পুঁজির মালিকানাধীন সংবাদপত্রও তাদেরই সাংবাদিক গোষ্ঠি, অপসংস্কৃতি তাদেরই সাহিত্যিক প্রচারকেরা ক্রমাগত মিথ্যা ও কুৎসার ধূম্রজাল দিয়ে মানুষের মনে অবিরাম বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে। বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজি মালিকদের সংবাদপত্রের প্রচার ক্ষমতাকে মোকাবিলা করা সহজ নয়। বিকল্প বিভিন্ন পাল্টা প্রচারের মাধ্যমে এই প্রভাবশালী সংবাদপত্রের প্রচারকে যে পর্যুদস্ত করা যায় পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরলের জনগণ তা প্রমাণ করেছেন।

গণআন্দোলনের বিদ্যালয়ে

কিন্তু যে দেশে প্রায় ৩২ কোটি মানুষ নিরক্ষর, শিক্ষাভিমানী অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী অর্থের বদলে বিক্রীত সেখানে ব্যাপক জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় যত শিক্ষিত করে তুলতে হলে সব চাইতে উপযুক্ত বিদ্যালয় হচ্ছে গণ আন্দোলন। বিভিন্ন অংশের জনগণের জীবনযাত্রার জরুরী কিছুটা উন্নয়নের দাবীতেও গণআন্দোলন পরিচালনার ফলে সাধারণ মানুষের চোখ খুলে যায়। গণ সংগ্রামের মাধ্যমেই তারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তা ক্রমশঃ দৃঢ় চেতনা ও প্রজ্ঞায় পরিণত হয়। জনগণের বিভিন্ন অংশ শ্রমিক, কৃষক, ছাত্রযুব, মহিলা, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি সাধারণ অংশ যখন সাধারণ দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হন, তখন তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে শাসকশ্রেণী জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। ফলে তাদের সর্বভিত্তি থেকে চুরমার হয়ে যায় এবং জনগণের ঐক্যের কাছে তারা নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। ইরানের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনাই ঘটেছে। অন্য সব দেশেই এই পথে শাসকশ্রেণী পরাজিত হয়েছে।

অবশ্য শাসকশ্রেণী বিনাযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে না। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ বিভিন্ন অংশের জনগণ যে কোন অবস্থাতেই শাসকশ্রেণীকে পরাজিত করার ক্ষমতা রাখেন। আকার দিয়ে ব্যাপক জনগণের সাধারণ ধর্মঘট যে কোন সরকারকে অচল করে দিতে পারে, সরকারকে দাবী স্বীকার করাতে অথবা তা না হলে পদচ্যুত হতে বাধ্য করতে পারে। গণ আন্দোলন তখনই এই সাফল্য অর্জন করতে পারে যখন শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সাধারণের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিজেদের দাবীর স্বপক্ষে পরিবর্তিত হয়। তখন শাসক ও শাসিতের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য শাসিত জনগণের পক্ষে চলে যায়। এইরকম পরিস্থিতিতে শাসকশ্রেণী বলপ্রয়োগ করতে উদ্যত হলে তার সর্বভিত্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। তারা কাগুজে বাঘে পরিণত হয়। জনগণের ক্রোধের একটা স্ফুলিঙ্গই তখন তাদের ভস্মীভূত করার সামর্থ্য রাখে। সুতরাং ধৈর্যের সঙ্গে অনবরত দাবিদাওয়ার সংগ্রাম সংগঠিত করে যেতে হবে। এখানে অবহেলা যেখানে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথে এক ইঞ্চিও এগোনো সম্ভব হয় না।

গণ আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন পাশাপাশি সংগঠিত করা হলে শাসক বুর্জোয়া সামন্ত শ্রেণীর পারস্পরিক বিরোধিতা ও অবস্থানগত সংঘাত বৃদ্ধি পায়। তারা এক হয়ে শাসন চালাতে পারে না। নানা দল উপদলে বিভক্ত হয়ে তারা আত্মকলহে লিপ্ত হয়। ঐক্যবদ্ধ জনগণের পক্ষে তাদের পরাজিত করা আরো সহজ হয়। তাছাড়া তারা যত মিথ্যা ও কুৎসা প্রচার

করে তখনই সাধারণ মানুষের সত্য জানার আগ্রহ থাকে। তারা বামপন্থীদের সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে। সেদিনের মতো কমিউনিস্টদের সম্পর্কে মিথ্যা বুর্জোয়া শ্রেণী জনগণের মধ্যে সঠিক চেতনা প্রকাশের বৈপ্লবিক মাধ্যম ও শিক্ষকে পরিণত হয়। সুতরাং বুর্জোয়া প্রচারের তীব্রতা দেখে আশঙ্কা করার কোন কারণ নেই। তারা অভাবে যা খুশি বলুক সংগ্রামই সাধারণ মানুষের সত্য সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

গণ আন্দোলন সম্পর্কে আরো একটি ধারণা স্পষ্ট করার প্রয়োজন আছে। অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার আন্দোলন সঙ্গে সঙ্গে সব দাবি আদায় করতে সক্ষম হতে নাও পারে। এমন কি ব্যর্থও হতে পারে। কিন্তু ঐ আন্দোলন যদি সঠিকভাবে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় পরিচালিত হয় তাহলে আপাততঃ ব্যর্থ হলেও তা ভবিষ্যত সাফল্যের ভিত্তি পাকাপাকি সৃষ্টি করে। যে কোন গণ আন্দোলনের এটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবাংলার খাদ্য আন্দোলনই নিদর্শন। আন্দোলনের ফলে প্রফুল্ল সেনের কংগ্রেস সরকার খাদ্য রেশনের পরিমাণ মাথাপিছু মাত্র ১০০ গ্রাম বৃদ্ধি করে। কিন্তু মাত্র পাঁচ মাস পর চিরতরে ক্ষমতা হারিয়ে বসে। মনে রাখা দরকার যে কোন আন্দোলন পরবর্তী অগ্রগমনের একটা সিঁড়ি। সিঁড়ি না থাক বাদ দিয়ে উপরতলায় যাওয়া যায় না। বিক্ষোভ যতই থাকুক গণআন্দোলনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে না গিয়ে বিপ্লব বা আমূল পরিবর্তন সম্ভব হয় না। সুতরাং গণ আন্দোলন বিমুখ বিক্ষোভের কোন ঐতিহাসিক মূল্য থাকে না।

বিপ্লবী পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক সংকট

বুর্জোয়া ভূস্বামী শ্রেণী শোষণের তাগিদে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা টিকিয়ে রাখতে পারে না। তারা তাদের শ্রেণীগত স্বার্থে ক্রমাগত অপরাপর শ্রেণীর জনগণকে শোষণ করে, তাদের জীবনশক্তি আক্রমণ করে, বিপুল জনশক্তিকে বেকার বসিয়ে রাখে। তারা এটা না করে পারে না। ফলে তারাই দেশে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। অর্থনৈতিক সংকট দেশের সকল অংশের জনগণকেই ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে। ফলে বাজার ও ক্রয়শক্তি সংকুচিত হয়, দুঃখ ও দারিদ্র্য সংকট দেখা দেয়। জনগণের বিপুল অংশ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত বৈরিতা ও হিংস্র প্রতিরোধের পথ ধরে। তখন জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার প্রসার

এক জাতি, এক প্রাণ, একতা

ধর্ম, বর্ণ, আচার নির্বিশেষে
আমরা সবাই এক—ভারতবাসী

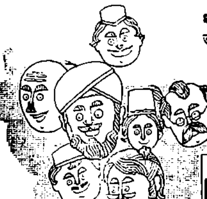

সেবার মাধ্যমে
জনগণের ঐক্য গড়ে তোলায় ব্রতী

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ১৭, আর এন মুখার্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০০১
রেজি. অফিস : ৭ রেড ক্রস প্লেস, কলিকাতা : ৭০০ ০০১
চেয়ারম্যান : জে এন বিশ্বাস

Progressive-UIB-75/80

হতে থাকে এবং তারা অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার সংগ্রামে অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারী সরকারকে ধসানোর রাজনৈতিক লড়াই সম্পর্কেও সচেতন হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে শাসকশ্রেণী প্রথমে ক্রমাগত মন্ত্রিসভা বদল, মন্ত্রিসভা ও সংস্কার বদলের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে থাকে। তীব্র বিপ্লবের সময়, তার আগে বা বিপ্লবের সময় শাসকশ্রেণীর এই সংবিধানগত সংকট ও সংস্কারের ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেশের ইন্দিরা কংগ্রেস, জনতা, লোকদল (এস) আবার ইন্দিরা সরকার এসব ঘটনা ঘটছে। এটা শাসকশ্রেণীর সংকটের পরিচয় নয়, তাদের দলাদলি থেকে সত্যই পরিচয়। বিভিন্ন অংশের অনৈক্যের ঐক্য প্রসারিত হলে এই সংবিধানগত সংকট আর তত রাজনৈতিক সংকটে পরিণত হতে পারে এবং রাজনৈতিক সংকট বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। লেনিন তার সোস্যাল ডেমোক্রেসীর দুটি কৌশল গ্রন্থে এর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেছেন।

রাজনৈতিক সংকটের চেহারা কি? লেনিনের কথা হল (১)"—বিপ্লবী পরিস্থিতি দেখা না দিলে বিপ্লব হতে পারে না; কিন্তু প্রত্যেকটি বিপ্লবী পরিস্থিতিতেই বিপ্লব সাফল্য লাভ করতে নাও পারে। (২) বিপ্লবী পরিস্থিতি দেখা দেওয়া সত্ত্বেও যদি একটি প্রকৃত বিপ্লবী, সুসংগঠিত ও দৃঢ় পার্টি না থাকে তাহলেও বিপ্লব সফল হতে পারে না। (৩) কোন্ মুহূর্তে চূড়ান্ত ও শেষ আঘাত হানতে হবে সেটা নির্ধারণ করার সামর্থ্য না থাকলে বিপ্লবী পরিস্থিতি সত্ত্বেও বিপ্লব সফল হতে পারে না। (৪) সুতরাং বিপ্লবী পার্টিকে জনগণের নিজস্ব অভিজ্ঞতাকেই চূড়ান্ত আঘাতের মুহূর্ত বেছে নেবার মাপকাঠি বলে গ্রহণ করতে হবে এবং এই চরম মুহূর্ত বেছে নেবার মত যথেষ্ট দূরদৃষ্টি এবং বিচক্ষণতা থাকতে হবে।"

ভারতীয় বিপ্লবের ক্ষেত্রেও লেনিনের এই সার্বজনীন নীতিগুলি প্রযোজ্য। বিশেষ পরিস্থিতিতে এই সার্বজনীন নীতি প্রয়োগে দক্ষতার উপরেই বিপ্লব আদৌ সফল হবে কি না তা নির্ভর করে। অতএব আমরা দেখতে পাই যে বিপ্লবের সাফল্যের জন্যে দুটি প্রধান পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া দরকার। প্রথমত: বিপ্লবী পরিস্থিতি ও জনগণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা; আমরা একে বস্তুগত উপাদান বলে অভিহিত করতে পারি। দ্বিতীয়ত: বিপ্লবী পার্টি যে পার্টি বস্তুগত উপাদান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, ঐ উপাদানের পরিপক্কতা আন্দাজের জন্য সব আন্দোলন সংগঠন করতে সক্ষম এবং রাজনৈতিকভাবে নিপুণ ও সুশিক্ষিত। যে কোন পরিস্থিতিতে বিপ্লবের অগ্রগতি সাধনে পার্টি নেতাদের নিপুণতা তাদের থাকতেই হবে। এই ঘটনাকে আমরা বিষয়গত উপাদান বলে ধরে নিতে পারি। বস্তুগত ও বিষয়গত উভয়বিধ উপাদানের যুগপৎ পরিপক্কতা ছাড়া কোন বিপ্লব সফল হতে পারে না।

মার্কসবাদ শিখিয়েছে যে কোন বস্তু বা ঘটনাই নির্ভেজাল এক রূপ বিশিষ্ট নয়। প্রত্যেক বস্তু ও ঘটনার মধ্যে দুটি পরস্পর বিরোধী উপাদান ক্রমাগত সংঘাত বাধিয়ে নিজ থেকে ঐ বস্তু বা ঘটনার রূপান্তর ঘটায়। সমাজ বদলানোর প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও এটা সত্য। বিপ্লবী পরিস্থিতি ও বিপ্লবী শক্তি নির্ভেজাল এক রূপ বিশিষ্ট থাকে না। এর মধ্যে প্রতি বিপ্লবী পরিস্থিতি ও শক্তিগুলিও ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে। এর বিরুদ্ধে ক্রমাগত আপোষ বিরোধী সংগ্রাম চালিয়েই এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা এবং উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরণ করা সম্ভব।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে বিপ্লবী পরিস্থিতি বলতে কি বোঝায়। মহান লেনিনের কথাগুলি আবার স্মরণ করি। তিনি বলেছেন: (১) যখন পরিবর্তন না করে শাসকশ্রেণী আগের কায়দায় শাসন চালাতে পারছে না; যখন উচ্চ শ্রেণীগুলির মধ্যে কোন না কোন আকারে সংকট দেখা দেয় এবং শাসকশ্রেণীগুলির রাষ্ট্রনীতি এমন কঠিন সংকটে পড়ে যে শ্রেণী সমাজে নতুন নতুন ফাটল দেখা দেয় এবং শাসিত শ্রেণীগুলি শাসক শ্রেণীগুলির দুর্নীতি অপদার্থতা ও ব্যর্থতার ফলে তাদের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ঘৃণা অসন্তোষ ও ক্রোধে ফেটে পড়ে। কখন সাধারণ মানুষের মধ্যে এ ধরনের ক্ষোভ দেখা দেয়? যখন নীচুতলার লোকেরা দেখতে পায় যে শুধু তারাই আগের মত জীবনধারা নির্বাহ করতে পারছে না তাই নয়, উঁচুতলার লোকেরাও আগের মত আগের কায়দায় জীবন কাটাতে পারছে না, তখনই সমাজ বদলের জন্যে সাধারণ মানুষ আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন। ক্রুদ্ধ আঘাতে পুরনো সমাজকে ভেঙে চুরে নতুন সমাজের গোড়াপত্তন করতে চান। (২) যখন সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট মাত্রা তাদের চিরাচরিত দুঃখকষ্টের মাত্রাকেও ছাপিয়ে যায় এবং অসহ্য হয়ে ওঠে। (৩) যখন উপরোক্ত দুটি পরিস্থিতির ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে মাত্রা অতিক্রম করে এবং প্রায়ই সর্ববিক্ষোভ ও সব প্রতিবাদের প্রক্রিয়া বাড়তে থাকে অর্থাৎ এককাল অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিস্থিতিতে যারা মুখ বুজে থাকেন, অবাধে শোষণের শিকার হন, বিশেষ সংকটের আবর্তে তারা যখন উচ্চতর শ্রেণীগুলির চাপিয়ে দেওয়া বোঝা আর বইতে পারেন না—এবং স্বাধীনভাবে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা অর্থাৎ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসেন।

মনে রাখা দরকার বহু দেশে বহু বার—আমাদের দেশেও কয়েকবার এই ধরনের বস্তুগত পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল। কিন্তু

বিপ্লব হয় নি। কারণ বিপ্লবের জন্য সবটি অনুপস্থিত ছিল। অর্থাৎ, (১) সুসংগঠিত, বিপুল এবং এক সর্বহারা শ্রেণীর পার্টি, যে পার্টি বিপ্লবী পরিস্থিতি অনুধাবনে ও পরিচালনে দক্ষ এবং সঠিক আঘাতের মুহূর্ত নির্ণয় করার সামর্থ্য রাখে।

মহান লেনিনের এই যুগান্তকারী অনুসরণ করে জোসেফ স্তালিন বিপ্লবী কর্মকৌশলের পাঁচটি সূত্র নির্ধারণ করেন: (১) বিপ্লবের স্তর অনুসারে লক্ষ্য ও করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। (২) বিপ্লবের পক্ষে যে সকল শক্তি রয়েছে তাদের উপযুক্ত মূল্যায়ন করতে হবে; (৩) বিপ্লবের আশু সংরক্ষিত বাহিনী কে বা কোন্ কোন্ অংশ তা পূর্ব নির্ধারণ করতে হবে; (৪) আক্রমণের প্রধানতম আঘাত কোথায় কেন্দ্রীভূত করতে হবে তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে (৫) বিপ্লবী শক্তিগুলিকে সঠিকভাবে নিয়োজিত করতে হবে।

লেনিন ও স্তালিনের সূত্র অনুযায়ী বিপ্লবের বিশ্লেষণ নির্ণয় করার পরেও বা করা সত্ত্বেও, যে পরিস্থিতি আসলে তা করা সম্ভব, সব কিছু বোঝা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তির পক্ষেই বিপ্লবের আবির্ভাব সম্পর্কে কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়, তা বোঝার ব্যাপারটা বোঝা গেল। যেমন পরিস্থিতি মানুষের ইচ্ছানিরপেক্ষ। বিপ্লবের পরিস্থিতিও বস্তুগত পরিস্থিতি নিরপেক্ষ নয়। তবে আত্মত্যাগী, আদর্শবাদে ও মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিপুল ব্যক্তিরা এই পরিস্থিতি উপলব্ধি করে সংগঠনকে বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

সোভিয়েত রাশিয়ায় লেনিন ও স্তালিন, মহাচীনে মাও-সে-তুং এর মাধ্যমে বিপ্লবের যে দুটি শক্তিশালী স্তম্ভ নির্মাণ করেছেন এবার কোন্ দেশ তৃতীয় স্তম্ভ নির্মাণ করে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিশ্ব বিপ্লবের পথ আরো দৃঢ় ও সুগম করে তুলবেন?

বহু যারা প্রশ্ন করেন, তাদের কাছে একই উত্তর। কেউ জানে না। তবে যখন যেখানে ব্যাপকভাবে সংকট সৃষ্টি হবে, অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সকল বিপ্লবে পরিণত হবে তার আবার সুনিশ্চিত আবির্ভাব সম্পর্কে কোন সংশয় নেই। এর জন্যে সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে, আত্মবিশ্বাস নিয়েও দুরীত হলে চলবে না। যে কাজ যে নিশ্চিত সে আসবে, তার আগমনের সমস্ত আয়োজন আগে থেকেই করতে হবে। কোন্ শুভ মুহূর্তে তার আগমন ঘটবে এখনো জানি না। হয়তো আমার আপনার জীবদ্দশায় তা জানা হবে না। তো কি হয়েছে জানার তবু যেন আমরা সঠিক নিশানে রাখতে পারি। দশ দিন এখনো না হাজার বছর হোক তবু মানুষের ইতিহাস বদলাবে। আমাদের সুন্দর দেশেও শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে উঠবে। শিল্প ও সাহিত্য, যৌবনের স্বপ্নকে, বার্ধক্যের অভিজ্ঞতাকে আরো মহান করে তুলবে। আমরা তার অপেক্ষা করবো, অবশ্যই করবে। কিন্তু এখনি বলতে পারবো না কেমন করে আসবে। শুধু আগুন জ্বেলে রেখেছি কোথায় কোন সংক্রান্তি, অর্থাৎ কোন বিপ্লবকালে তার জন্ম হবে, সেই আবির্ভাবের মুহূর্ত এখনো নির্ধারিত হয়নি মনে হচ্ছে আর দেরী নেই। তবু নিশ্চয় জানি না।

অভয় মন্ত্র

(...'The rebel thought unbowed.'—A. Pushkin.)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাকে শিকল পরাবে হে! কার ভয় তাকে করেছে বন্দুকের দাস?
কার ভয় এত পুলিশ, সেপাই, আদালত? কাকে তুমি দেখাও
এত ভয়?

মানুষ তোমার বশ; কিন্তু যা মানুষের বুকের থেকে উঠে আসা মহত্ত্ব,
তাকে শিকল পরাবে তুমি? যা মানুষের বিশ্বাসের মধ্যেই তার
স্বাধীন সত্তা,
তাকে স্পর্শ করবে তোমার স্পর্ধা? তাও কি হয়!
তোমার পুলিশ মারতে পারে মানুষ, সেটা সহজ। কিন্তু তার
চৈতন্যের দীপ শিখায়
দেখ, পৃথিবী জ্বলছে এক জ্যোতির্ময় মহোৎসবে—

কোনো সম্রাট বিক্রমাদিত্যেরও নেই সাধ্য, তাঁর বিচারশালায়
সেই মুক্ত বিদ্রোহীকে এনে স্বাধীন মানুষের অভয় মন্ত্রটি দিয়ে
করবেন বিচার।

ঘোষণা

সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রাইটার্স বিল্ডিং চাকরির উমেদারির জায়গা নয়
যা দুর্নীতি ছিল, তা আমরা ঝেঁটিয়ে সাফ করব
কিন্তু হঠাৎ
এই এক ক-বছর আর বদ পাল্টা নয়,

(দুনিয়ার সভা মানে) তোমরা কমিটি সুপারিশ ক'রবে যেমন
কমিটির কাছে
একান্ত যাদের দরকার
তারা ছাড়া আর (যারা ঝুলে আছে) কারো কথা ভাবা হবেনা।
নাম রেজিস্ট্রি করো এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে...

রাইটার্স বিল্ডিং চাকরির উমেদারির জায়গা নয়
দুর্নীতি যা ছিল, ঝেঁটিয়ে তা আমরা সাফ করব।

উত্তরাধিকার

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

একবার হাওয়া দক্ষিণায়
একবার হাওয়া শীতে
চক্ষে জলেছে, অনেক চোখের জল
জীবনের এই হাটে

পায়ের পায়ের শিয়ালকোলের পরিধি
একভাবে হিসাব মেলাতে চায় কি মন
চৈত্রে জেগেছে অশোক পলাশ
এপথে হেঁটেছি তাই বার বার
রক্তের ফোঁটা চলে
নকশী টান, জীবনের ছায়া
কাঁধ থেকে থেকে খেতে খেতে
আকাশের নীলে
মৃত্যুর দিনে
আলো হাওয়ায়
নব দিন দূরে
এপথে হেঁটেছি
এপথে হাঁটবো
এপথেই পাবো দিনের নকশী আর
যুগ বোধ কবি—হোক সার্থক হাত

হে জনক, আমি আজ্ঞাবহ জনপদে
তুমি রেখে গেলে সন্তান; অন্তর
তুমি দিয়ে গেলে আমাদের হাতে
পবিত্র জমির আবাদ জমি
সোনা ফলানোর ভার
ক্ষতবিক্ষত কপালে তোমার
কাঁটার মুকুট—সেই তো অহংকার
হে জনক, তেমনি আজ্ঞাবহ জনপদে
আমরা এনেছি রক্তের উপাচার...

একটি অসংলগ্ন কবিতা

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

মানুষকে তুমি আমাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখো!

তুমি ঘুম পাড়াও আমাদের, যাতে আমরা [illegible]
তুমি ঘুম পাড়াও ঘুমপাড়ানিয়া গান গেয়ে।

এবং আমরা ঘুমিয়ে পড়ি তুমি জেগে থাকবে বলে
যাতে তুমি সর্বজীবনকেই [illegible]
মুখে তুলে নিতে পারো।

তোমার প্রয়োজনেই আমাদের ঘুম
পাড়িয়ে রাখো তুমি। জেগে থাকলে যদি
প্রাণপণে ঘুষি কিলি, উঠি যদি। কিংবা যদি
[illegible] ঘুমপাড়ানীকে
আপন করে নিয়ে স্বপ্নের চাবিকাঠি
আবিষ্কার করে ফেলি!

সবই তোমার ইচ্ছা। তুমি
ঘুম পাড়ালে
আমাদের ঘুমিয়ে পড়তে হয়। অতএব
তোমার বাহুতে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমিয়ে

কিন্তু তোমার গানে ঘুমিয়ে পড়লেও শেষ পর্যন্ত
আমরা জেগে থাকি। ভিতরে ভিতরে
জেগে থাকতে হয়। জেগে থাকতে থাকতে
জেগে থাকতে থাকতে একদিন
সব ঘুম দূর হয়ে যাবে বলে ভিতরে ভিতরে
মানুষ জেগে থাকে। জেগে থাকতে থাকতে
জেগে থাকতে থাকতে তারপর যদি একদিন
সকল মানুষ আবার জেগে উঠতে পারে!

রাত কত হল ?—উত্তর মেলেনা

কমল কর

এবং অনেক রাতে ঘুম হয়, কিন্তু অমন
জেগে উঠি
যখন তখন, [illegible] দর্পণে।
[illegible] পৃথিবীর অনেক বদল হয়ে গেছে
শহরে, গ্রামে, নদী ও জমিতে
মানুষের দীর্ঘ দুঃখ [illegible]
শোনা যায়।
'বিচ্ছিন্নতা'—'[illegible]'—'[illegible]' [illegible]
হাজার শব্দের মধ্যে [illegible]
এবং হারায়।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] এক দীর্ঘ কালো হাত
[illegible]
[illegible] রাত।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] বাহার
সেই দেশ, যেখানে [illegible] বিবিবাহে
সেই দেশ, যেখানে [illegible] কাজ করে, ভাত পায়
সেই দেশ, যেখানে দুবেলা
মানি ও শঙ্কাহীন অবসর জীবন কাটায়।
দেশ কোথায়? দেশ নেই, আছে শুধু
আছে [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
দুর্গাপুরে [illegible], [illegible] কিংবা [illegible]
গেলে ওঠে জল।
দেশপ্রেম? [illegible], একি কথা শুনি আজ [illegible] মুখে।
[illegible] হাজার [illegible]
এখানে [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
এখানে [illegible], [illegible] যেখানে
নিয়মিত [illegible]।

রাজনীতিকদের মুখে 'একতা' বা 'একাত্মতা'
দেশের মানুষরা বলে এমন ভাবুন, আর নানী দিন অর্থাৎ
হাজারবার অনড়ানো এত বড় অসমাপ্ত বুলি
যেমন ফুটপাতে অন্ধ ভিখারির তোবড়ানো বাটিতে
কোনো কোনো পথচারী ছুঁড়ে দায় অজস্র আধুলি।
অন্ধপুরের সব জল বাজে দান।
একই মৌচাক যাত্রী কেউ কবি দেখার বাজার
কার কিবা এসে যায়! ১১·৭
প্রভাতী চুমুক দিয়ে খবরকাগজের পাতি প্রাত্যহিক হত্যার খবর
তারপর ভুলে যাই। বিকেলের কাজকর্ম: নাচি।
কাছাকোলা মধ্যবিত্ত-দশটা বুঝিনা, বুঝি দেশনাইন
বুঝি বই আর বৈজ্ঞানিক বা বাদশাহজাদী।
কোট বুঝি, কোট? হাঁ-হাঁ তাও বুঝি
যেমন বুঝিনা আমি কার খুঁটি কার খোঁয়ে বাঁধা
কে কোথায় কেঁদে দিয়ে কী'রে বলে কেন্‌ সে ওখানা
কে কোথায় শুরু করে শেষমেশ কোনদিকে যায়
যেমনা রক্তের মধ্যে বাস, হাস, জলোচ্ছ্বাস আর তীক্ষ্ণ বরলোপ
একসাথে বাস করে, জল-পানি পায়।

সত্যে বড় নেই, দুলো আর ধোঁয়া দিয়ে উত্তর-পূর্বে যেন করে
কোথাও বাতাস নেই—হুহাকার কালো বাদলে
শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়, শতক, উত্তর কাছে মানুষের ক্রু পাহাড়ে
আশ্চর্য বদল হলো বড়োবাবুর—বড়োবাবুর বাসনও হবে?
আনমুক্তিবাহিনী প্রবাহিত মহাযানে ছেড়ে পথে কেন? কার পাপে?
বিমূঢ় সময়, ভুল বলো নয়, মানুষের পক্ষে থাকো
জেগে ওঠো জোরে নয়, মানবিক বোধের উত্থানে।

এখনো তো সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়নি

সাগর চক্রবর্তী

বন্যার ভিতরেও আমাদের হাতা আবহাওয়া
আমার মাঁর চোখের জল আড়াল করছে তার শাসন চিত্রকল্প।
ভুলিয়ে দিয়ে কথা হয়ে উঠেছেন নতুন নতুন ভূত।
এবার নাম খুঁজতে গেলে যেতে হবে
রাস্তুক বেয়নেটের কোণে বদলে।

আমার বুকের মোগলকলি লিখতে বাধা নেই কোথাও
হাতাহাতি যদি পাল্টে যাচ্ছে আমার কৌম সোনাটার
আমার কপালের রেখায় আর চুলের মনোনিবেশই তবে লেখা থাক
শব্দগুলি:
আমার মায়ের চোখের জল—

দুটি কবিতা

মৃণাল বসুচৌধুরী

আজও

আজকেরা বাহার ওপর
সাহারিক সাহারাও
কড়কড় কড়কড়।···
তাদের পৃথিবী তাই
কোলাহলো শীর্ণ বাটিতার
হয়ে যায় শীতের মতন
যদিও বা অন্যের কোনো নদী নেই।

একা শুধু দৃষ্টি জলে
একা শুধু চোখের জলে।

ঐক্য

ঐক্য চাই আগে বিশ্ব হবে,
তারপরে
পাড়া-বেপাড়ায়,
তারও পরে—
দেশ দেশান্তরে।

চকচকে সকলের প্রতি চাই—
অবিলম্ব যদি।···
এই ভাবে একবার পরিধি ঘুরিয়ে—
দায়িত্ব এড়িয়ে
নিরাপদ দূরত্বে দূরবীন এঁটে
'ঐক্য চাই ঐক্য চাই' বলে'—
চ্যাঁচালে কি একতার প্রতিশ্রুতি
খুঁজে পাওয়া যায়?

আজকের মুখুজ্যেকে

সুধীর চৌধুরী

মুখুজ্যের সঙ্গে অনেকদিন দেখা নেই।
কোথায় আছেন, কেমন আছেন,
চায়নিমাতেই চলে গেলেন কিনা
অথবা রয়েছেন অন্য কোনো রাও
জানিনা কিছুই।

তবে ইদানীং সংবাদে প্রকাশ,
কুশলেই আছেন তিনি ;
বিজ্ঞাপনের দপ্তরে বসে
কবিতাও লেখেন :
শুধু ঠিকানাটা বদলে গেছে তাঁর

মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল
অগ্নিকোণের কবিতায়, ভাববাংলার
ফাটলিতে।
নব-যুগ আনার প্রতিজ্ঞা করিতে
এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না
ব্যারিকেড ভাঙার মিছিলে—

অথচ মিছিল এখনও হয়
শহর ঢেকে আসে,
পোষাকের ব্যারিকেড ভেঙে
নব-যুগ আনার শপথে এখনও অটল
দেখি
লক্ষ-কোটি প্রাণ,
পাশে পাশে বন্ধুরে পাই
এখনও শুনতে পাই প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা
করছেন, তুমি নব-যুগ আনবে না !

জোয়ারের পথে

কালিসাধন মুখোপাধ্যায়

অন্ধ গলির মত
আলো আলো ভোরে শহরের বুকে আসছে উজ্জ্বল কিরীট।
পিছনে ফুটির চক, ফুটন্ত সব
দুটি কিশোর চুড়ে পাখির কেতন
কোথায় অস্থির তারা যায় হেঁটে
না-জানানো কত কথা— [illegible]
এক কোটো জলের মত বুকের মধ্যে দুখে ঠুকি বলে মুহূর্ত উত্তাপ।

অনেকদিন ধরে আমরা আড়ালে যাই নি
কত ঝিকিমিকি বৈদ্যুতিন ঝিলিক চকমক মুছে গেছে।
আমাদের কোনোদিন আলোর মত মন ছিল ?
মাঝের দুর্বল বুক ? [illegible] ?
জোনাকী নক্ষত্র [illegible],
পাখির মতন শিস দিয়ে বলে মন [illegible] ?
এখন দুয়োরে বাজি [illegible]।
মৃত্যুর মতো মত ছিটোনো কঙ্কাল !
তবু হেঁকো তাঁবু মাথায় উঁচিয়ে চলে কাফেলা
বাজানো বাঁশির অন্ধ নদীর নীচে
পুরানো পথ—পুরানো বন যেন উইঢিবি মুখ গুঁজে আছে
পথের বাঁকে বাঁকে।
প্রত্যেক মুহূর্ত চীৎকার
শেষ বিশ্বাসের খাঁটি করে ধারাবাহ বর্ণনে।
অদ্ভুত আলোর মত ছিদ্ ছিদ্ করে কাটা কোণ থেকে যেন হয় অবিরাম
নিজের নিঃশ্বাসকেও প্রত্যাখ্যা করার হিংস্রতায়।
তবু চলে কাফেলা—দুহাতে কাচের মত শহরকে ভাঙতে ভাঙতে
তখন হঠাৎ
পিছন থেকে যেন নদীতে টলমল নীল চোখ উঠিল জোয়ার।
ছুটন্ত পাখির মত বিনামূল্যে
দুটি মেয়ের মত কালো চোখে মুহূর্ত বিদ্যুৎ
আন্দোলিত তারা ছিল। জোনাকী তারের নীচে সমানো আছে।

তারপর মরীচিকা হলো ক্রমে ক্রমে উবে যায়।
দুর্ত্ত মহাকাল নরাম এখন হবে বলে কেন আকেন পান।
কালো অন্ধকার চক্রের জোয়ার পড়ে আছড়ে পড়ে
খোঁড়া কালো জিভ।

দুধ পরমান্নগুলি বুকে রেখে
পায়ের নখর শুধু আবরে ঢাকিয়ে
কাকেরা যত পড়ে চোখে অন্ধকার দূরে, আবার হর্ষের ধ্বনি
ঠেলে উঠি—। আহারে
পিঠে ছেলেদের লাশ তুলে
সোনার বিনাশ রেখো মহিমার আঙনার মত
অস্থরে এখনো কোথায়?

দেবী স্তোত্র

শৈলেন্দ্রনাথ বসু

উঠিছ পাবে ভবনে
উঠিছ পাবে ভবন
ভবনের মাঝে কে—
হিরো মদন আলো করে
দেবী বসেছে!

বাজে মঙ্গল চণ্ডিকা
ধূপধুনো আর বাজনা
C.I. A'টাই বাঁধিয়ে দিল
সাম্রাজ্যবাদী হাওয়া।

খাদ্য সংকট, খাদ্য দুখ
খাদ্য মূর্তিকে আনান
(কেন) বাগানেটেকে বলো আমি
চোখের জল আনান?

জমিদার আর মহাজন
প্রগতি হবে আসছে
মধ্যযুগের অন্ধকার হায়!
যা হয় খাবি খাচ্ছে।

এই যে খবি বেদের বজ
কপালে জোটে ছি!
মজুর খেটেও বাঁচার আছে
আহার পাবে কি।

বিস্ফরণ

রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

এক আকাশ অন্ধকারের নীচে দাঁড়িয়ে
ক্ষুধার্ত শিশুর কান্না
শোনো কি কি?
একটুকরো রুটি কিংবা,
এক মুঠো ভাতের জন্যে?
তবে, এসো, অনাবৃত করি
দিয়ো পরিচয়, ছলনা, মাহিষ্যের ভ্রুকুটী—
চাপচুপে হীন বিবস্ত্র যে মানুষ
পথ হাঁটছে।
ক্ষুধ, ক্ষুধার্ত অপমানিত....
তার কাছে ভয়?
উড়িয়ে দিক সে এবার ঢেকে-ঢাকা যত কিছু
দিয়ো প্রণাবের-বাণী!
দিব চাবো যেখানে যা কিছু অদ্ভুত।
বুকে গড়ন করো শুধু বিস্ফরণ।

সত্তর দশক

অমৃত মিত্র

হাতাই-এর মতো মনে উঠেছিল অকস্মাৎ
আর এখন পাটকাঠির মতো বেঁকে আসছে

মধ্যরাত্রির কণ্ঠনালি ছিঁড়ে তার যাত্রা ছিল সূর্যের দিকে
শেষ অব্দি চুপি চুপি অন্ধকারের কোটরে তার প্রত্যাবর্তন

অথচ হাততালির মধ্যে বাড়িতে সে প্রস্থান করেছিল
বুকে বেঁধে বলে যাচ্ছি এখন তার দিকে হাত বাড়িয়ে

কিন্তু সে মনে উঠেছিল, মনে উঠেছিল গভীর ভালোবাসার স্পর্ধায়
নিজেকে নিঃশেষ করে আলোকিত করেছিল কানাগলির মুখোশ

আর যৌবনে জমা আমাদের এই ষাট কোটির ধমনি।

P27635

দিস্ট ইডারে

শ্রীপতি নন্দী

ভারতীয় নির্বাচন ব্যবস্থাকে যতই কড়া নিয়ম বাঁধন করার প্রতি বিন্দু ত্রিশ বছরের কোন কালেই অপ্রাসঙ্গিক ছিল না, আজ তো নয়ই। স্বাধীনতা-উত্তর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাটার উপরে আবার চাপ বেড়ে শ্রেণীবিশেষ মালিকশ্রেণীর জোয়াল টেনে চলার আজ ইতিহাস ভারতীয় জনজীবনকে এক কঠিনতর অবস্থানে এনে দাঁড় করিয়েছে। এ সময়কার ব্যবস্থায় অভিশাপগুলি তাদের মারাত্মক কদর্যতায় না হলে যথেষ্ট মাত্রায় বর্তমান পর্যায়ে এক দুস্তর চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে।

যারা এসব নিয়ে সংগঠন ও প্রতিপালন তারা অবশ্যই বোঝেন, দেশের স্বার্থ অথবা দেশবাসীকে 'উন্নত' করলে তাদের চলে না, কিন্তু গণতন্ত্রবিরোধী 'চল বাজী' চালু রাখলে যদি তা স্বার্থ সিদ্ধির পথে বাধা না হয়ে একটি দুর্দান্ত হাতিয়ার হয়ে ওঠে, যদি তাদের বশংবদ জনবাদী দুর্নীতিমূলক জনদেবতা বলে ধ্যান করে তাহলে সে 'প্রাধান্যবিশেষের পক্ষপাতিত্বী অস্থির ক্রিয়া করে শাসন-শোষণের সেরাই ব্যবস্থা চালু রাখতে দুর্নীতিমূলের উৎসাহে সীমা না থাকাই স্বাভাবিক।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ব্যাপার-স্যাপারগুলি অবশ্যই যেমন তেমন হতে পারে না। পক্ষপাতিত্বী অভিযোগ অহর্নিশ বাজে আগে বিবাদিকী হয়ে চলেছে। তবে এ সমস্ত ক্ষেত্রে 'সার্বভৌম' জনসাধারণের জন্য নির্ধারিত কর্মসূচীটি যতক্ষণ হবার উপায় নেই; ব্যক্তিগত স্বার্থহানিগত সর্বস্ব ভোগাতের আকস্মিক বেআইনি উদ্ঘাটনায় প্রাণপাত করতে হবে, ভারতবিধির (১৯৫০) বিধান অনুযায়ী ভারতীয় সংবিধানের অনেক অংশে বাজেয়াপ্তযোগ্য হয়ে থাকতে হবে, এবং সংবাদপত্রে দেশী পুঁজির দুলাল ও বিদেশী পুঁজির দালালদের কাঁধে করে নিয়ে যন্ত্রের বসিয়ে দিতে হবে। অভিযোগ অস্বাভাবিকগুলির মধ্যবর্তী আদের জন্য বিবিধ কর্মযোগ আরো বিপুল; রাজস্ব আদায় ও নির্বাচন খরচ সমস্ত যোগাযোগী যোগাতে হবে, পুঁজিপতি মহাজনপ্রভু ও জমিদারপ্রভুদের সমস্ত ধাই মেটাতে হবে, বহুজাতিক নিগম ক্যাপিটাল ও আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণবাদী পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আত্মাহুতি দিতে হবে। ভারতীয় জনগণের কাছে সংসদীয় সংযোগ-সংযোগের নির্ধারিত সত্য এগুলি।

এখন দুশাটির একটি সাতকাহন আছে, দীর্ঘকালের শাসকগোষ্ঠী 'বাম' তকমা বলে যারা বশীভূত হয়েছেন বা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তাদের কাছে এসব কিছু অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু তাদের চরিত্রকে যা প্রতিফলিত হয়, চিন্তার তার প্রতিফলন সেই কেন? অবশ্যই মানুষ ভাবে আর কাজ করে তার শ্রেণী-অবস্থান অনুযায়ী। 'বামপন্থা'র মাতব্বরিকায় নিয়ম তাঁর গর্জন করে, নির্বাচনের দুর্নিবিড় ছায়াপথে শ্রেণী সংগ্রামের প্রলাপ করে, অন্য সময়ে নিরর্থক 'হক পাওনা' আর কেন্দ্রের 'সুবিচারে'র খোয়াব দেখে, বর্তমান 'জনতী' বুলির এলোপাথাড়ি বাক্যজালের একই রাষ্ট্রের প্রাদেশিক প্রচারকে (যেমন প্রাদেশিক 'বামফ্রন্ট' সরকার) 'গণসংগ্রামের হাতিয়ার' বলে বর্ণনা করে যে সময় খোঁয়াড়ে পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, তাতে আরো কোন ধারণা আছে কিনা তা ওরা নিজেরাই বিচার করুন, কিন্তু এতে করে বর্তমান আধা-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে দাবিদাওয়া যৌথভাবে হলেও যথেষ্ট পরিমাণে যোগসূত্রীয় আছে তাদের মতটা অবস্থান হয়েছে রাষ্ট্রের যথার্থ শ্রেণীচরিত্র উদ্ঘাটনের কাজে তার দুস্তর একাংশও নেই একথা জোর করে বলা যায়। পক্ষান্তরে, সমগ্র জনগণকে ক্লীব, নৈরাশ্যবাদী ও রাজনৈতিক করে রাখার প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তগুলি জোরদার হয়ে উঠেছে।

যা হোক, এবার আসল দুনিয়ার চিত্রে ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু শুধু তাদের শ্রেণীচরিত্র উদ্ঘাটিত হচ্ছে, আরো হবে। জনগণ সামাজিক মেহনতী চায় কি, রাজ্য সরকারের ক্ষমতায় হতে চায় কি, তবু কী বোমাবাজের উপায় হতে চায় কি, নির্বাচনের সময়ে হতে চায় কি, দেশের পুঁজিবাদ-সহ অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় চায় কি, পুঁজিপতির পুঁজিবৃদ্ধির চায় কি, কিন্তু সমস্ত এসব কিছু চাওয়া আর কিছু দেয় নি। জনগণ কাজের বদলে কি নিজেরা খাওয়ার সুযোগ চায় নি, সরকারের মতে উচ্ছেদের আতঙ্ক চায় নি, মন্ত্রীদের কাছে সততা নেই হয়ে থাকা চায় নি, কেউই পরিবার বাসা-বাড়ি ভাঙবে জেলখানার অনশন-অর্ধাশন চায় নি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য অগ্নিমূল্য কিংবা দুর্লভ আকাশচুম্বী চায় নি, অপুষ্টির পোষিত আর পালিত হতে চায় নি, পঁচিশ কোটি কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে প্রায় পঁচিশ কোটি বেকার-অর্ধবেকার চায় নি, আকাশছোঁয়া আর মন্ত্রীদের বিচারে সংসদীয় প্রতিনিধি চায় নি, পঞ্চাশ মাত্র পঁচিশ জন কোটিপতিকে প্রতিনিধিত্বকে সমগ্র জনগণের প্রতিনিধিত্ব বলে বুঝতে চায়নি কিন্তু ভারতীয় সংসদ ও নির্বাচন ব্যবস্থা এগুলি ছাড়া জনগণকে আর কিছুই দেয় নি। অতএব, নির্বাচন ব্যবস্থার শ্রেণীচরিত্র আর অজানা নেই

অতএব যে জনগণ আত্মবিকাশ চায় না সে জনগণ এ নির্বাচন ব্যবস্থাকেও আর চায় [illegible] যে জনগণ এ নির্বাচন ব্যবস্থাকে চায় না সে জনগণ অবশ্যই একে বাতিল করতে চায়। অতএব আর ঘটা করে [illegible] ভোট কিংবা পার্টি পাল্টি করে [illegible] হাত [illegible] [illegible] তারিফ অবশ্য করবার নেই, এটা নির্বাচনের পরিসংখ্যানে আরো [illegible] হয়ে উঠেছে। [illegible] পথ [illegible] আর [illegible] জনগণের [illegible] বাতিল। কোন দল যে বাতিল [illegible] চাল [illegible] কিন্তু জনগণের পক্ষে এ [illegible] এড়ানো সম্ভব নয়। নির্বাচন [illegible] সামাজীয় [illegible], বিদেশী [illegible] বিদেশী বাণিজ্যিক [illegible] জনগণ ছিঁড়ে দিতে পারে বাইরে অনুভূতি [illegible], সমাজ থেকে ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে [illegible] যে অভিজ্ঞতাগুলি যতই তীব্র হয় তীব্র হয়, যতই বস্তুগী তত ততই পথ খোঁজে। [illegible] ভোটাধিকারকে বাবে বাবে [illegible] করে অধিকারে বাস্তব [illegible] [illegible] আরো [illegible] করবে। কিন্তু যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন [illegible] প্রতিরোধ শক্তি নামাচ্ছে, অতএব বিফলতা। জনগণের নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় [illegible] সাংগঠনিক শ্রেণী বাহিনী এখানেই। [illegible] যে দলগুলি মুখে যা বলেও কাজের বেলায় বহুপূর্বতায় বিপ্লবী তাদের প্রচার [illegible] থাকুক আর না থাকুক তাদের সং-যোগ করে আনে, তাদের দুটি আরো [illegible] হয়ে আসছে যারা; অতএব কিছুটা 'সংকট' আহ্বান করেও আসলে কাজের চাইতে অকাজ বেশী করে তারা জনগণ থেকে বারে বারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অতএব, অবশেষের [illegible] বিচারবুদ্ধির (Pragmatism) দিক থেকে জনগণ ক্রমশ: দূরে [illegible]—আত্মপ্রবঞ্চনার পথ থেকে দূরে। জনগণ আত্মশক্তিতে দাঁড় করাতে চায়, কিন্তু দেশী-বিদেশী পুঁজির দিগগীরের [illegible] [illegible] বাহাদুরী কিংবা দিগগীর [illegible] কোন প্রাদেশিক 'হাতিয়ার'-এর মাধ্যমে এ কাজ হতে পারে না; যেমন [illegible] [illegible] [illegible] হিতে কাজ শুরু করেছেন, [illegible] লোক আর অধিকার লোক [illegible] বাকি টাকাতেই এবং সার্বজনীন 'অনুষ্ঠ [illegible]' না হলেও [illegible] করতে হবেই। শ্রেণী রাজনীতিতে 'সংগ্রামী [illegible]' আপনা-আপনি [illegible] সং-গঠনে রূপান্তরিত হয় না।

আক্ষরিক অর্থে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার থাকলেই যেমন জনগণ 'সার্বভৌম' হয়ে যায় না, সার্বভৌম সংসদ রচনা করতে পারে না যেমনি নির্বাচনের বোঝা হাতে পড়লেই সংসদীয় রুপটাও নষ্ট হয়ে যায় না।

যে সংসদ প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্ব করে না, এবং অদৃশ্যভাবে প্রধানত: ব্যুরোক্র্যাট-বিশেষজ্ঞ শাসন বা তন্ত্র (Techno-cracy) ও উপায়জ্ঞান (know-how) দেশের বুকে যৌথ শোষণের বিধি-বিধান রচনা করে, আসল শ্রেণী অভিপ্রায় তাদিয়ে [illegible] পুঁজিপোষণের প্রক্রিয়াকে [illegible] বড় মধ্যবিত্ত, মহাজনের, আমলা [illegible], ধনিক বা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিধিব চালায় সে সংসদ শুধুই যেমন তা সাংবিধানিক বৈধতার মুখস-ঠাকুরও বটে। আধা-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ও আধা-সামন্ত-তন্ত্রের সাথে মিটিয়ে নির্বাচনী গণতন্ত্র বেশুন বাজার একই মেজে দেখা হবে সাম্রাজ্যবাদী আমিদের বিভিন্ন ধূমপান [illegible] উচ্চ হয়ে উঠবে আর সব সংসদীয় প্রতীকা শেষ কোন মানবশিশু না জন্মালে কি হয়, সব দল আইনী ব্যাপার রক্ষা-[illegible] এ বাদর [illegible] [illegible] [illegible] কিভাবে অনন্তো চেয়ে যারা বেলুন-শলাকা [illegible] সংসদীয় নির্বাচনের খোঁয়া তোলে, জনগণ কি তাদের সঙ্গে আছে, থাকবে?

একই সাথে বৈরাগ্য বিরোধী এবং [illegible] অথবা [illegible] ছাড়া কিছুই নয়। সত্যি যে, বাণিজ্যরক্ষী নিকাশী-আমলা আসর [illegible] বাংলায় [illegible] প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার যে বৈদেশিক ঋণকে 'জাতীয় ঋণ' হিসাবে বহিঃ দেশবাসীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল, তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ দূরের কথা, একটা সংগঠিত প্রতিবাদ পর্যন্ত সঙ্ঘ তুলতে যারা এগিয়ে আসেনি, সাংবিধানিক বৈধতার পরীক্ষক প্রতিনিধিদেরও তারা জনগণকে পাশাপাশি তুলে ধরেনি। ব্যাপারটা এখানেই শেষ নয়। এ অনাচিন্তা পরিমাণ অধিক অসু-গতী বিপুল মুদ্রাস্ফীতি, সবচেয়ে বড়ো বোঝা ও বাণিজ্যিক তহবিলের সর্বনাশী ফিরে যেটাতে জনজীবন যখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো, তখনও আধা ঔপনিবেশিক অর্থ-নৈতিক বৈরাচারকে আড়াল করে তারাই বাবুলী সংসদীয় 'ডিবেট'কে আড়াল করে-ছিলো। আমরা অভিজ্ঞতায় জানি, আধা-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা কোন কিছুকেই 'রেখে ঢেকে' খায় না, একেবারে চেঁচে চেঁচে দম শুদ্ধ চুষে নিতে চায়, অর্থনৈতিক বৈরাচার চায়। [আমরা আরো জানি, একমাত্র স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলা ছাড়া মানুষকে বাঁচে রেখার অন্য কোন বিকল্প পথ নেই। কিন্তু যাদের মুখে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির আন্তা-পাশে জাতীয় অর্থনীতির সম্ভাবনাগুলিকে একেবারে জলাঞ্জলি [illegible] [illegible] করা হলো তখন আদর্শের জাতীয় অর্থনীতির কোন [illegible] অবধি যারা জনগণকে তুলে ধরতে পারেন কি, উপরন্তু আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-

সাম্প্রদায়িক মোল্লাচক্রের সংকীর্ণ ও সাংবিধানিক অভিলাষকে তারাও পন্ন করে দিয়েছিলেন, এটা নিশ্চয়ই তাদের মৌলবাদ বিরোধী ভূমিকা নয়। ঠিক যাত্রা আধাসামন্ততন্ত্র মৌলবাদী নবেই, তাদের মূলে সংকীর্ণ সাংবিধানিক মৌলবাদের শক্তি ও ভিত্তি নিহিত রয়েছে উপরোক্ত আধাসামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়। এ কারণেই ইন্দিরার মৌলবাদ ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে কোন বাপছাড়া ব্যাপার নয়—আধাসামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিহিত বংশগত উত্তরাধিকারবাদের দুর্গন্ধ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে ইন্দিরা দুর্নীতিকে তাকে নিজ সাংবিধানিক স্বার্থে কাজে লাগিয়েছেন মাত্র। অর্থাৎ সংকীর্ণ ও সাংবিধানিক মৌলবাদকে নষ্ট না রেখে যারা ইন্দিরার মৌলবাদকে ঠেকাতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন তাদের বলা উচিত তাদের এমন উদ্যোগকে সংবিধানবিরোধী বলে আখ্যায়িত করতে কোন বাধা নেই।

অনেক সেক্টরে হলেও একথা সকলেরই জানা উচিত, যারা মৌলবাদের ভিত্তিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখে, নষ্টে প্রতিরোধ করে না, যারা অদ্ভুত শক্তির উৎস অবশেষের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে আহবান করছেন থাকতে অক্ষম পায় তারা মৌলবাদ-বিরোধী সংগ্রামে জনগণকে নেতৃত্ব দেয়া দূরে থাক্, আপন অস্তিত্ব রক্ষা করতেও অক্ষম।

সোজা কথা, আধাসামন্ততন্ত্র মৌলবাদী হয় এ কোন নতুন কথা নয়, আবার আধাঔপনিবেশিক ব্যবস্থা মৌলবাদের ভিত্তি ছাড়া বাঁচে না, এবং সে একমাত্র মুনাফাখোরীর মৈত্রী সৃষ্টি করতে সক্ষম বলেও তা মৌলবাদভিত্তিক হওয়ার দিক-গতভাবে দুর্বল। কিন্তু ভারতীয় সাম্রা-জ্যবাদী তথাকথিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীদের বিরোধিতা বক্তৃতাসর্বস্বতাবে প্রধানত: বৈদেশিক প্রশ্ন নিয়েই এবং দেশীয় রাজনীতি-অর্থনীতিতে যথা উপনিবেশবাদের অধিকার অবসানকে তারা মনে করে না, সাম্রাজ্যবাদের কেবলমাত্র 'বাণিজ্য চাপ সৃষ্টি'তেই দেখে; একেবারে সাম্রাজ্যবাদ বলতে তারা একমাত্র পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি ও মার্কিন শক্তিকে জানে, কিন্তু সোভিয়েৎ রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজি, মার্কিন বণিক পুঁজি ও একচেটিয়া অধিকারসমূহকে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকায় দেখে না (সোভিয়েত 'নিজস্ব উপনিবেশবাদের' মেহনতি? সমাজতন্ত্রে আস্থায়ী ও আফগানিস্তানে এদের ভূমিকা)। তাহলে তথাকথিত বিরোধিতা আসলে কাদের স্বার্থ নিশ্চিত করে? নিশ্চয়ই জনগণের স্বার্থ-

সবারে করি আহ্বান—

"সম্পুট"

হাওড়া স্টেশন পাশের শৈত্য নিয়ন্ত্রিত বাজারের একটি অভিনব বিপণি

আপনার সংসারের দৈনন্দিন প্রয়োজনে—

কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পজাত দ্রব্যের বিপুল আয়োজন।

• ন্যায্য মূল্য • সুন্দর ক্রিয়ার পরিবেশ • নিশ্চিন্তে কেনাকাটার জায়গা

"সম্পুট"

● এখানে পাবেন—তাঁত • খেলনা • চাটাই • জামা-কাপড় • বস্ত্র • চৌকিশিল্পজাত দ্রব্য • পাটজাত • ধূপকাঠি • মোমবাতি • মাদুর • ছাতা • বেতের তৈরী সামগ্রী • রাসায়নিক ও পরিবিধ খাদ্য দ্রব্য • খেলাধুলার সামগ্রী • আরও অসংখ্য কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প উৎপাদিত দ্রব্যাদি সম্ভার।

✱ পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প নিগম ✱

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

৬৩, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩

প: ব: ক্ষুদ্রশিল্প বিভাগের প্রচার দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

অন্তত কোন উচ্চ-পরিষদে নয় এবং কাঠামো ও ব্যবস্থা অনুযায়ী কোনদিন সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে না, করবে না। বিরাট বাহ্যিক সংখ্যাগত এবং সংসদীয় নির্বাচন-ভিত্তিক, অতএব নিয়মতান্ত্রিক পথে গত নয় নির্বাচনেও এর ব্যতিক্রম সম্ভব হবে না, হতে পারে না, বরং এসব সংখ্যালঘুদের ভাবে দাবিয়ে রাখার সংস্কৃতি হয়ে উঠবে; যেমন, নির্বাচনের সংস্কৃত একটাই, দ্বিতীয় কোন সংস্কৃত নেই। অতএব, দুই ও তিনের বাইরে সংসদ করে নিয়ে নির্বাচনী সংগঠন আরও কাটা হচ্ছে, আরো নির্বাচনী হবে। এর মাধ্যমে উপায় সংগঠনের আরো আরো প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন, এর মাধ্যমে উপায় দেশের ব্যবস্থাকে আরও চালাতে সাহায্য প্রভাব-শাসন। তাদের রাষ্ট্রের মৌলিক অনুযায়ী রাষ্ট্রের স্বার্থে সংগঠন প্রশাসনকর্তা ক্ষেত্রে কখনও বিরোধিতা হয় না, আর সংবিধানী যেমন রাজনৈতিকভাবে 'সার্ভ-ভার' ভিত্তিতে রাখে না, তেমনই রাখে—সময়, প্রয়োজন ও সুযোগ অনুযায়ী অনুগ্রহের অপেক্ষায় থাকে। তবু যারা নিয়মতান্ত্রিক পথে নির্বাচনবিরোধিতা ও 'প্রগতিশীল প্রতিদ্বন্দ্বিতা'-র বিরোধে থেকেও কিংবা 'লেফ্ট অ্যান্ড রাইট'-এর কোলাহল রাখেন সে সব প্রশ্নে সুবিধাবাদীদের আসল উচিত প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক শোষণ যন্ত্র ও শাসনপ্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সামাজিক শক্তির প্রচেষ্টাকে এমন কি এখন কিছু সমাবেশেও এ আবহাওয়ায় ব্যবহার করবে না, তা যেমন ক্ষমতাসীন-শাসকের যেমনি রাইন পাঞ্জাবে অবস্থা পালনেও প্রমাণিত হয়েছে। পাঞ্জাব রাজ্য ভরিত যদি দুর্ভাগ্যে পেতে পাঞ্জাব ছোবল ছাড়া সপাটে কিছু ফোটে না। বিধান সভাই ছাড়া কেউই আর প্রকাশ্যে এ সুবিধাবাদীদের নেতৃত্বে দাবিদার হয় না।

অন্যভাবে দেখতে গেলে ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী যা কেন্দ্রীয় সংসদে ব্যবস্থিত তাই রাজ্য বিধানসভাগুলিতে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ দেশের সর্ব প্রান্তে সাম্য, অতএব রাজ্য বিধানসভাগুলির কোন বিশেষ গতিবিধি চলতে পারে না। কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের প্রক্রিয়া সর্বত্রই চালু থাকতে এবং সব বিষয়ে উপমহাদেশে শাসনকার্যের সুবিধার্থে রাজ্যের 'ইউনিট'-গুলির মোট সংখ্যা যতই, তার বেশী নয়। আসলে ভারতে তথাকথিত 'প্রতিনিধি সভা' একটিই এবং তা ভারতীয় সংসদ; বিধানসভাগুলি তারই অধীনে 'বাহীত'—অনুগত 'যুক্ত'। তারা যথা, সংসদ আরও উপনিবেশবাদী শাসকগোষ্ঠীর শক্তিগুলির ক্ষেত্রবিশেষকে প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের 'করে খাওয়া'র উপায় সংগঠিত করে, পরিচালনের পথ খুঁজে দেয়। প্রচলিত অর্থনীতিতে অবলম্বন করে গড়ে-ওঠা প্রশাসন যন্ত্র যে বিধানগুলিকে আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণে চালু রাখে এটাই বিধি; অর্থাৎ প্রশাসন ও সংসদ যথাক্রমে সমস্ত কর্মী ও দাবিদার, শ্রেণীগত মধ্যে শক্তি ও স্বার্থ। অন্যথায়, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কীয় সমস্যাগুলি, রাজ্য বিধানসভাগুলিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণের কৌশলগত প্রশ্নগুলি, রাজ্যে ক্ষেত্রে অস্বর্ণ সরকারগুলির সমস্যা, 'রাষ্ট্রপতির উপদেশ'র ও 'সংবাদের হাতিয়ার'-গুলোর প্রশ্নগুলি এত খাপ খায় না, এত অধিক দুষ্কৃতিকার বিচার এবং ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার সর্বস্তরে বাস্তব ভিত্তিতে এদের বিচার না করলে একদিকে যেমন ভারতীয় সামন্তবাদী দেবতাদের ও রাজ্য ভিত্তিক তাদেরকার বিষয় বিবাদ গোলকধাঁধা বিষয়গুলিতে চিনতে পারা যায় না, ঠিক তেমনি ভারতীয় স্বাধীনতার মূল্যবোধগুলিকে এবং সংস্কৃতি ও বিদ্রোহ শক্তিগুলিকে প্রসারণ করে চলার অর্থনৈতিকবাদী সুবিধাবাদী শক্তিগুলোর ভূমিকাকেও চিনতে পারা যায় না।

স্বাধীনতার পরে ইতিহাসের কাছে, মানবসভ্যতার কাছে, আন্তর্জাতিক সর্বহারার কাছে এবং সব রাজনীতির কাছে যত কেবল পুনরায় প্রশ্ন উঠেছে; যতই দিন কাটছে দেখার বাধ ততই বাড়ছে, ক্রমশঃ সংগ্রামী বিশ্বের জীবন উৎসব থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে তুলছে। সুবিধাবাদীরা প্রচারণা করে এখন কিছু ভারতের সর্বহারা ও প্রায়-সর্বহারা জনগণের কোন শক্তির এগোবার উপায় নেই। অতএব, অতীতের সমস্ত পথে বাধা (এড়িয়ে) যাকে সম্পন্ন করবে, অতীতের প্রমাণিত ভুল ও ত্রুটিগুলিকে সংশোধন করে চলবে, অতীতের মহামূল্য অভিজ্ঞতাগুলিকে কার্যকরী করে তুলতে ও বর্তমানের অভিজ্ঞতাগুলিকে সর্বহারার রাজনীতিতে প্রসারিত ও সংহত করতে নতুন সংবিধান ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুতি চাই এখন সবচাইতে বেশী। মনে রাখতে হবে, সব শিবিরের রাজনৈতিক ভিত্তি আগেকার মত এত দুর্বল আগে আর কখনও ছিল না।

জীবনায়ন

মৈত্রেয়

বিভাবতীর ব্যথা উঠল ঠিক সেই সময়। গভীর রাত। আকাশ ভেঙে বর্ষা নেমেছে। ঝড়ো হাওয়া। সারাদিন অসহ্য গুমোটে দম আটকানো অবস্থা ছিল। বর্ষা নেমে লোকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। কলকাতার বস্তিতেও লোকে স্বস্তি পাচ্ছে বটে কিন্তু এই বৃষ্টির তোড়ে তাদের উদ্বেগেরও শেষ নেই। চালের ফুটো বেয়ে দিয়ে চারিদিকে জল পড়ছে। বিছানা বাটোও। বালতি গামলা হাঁড়িকুড়ি পাত। তাতেও রক্ষে নেই। একটু পরেই নর্দমাগুলো বুজে উঠোনে জল জমবে উঠোন থেকে ঘরে ঢুকবে চৌকি ছুঁই ছুঁই হবে বাসনপত্র ভাসবে।

বিভাবতীর বাড়ির হালও এমনি। বাড়ির একটা মাত্র বেড়া বহুদিন ধরে এমন হেলে আছে যে এই প্রচণ্ড বৃষ্টির তোড়ে হুড়মুড় করে ধসে না পড়ে।

কিন্তু এসব চিন্তা এখন বিভাবতীর ছিল না। ব্যথার ধরণটা দেখেই বুঝেছে যে এটা আসল ব্যথা। দশমাস তো প্রায় পূর্ণ। ন'মাস পুরো চলছে। তাছাড়া বিভাবতীর অভিজ্ঞতা তো কম নয়! এই নিয়ে ছ'বার আঁতুড় ঘরে ঢুকবে সে। বড় মেয়ের বিয়েই হয়ে গেছে বছর চারেক আগে। ব্যথা খুব ভাল করেই বিভাবতী চেনে।

এবারে একটু মুস্কিল আছে। এবারে শাশুড়ি ছিলেন। হাঁক ডাক করা লোক-জন জোটানো থেকে আয়োজনের ব্যবস্থা সব তিনিই করতেন। পাড়ার লোকেরা শাশুড়ির হুকুম মানতে একপায়ে খাড়া। যেমন দশাসই চেহারা ছিল তেমনি দাব-দাই গলার আওয়াজ! কি দাপটের লোক ছিলেন। মাস তিনেক আগে তিনি গত হয়েছেন।

একটা সুবিধে যে বাড়িতে এখন উনি আছেন। বর্ষাকাল না হলে বাড়িতে ওঁকে পাওয়াই মুস্কিল হোত। যাত্রা দলের সঙ্গে কোথায় না কোথায় ঘুরে বেড়ান। বনগাঁ-গুড়ি শিলচর ঢাকা শ্যামনগর বর্ধমান আসানসোল খড়িয়া মেদিনীপুর মায় ঝালদা সবই ওনার খুব জেনেছে গোটা বিভাবতী। নইলে জীবনে একবার বর্ধমানের একটা গাঁয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোথাও যাওয়া হয়নি তার। আর ভূগোলও জীবনে চোখে দেখে নি সে।।

কিন্তু ও বাড়িটার ওপর বিভাবতীর কোন ভরসা নেই। যখন বাড়ি থাকেন চব্বিশ ঘণ্টাই কেমন যেন আত্মভোলা কেমন যেন উদাসীন। কথা বললে হুঁ হাঁ করে [illegible] তাকাতে পারে। সারা সকালটা হয়ত বই পড়েন বা একটা বাঁশের বাঁশিতে [illegible] দেখেন। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, '[illegible]। হলে [illegible] আরো উঁচু পারো।'

এতদিন সব মায়ের ওপর ছিল। বড় বড় ব্যাপারেই কেবল যোগাযোগ দিয়ে দাবী করে দৌত্যকর্তা। উনি শুধু হুকুম হুকুম টাকাটা দিলেই খালাস। শাশুড়ি কিছু বললে হেসে বলতেন, 'ও সব আমি কিছু জানিনা মা, ও সব তুমি জানো।' শাশুড়ি বাজখাঁই গলায় হেঁকে বলতেন, 'সব আমি জানবো খুকপোকা! তোর বউ বছর বছর নাতির পাল বিয়োবে আর আমি সব সামলাবো কেমন?' উনি মৃদু হেসে সরে যেতেন মায়ের সামনে থেকে মাথা নিচু করে। কখনো মায়ের কথার কথা বলতেন না।

এখন তো মা নেই। উনি যেন আরো অসহায় এখন সবই বিভাবতীকেই সামলাতে হয়।

সেই অবধি মোটামুটি সামলেছে।

এবারও কি যেতে হবে নাকি? যে সংসার যে মায়াবি এবার যেন ছেড়ে দাও। চার চারটে মেয়ে হয়েছে। ছেলেটা অবশ্য নেই। দশ মাসের হয়ে মারা গেছে। এর আগেও আর একটা ছেলে হয়েছিল কিন্তু মাইথান পড়তে না পড়তে আঁতুড়ে সে ঘর খালি হয়ে গিয়েছিল। এতটুকু পাখির বাচ্চার মত ছেলেটা মিনিট পনের বেঁচে-ছিল। বর্ণালোকের মাই তাকে বাঁচাতে পারেনি। কম আপশোস হয়েছিল বিভাবতীর। ভগবান আর মা কালীকে গালাগালি দিতেও ছাড়েনি। ছেলে যদি বা একটা দিলে তোমরা তাও রাখলে না!

ছেলে হয়, ছেলে হয় যেন অদ্ভুত! মনে মনে নমস্কার জানাচ্ছেন: ঠাকুর দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা জানাতে থাকে বিভাবতী বার বার।

অবশ্য একটা আশা আছে। আশা নয় ভরসা। শহরের ছেলেটা মারা যাবার পর শাশুড়ি তারাপীঠে গিয়ে মাদুলি এনে মা তারার থেকে ধরে এনেছিলেন। সে নাকি বড় জাগ্রত জায়গা। সেখানে কেউ যদি ঠিক ঠিক মানত করে সে মানত বিফল হয় না। কিন্তু মা তারা মুখ তুলে চাইবেন। যে মা তারা—

উঁহু করে পাশ বদলাতে গিয়ে বিভাবতী দেখে দুটো মেয়েকে নিয়ে। মেজো মেয়েটার গায়ে এর চাদরে ছোটটার গায়ে পা দিয়েছে। উঠে বসল বিভাবতী খাটের ওপর হাতে হাত চেপে। বসে বসেই পায়ের দিকে গেল। চালের আড়া থেকে দড়ি দিয়ে ঝুলছে হ্যারিকেনটা কমানো অবস্থায়। হাত বাড়িয়ে হ্যারিকেনের সলতেটা উসকে দিল।

আলোতে দেখল মেয়ে দুটো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মেজো মেয়ে কুসুমেশ্বরী বাঁ দিকে কাৎ হয়ে। আর ছোট মেয়ে চিৎ হয়ে বেঁকে শুয়ে। মেজোটা চিরকালই এক পাশ ফিরে শোয় ঠিক বাপের মত। আর ছোটটা চিৎ হয়ে ঠিক শাশুড়ির মত। কি জেদ কি আব্দার! ওদের ঘুমের শোওয়ার মধ্যেও সেই ভাবটা ফুটে আছে। কিন্তু দুটো মেয়েই কি সুন্দরী! কি রং গায়ের! হ্যারিকেনের সামান্য আলোতেও টকটকে ফর্সা গায়ের রং বোঝা যাচ্ছে। দিনের বেলা তো অপরূপ লাগে। বড়টাও খুবই সুন্দরী। তারা তিন বিভাবতীর যে একটাও তার মত চেহারা পায় নি। তা হলেই হয়েছিল আর কি। কালো বেঁটে তার ওপর মুখখানাও পেঁচির মত।

মেয়েগুলো সব বাপের ধারা পেয়েছে। বাপের চেহারা অবশ্য মেয়েদের তুলনায় আরো অনেক ভাল। গায়ের চামড়া এত ফর্সা যে ভেতর থেকে যেন রক্তের আভা দেখা যায়। অমন চেহারা এ বস্তিতে একটাও দেখা যায় না। বস্তিতেই বা কেন? কলকাতা শহরেই বা কটা দেখা যায়! দু তিনবার চিড়িয়াখানা যাদুঘর কালিঘাট যেতে যেতে কলকাতার লোকজন সে দেখেছে তো চোখটাই ধাঁধিয়ে দিয়ে। এমন একটাও সুন্দর মানুষ দেখতে পায়নি যার সঙ্গে ওদের চেহারার তুলনা করতে পারে। শাড়োবদের গায়ের রঙের সঙ্গে অবশ্য খানিকটা মেলে।

নিজের চৌকিতে ঘুমন্ত মানুষটার দিকে চেয়ে দেখল বিভাবতী। খালি গায়ে লুঙ্গি-পরা মানুষটা ঘুমোচ্ছে। হ্যারিকেনের আলোটা পড়েছে গায়ে। উঃ কি রং! কি টিকোলো নাক! ওর তলায় সরু কালো গোঁফ। পাতলা ঠোঁটদুটো গোঁফের নিচে। যদিও বা কিছু কি সুন্দর চেহারা।

বাবা অমঙ্গলের ভয় ভুলে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল সে মানুষটার দিকে। আজও সে ভাবতে পারে না এই সুন্দর রাজপুত্রকে কোন পুণ্যের জোরে তার মত কালপেঁচি স্বামী পেয়েছে। ব্যাপারটা আবার বিভ্রম ভীড় হবে সেটাই বোধহয় ছিল। নাঃ। আর দেরি করা চলবে না। খাড়া হেঁটে ডাকল মেজোমেয়েকে 'কুসুম ও কুসুম—'

ঘুমের ঘোরেই কুসুমেশ্বরী সাড়া দিল, 'কি।'

'একবার ওঠ। বাবাকে ডাক।'

'কাকে?'

'তোর বাবাকে আমার। আঃ' আধার খোঁচা মারা যন্ত্রণায় শরীর বেঁকে গেল বিভাবতীর।

কুসুমেশ্বরীকে ডাকতে হোল না। তার বাবা নিজের চৌকি থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

যন্ত্রণা সামলাতে সামলাতে মৃদুস্বরে বিভাবতী বলল, 'টাইম হয়েছে মনে হচ্ছে। আমায় হাসপাতালে যেতে হবে—'। অমনিই কুসুমেশ্বরীর বাবা ধড়মড় করে উঠে বসল, 'সর্বনাশ! এ যে প্রলয় হচ্ছে গো! এই সময়েই তোমার টাইম হোল? টাইম করার আর সময় পেলে না তুমি।' তাড়াতাড়ি করে চৌকি থেকে নামতে নামতে বলল, 'তখনই জানি সাবধান যে হাসা-হাসিটা করলে এ অবস্থায়! ও কুসুমেশ্বরী মা! মাগো একবার ওঠো, একটু ক্যাটাইমাকে ডাকো—মাগো মা কুসুমেশ্বরী।'

বাবার ডাকে এবার কুসুমেশ্বরী খাটে উঠে বসে চোখ রগড়াতে শুরু করল। আবার তাগাদা দিল কুসুমেশ্বরীর বাবা। তখন খাট থেকে নেমে দরজা খুলে বেরিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, 'ও বাবা, আমি ক্যাটাইমাকে ডাকতে যেতে পারব না। কি অন্ধকার! ভয়ে ছেলে যাচ্ছে সব।'

কুসুমেশ্বরীর বাবা হ্যারিকেনটা নিয়ে বাইরে এল। একটা গামছা মাথায় দিয়ে একছুটে ক্যাটাইমার বাড়ির দিকে চলে গেল কুসুমেশ্বরী।

বিভাবতী আর সত্যিই একটু বাড়া-বাড়ি করেছে। যদি অন্ধকারে একটা বিপদ

আছে যে যেমনই হোক দুর্গাপুজোর আগে বাড়িবাড়ি সাফসুতরো করে। ফাঁপের কুল বাড়ে দেওয়ালগুলো গোবরমাটি দিয়ে নিকোয়। বিভাবতী আশায় করেছিল পুজোর মুখোমুখি ও আঁতুড়ে থাকবে আর নয় কাঁচা পোয়াতি। অতএব ঘর নিকোনো মুগলাজা এসব কথাই উঠবে না তখন। অথচ বছরকার দিন লেজ বাড়ি এসব না করলে চলে! নিয়মপালা বলে একটা কথা আছে না। সেটা না থাকলে সেবার সংসারে লক্ষ্মী টেকেন কখনো? তাই আজ সকাল থেকেই যা হোক সাত সকাল কাজে লেগেছিল দুই মেয়েকে নিয়ে। তবু সেই নিয়েই বই লাগিয়ে দেওয়ালে চড়ে চুন ফেলেছে, গোবর জল বুলিয়েছে মেঝেয় বারান্দায়। ভুবনেশ্বরীটা একেবারে তিনশিশি। পাড়ার বিদ্যাময় পাঠশালায় পড়ে। পড়াশোনায় ভাল রামাবাবার ভাল কিন্তু এসব কাজে মোটে এগোয় না। বই চড়তে বললেই বলবে, 'ওরে বাবা! বাবা গোরে।'

অগত্যা এই অবস্থায় বিভাবতীই বইকে চড়ে ওঠানামা করে যা হোক নিকিয়েছে। শেষে বেলা পাঁচটা নাগাদ সাফসুতার মন থানতি বালতি ফেলে দিয়ে সাফ হয়েছে। তারপর খাওয়া দাওয়া করেছে।

ভুবনেশ্বরীর বাবা একবাটা মলোকথার বাইরে বসে কিছু ছবি রেখে থালাবাটা পেড়ে দিয়ে বইখাতা নিয়ে বাড়ির বাইরে চলে গ্যাছে।

আজ রবিবার ভুবনেশ্বরীর পাঠশালা ছুটি। সকালের দিকে বাপে একটু সাহায্য করে পরে চালাটা সেই করেছে। চালাটা জানাই করে। শুধু বড় ভাজের হাড়িটা একধার কাপড় ছেঁড়ে বাঁধিয়ে ক্যান গেলে দিয়ে গ্যাছে বিভাবতী। বইকে আইবুড়ো মেয়ে বাঁড়ি মাথাতে দিয়ে হাত পা পুড়িয়ে বসলেই চিত্তির। লোকে কে পোড়া মেয়ে?

আর বাবে কাল দিয়ে দিতে হবে তো। শাতে মন হয়ে গ্যাছে আর কদিন?

একটু পরেই নন্দবালা এলেন। বিধবা মহিলা। বিভাবতীদের পাড়াটে। আত্মীয়া কেউ নন। তবে এমন আত্মীয়ার চেয়েও বেশি। বিভাবতী ওঁকে দিদি বলে। ভুবনেশ্বরীর বাবা বলে বৌদি। ভুবনেশ্বরীরা বলে জ্যাঠাইমা। বোসেদের বাড়িটা বিভাবতীর শাশুড়ির বাপের। জমিটা কিন্তু তাদের নয় জমিদারদের। মাস মাস খাজনা দিতে হয়। নন্দবালা অনেকদিন আছেন দুখানা ঘর নিয়ে। নতুন অবস্থায় এসেছিলেন এই বাড়িতে স্বামী দুই ছেলে এক মেয়ে নিয়ে। এখানেই বিধবা হয়েছেন। মেয়ের বিয়ে হয়ে গ্যাছে বড় ছেলে চাকরি করে। মায়ের কাছে থাকে না যাবে যদি হাত খরচ হয়। একটু বাউণ্ডুলে প্রকৃতির। ছোট ছেলেটি থাকে দাদার কাছে। পড়াশুনো করে মেমো-সাহেবদের ছবি বাঁধাইয়ের দোকানেও বসে।

নন্দবালা নিজের খরচ নানান বাসা করে জোগাড় করেন। ঠোঙা তৈরি করে সুপুরি কুচিয়ে তাকপালের গড়ন ছেঁটে লোকের চুড়ি কুঁচিয়ে দিয়ে। একলা বিধবার কিই বা খরচ। কিন্তু এতেই দুঃখ যে তাও ওঠে না। কারণ কাজ তো বেশি নেই। মাসে দু চারদিন হোম পাওয়া যায় কিছুই হোম না।

উঠোন পার হয়ে আসতে ভুবনেশ্বরী আর তার জ্যাঠাইমা দুজনেই বেশ ভিজেছে। ভুবনেশ্বরীর বাবা তাড়াতাড়ি মেয়ের মা বাবা মুছিয়ে দিতে লাগল কোঁচার খুঁটে। নন্দবালা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খবর ঠাকুরপো?' 'আর খবর। এত জল কাদায় তোমার বাড়ি টাইম করেছেন বৌদি আর টাইম পেলেন না।'

রাত কাল ভুবনেশ্বরীর বাবা নিজের ঠাকুরপো ইংরিজি টাইম কথাটা নিয়ে। নিরক্ষর বিভাবতী অমন দু একটা ভুল ইংরিজি কথা বলে। তখন কথাটা চট করে তার মুখ দিয়ে বেরোয় না বেরোয় 'টাইন্'।

নন্দবালা বিভাবতীর কাছে গেলেন।

'তা ওর আর কি দোষ ঠাকুরপো এতে তো আর ওর হাত নেই। এসো বউ।' বিভাবতীর হাত ধরে তাকে খাট থেকে নামতে সাহায্য করলেন নন্দবালা।

'কেমন বুঝছ?'

ফিসফিস করে বিভাবতী বলল, 'বেশি দেরি নেই।'

বিভাবতীর ঘরের থেকে বেরিয়ে ডান দিকে সিঁড়ির ছোট ছোট ঘর। সেই ঘরটা হচ্ছে ছোট। অন্দরমহলের কাঠ কয়লা ঘুঁটে হাঁড়িকুঁড়ি নানা জঞ্জাল থাকে। আঁতুড় হলে এটাই আঁতুড় ঘর। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই বিভাবতী ঘরটাকে পরিষ্কার করে রেখেছিল। একটা ছোট তক্তা তক্তপোষের পায়া আছে। তার ওপর ছেঁড়া কাঁথা পাতা। মাথার ছেঁড়া কাপড়ের তাকড়া জড় করে রাখা। সব লাগবে।

নন্দবালা বললেন, 'জ্বেলে একটা ল্যাম্পো জ্বালিয়ে রেখে যাও তো ঠাকুরপো।'

ভুবনেশ্বরী লম্ফ জ্বালিয়ে রেখে এল সে ঘরে। নন্দবালা বিভাবতীকে ধরে ধরে নিয়ে গেলেন সেখানে। ভুবনেশ্বরীর বাবা হারিকেন তুলে ধরে আলোর পথ দেখান।

বিভাবতীর ঘরের বাঁ পাশের ঘরের দরজা খুলে বড়ো জোনামাথ পাল বেরিয়ে এলেন। ইনিও নিজের বড়ো নন। ভুবনেশ্বরীর ঠাকুরদার আপন বন্ধু। ভুবনেশ্বরীর নিজের ঠাকুরদা কবে মারা গ্যাছেন কিন্তু ইনি এ সংসারে জড়িয়ে গ্যাছেন। হয়ে গ্যাছেন ভুবনেশ্বরীদের দাদু বা দাদামশাই হবে। ভুবনেশ্বরীর বাবা জোনামাথকে

...দের মতই হাত ... যায়। বিভাবতীর উঁচো বিয়ের বয়স হলেই যাবে। ভোলানাথ বললেন 'কি ব্যাপার চলেছে? উনার কি—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', ঘাড় হেঁট করে উত্তর দিল ভুবনেশ্বরীর বাবা।

'বাইকে তো খুব দেখা যাচ্ছে। ... না খুব কাণ্ড চলছে।'

'আজ্ঞে আমি দেখছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

বিভাবতীর বাড়িটা বস্তির মধ্যে নয় ... উঁচু বাড়ি চট করে উঠেছে না হাওয়া ... না দুই বেশি হলেও। কিন্তু সেই ওঠেনি পাড়ার পাড়া ডোবা জল ... এই ভোরে আর আশেপাশের ... উঁচু বাড়িটায় ঢুকবে। ফলে ... বিশেষ কিছু শোনা যাচ্ছে না।

ভুবনেশ্বরীর বাবা চাদর মাথায় দিয়ে ... গেল বাইরের দিকে।

'বেলাদিদি ও মেজদিদি', ভোলানাথ ডাকলেন ভুবনকে।

ভুবনেশ্বরী কাছে আসতে বললেন, 'পাঁচ দিয়ে চেখে দেখ মেজদিদির কাছে চলেই যাচ্ছি যেন।'

'তাই হবে হারাধনদা?' বড় বড় চোখে চেয়ে হারাধনদাকে জিজ্ঞাসা করল ভুবনেশ্বরী।

'হ্যাঁ এখন বিদায় তাই। আমি বলছি বেশে নিও' ভুবনেশ্বরীর খুব আনন্দ হোল তবে। ছুটে গিয়ে বড়দাদাকে বলল, 'বাউ বৈরা হারাধনদা বলছে এবার নাকি তাই হবে? সত্যি বড়দাইদা?'

বড়দাদা বললেন, 'সবাই তো সেই জানবাই কচি খোকা। কাকে কখন কি বলেন। তুমি এখন থেকে এসব যাও। কাজেই যেতে ভাবলেই যাবো নাই।'

কলের আওয়াজ করতে বিভাবতীর আর চিৎকার করে বাইরে আসতে লাগল।

ভোলানাথ নিজের ঘরে আর খাতা করে বসেছিলেন। পাঁচ বেজে উঠল। সকালে সাড়াতে এল ভুবনেশ্বরী হারাধনদাইদের কাছে।

'বাড় হারাধনদাই, তাই তাই হয়েছে।'

পকেট ঘড়িটা হাতেই ছিল। চশমাও চোখে পরা ছিল। বালিশের অবধি মাথার কাছে। কোলে রাখা বাঁধানো যেনো খাতাটার কালোকালির লেখাতে কলম ডুবিয়ে লিখলেন ভোলানাথ: শ্রীমান চন্দ্রনাথের প্রথম পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। কলিকাতা নয়া বাড়ি দুইটা বাজিয়া সাতচল্লিশ মিনিট পরের দেখেও। তার চোখেই তার রবিবার সন ১৩০১। দেশের খাতা ভরতে লাগলেন ভোলানাথ। তার একটু পরেই ভুবনেশ্বরীর বাবা চুলন হাতে তার পেটমোটা কালো তামাকী বাগান। শিশুর শিশুর চুমন পাঁচ পাউন্ড পড়া এ পাড়ার সকলের পরিচিত বড় ডিবিরদি। খ্যাঁকখেঁকে গলায় বলে উঠল, 'এ কি শাঁখার কেটে বাগান করাতে যাব নাকি গো।'

দুই

দেবব্রতের অন্নপ্রাশন খুব ঘটা করেই করার ইচ্ছে করেছিল চন্দ্রনাথ। অন্নপ্রাশনটা পড়তে মাঘ মাসের শেষদিকে। অঘ্রাণের থেকে ছুটি পাওয়া খুব শক্ত ওই সময়টায়। ওই সময় খাতার বছর। পুজোর সময় থেকে হালখাতার কাজ শুরু হয়। শেষ হয় চৈত্র মাসে। পৌষের পর থেকে চৈত্র পর্যন্ত একেবারে চরম। আর এখানে তো কাজ সেখানে পাঁচবার যেমন এ কোণ থেকে সে কোণ। চট্টগ্রাম নোয়াখালি ঢাকা ময়মনসিংহ, ওদিকে হাওড়া হুগলী চব্বিশ পরগনা বর্ধমান বীরভূম আসানসোল ... আমায় সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে হয়। আবার কাজের চেয়ে কলকাতার পর বড় বড় কারোবারির দুর্গ পড়ে থাকে। হাতীবাগান সোনাপট্টি ভুলোভট্টিতে বড় বড় বাজার আসত বসে।

ভুবন অধিকারীর হলো চন্দ্রনাথ এখন প্রধান এজেন্ট। আদিপুর পাড়াটার বেশ নাম হয়েছে। প্রাণপণ খেটে তাকে আদিপুরের পাট করে। জীবন যাচ্ছিল। এখন মধ্যে তার নাম বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। তাই তো ভুবন অধিকারীর হলো বাঁধা রেখেছে। নারেকতা তার নাম করে খুব ... করে। চন্দ্রনাথের নাম মাইনেও এ বছরে বেড়ে পঁচিশ পঞ্চাশ টাকা হয়েছে। তবে না পাস হচ্ছে। বর্ষার তিনমাস বন্ধ হলে থাকে তার মাইনে নেই। কাজ বন্ধ নিয়েছে সে। অনেকগুলো ছেলেকে পেয়েছে তারা আদিপুরের পাট করে। গোটা তিনেক লোকের ছেলেও আছে তার মধ্যে।

পাড়াটা নিয়েছেনও চাটুয্যে মশাই। কি ভাগ্য! শেষ দুটো কি করল। তারা আদিপুর বন্দ বোরো ধান যাচ্ছে। তার পর সরাও ফসলের চেহারা নিচ্ছে। অভিমানী ... দুই কান চন্দ্রনাথ। কপালে ঘাম ... নিয়ে চক্ষু ওঠা ভাবায়। পড়ায় আওয়াজ আসেনা করে। অভিমানে বাবাকিতা আসছে চেষ্টা করে। অবশ্য বাবাকিনের অস্বাভাবিক চিৎকার যেন করলেই হয়। অধিকারী মামেরা এখন মশাই রাজী করে।

পঞ্চমী পুজোর পরে মাঘ মাসের শেষে দেবব্রতের অন্নপ্রাশনের একটা দিন ঠিক করল চন্দ্রনাথ। সেদিন বাড়ির খুব কাছেই একটা বাড়ার পাওয়া যাবে ... আছে। সে বলেই দিয়েছে ... মাথায় আগে সাধ আজও করলে ... পারে না।

দেবব্রত নামটা খুবই পছন্দ হয়েছে সকলের। দেবেনের একটাও পছন্দ হয় নাম দিতে পারেনি সে। বাড়ির ওপর

কথা বলার অবস্থাই ছিল না তার। মা ছিল প্রচণ্ড রকমের শাক্ত। কালীভক্ত। ইদানীং লেখাপড়া শিখে পরে চৈতন্যের মত লেগে থাকত। মাথায় জটাও তৈরি করেছিল। মেয়ে হবার পরে পরে নাম ঠিক করত মা। সব কালীর নাম। প্রথম মেয়ে ষোড়শী। দ্বিতীয় ভুবনেশ্বরী। তৃতীয় শিবানী, পরে মেয়ের কেউ আর নাম বেছে নাম পালটে চণ্ডী। চতুর্থটা মেয়ে হবেই এত বিরূপ হয়েছিল যে নামই রাখে নি। সেই ভাবে ফুলের মত মেয়েটার নাম রেখেছিল চন্দ্রনাথ পুষ্প। মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হয়েছিল পুষ্প মেয়েটা। শরীর যেন একরাশ জুঁইফুল। কিন্তু বাঁচল না। বাঁচল না ওই হাতেরই জন্য।

পুষ্পের বাম হাতে বাড়তি একটা আঙুল হয়েছিল কড়ে আঙুলের দিকে। ঠিক কড়ের মত ঝুলত। হাত নাড়লে দুলত সেটা। তাই দেখে ভুবনেশ্বরী বলত ষষ্ঠী নাচ্চা বাবুর সব সময় ষষ্ঠী নাড়ছে। সবাই আনন্দ পেত। মেয়েটা বোধহয় বুঝতে পারত। হাসত আরও বেশি করে নাড়াত।

একদিন কথায় কথায় চন্দ্রনাথ মাকে বলল, 'মা, এত রূপসী মেয়ের একটা খুঁত হয়ে গ্যালো।'

মা তখন কিছু বলল না। কাউকে কিছু না বলে দুদিন পরে বনবাদের মেয়ে-টাকে নিয়ে গিয়ে কোথা হাসপাতাল থেকে বাড়তি আঙুলটাকে অপারেশন করে বাদ দিয়ে আনল। সেই রাতে প্রবল জ্বর এল পুষ্পর। পরে তড়কা। ভোর বেলা মারা গেল মেয়েটা। চন্দ্রনাথ আগের রাতে যাত্রা গাইতে গিয়েছিল। সকালে বাড়ি ফিরে এসে মেয়ের শবদেহ বুকে জড়িয়ে শ্মশানে নিয়ে দাহ করে এল। একটা কথাও বলেনি মাকে। কোন অনুযোগ অভিযোগ কিছু না। মায়ের দোষ কি। সবই ভাগ্য। মা তো ভাল করতেই চেয়ে গিয়েছিল কাজটা।

সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা সেটা ঘটল আরো একদিন পরে। বিভাবতী ডাল সিদ্ধ করে রাঁধছিল। শাড়ির আঁচলও ছিল তার পরে। হঠাৎ দেখল শাড়ির আঁচলের খুঁটে কিছু বাঁধা আছে। সেটা খুলতেই দেখল পুষ্পের কাটা আঙুলটা। হাসপাতাল থেকে শাশুড়ি সেটা আঁচলে বেঁধে এনেছিল কেন কে জানে। হয়ত গঙ্গায় দেবে বলে। বিভাবতী দেখেই চিৎকার করে উঠে সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

ছেলের দু তিনটে নাম ভেবেছিল। সেগুলোই মনে মনে তোলা রেখেছিল চন্দ্রনাথ। একটা রূপেতে দু নাম ভাবিছিল তিন নম্বর ছেলের। শেষ অবধি দেবব্রত নামটাই বহাল রইল। জ্যোতির্ময় নামও দেবব্রত নামটাই পছন্দ করলেন। বললেন, 'ভালো নাম বেশ নাম। তবে নামটা শেষ অবধি ভীষ্মের মত চিরকুমার থাকবে না তো রে—'। চন্দ্রনাথ যথারীতি বাবা কিছু বলে নিঃশব্দে হেসেছিল। বিভাবতী শুধু একদিন বলেছিল, 'অত শক্ত শক্ত নাম রাখা কারো যে বাপু। উচ্চারণই হয় না আমার মুখ দিয়ে। দেবোব্রত! বাপ্স্:। আমি বাপু দেবু বলেই ডাকবো।'

চন্দ্রনাথ একটু হেসে ছেলেকে আদর করতে করতে বলেছিল, 'বেশতো তাই ডেকো। সবাই তাই বলেই ডাকবে।' আপনমনে বলেছিল, 'ছেলেটা আমার ভালো হোক ভুবনের মা।'

বিভাবতীরও এ দুঃখ ছিল। মেয়ে-গুলো অত সুন্দর ছেলেটা হবে হয়ত সে তুলনায় কালোই হবে। এ আশঙ্কাটাও যেন তারই। কারণ সে নিজে কালো কুচ্ছিত। বলল, 'এখনো ভালো বোঝা যাচ্ছে না। দিদি বলছিল রং ইঁদুর মত হয় পরে না। তবে একেবারে ফেলনা কুচ্ছিতও হবেনা। আর বেটাপুরুষের কালোও ভালোই হবে।'

চন্দ্রনাথ শুনে আর একটু হেসেছিল। যাই হোক বেঁচে থাকুক। ছেলেকে সব আর বলিয়েছে। মনের মত করে মানুষ করবে ছেলেকে। নিজে যা পারেনি সব ছেলেকে দেবার চেষ্টা করবে। ভাল করে লেখাপড়া শেখাবে। এ আক্ষেপ তার চিরকালের। ভাল করে লেখাপড়া শিখতে পারেনি সে নিজে।

আচ্ছা ন বছর বয়সে মা তাকে যাত্রা দলে দিয়েছিল কেন? এতই অভাব ছিল? উঃ কি দুঃসহ জীবন! প্রথমে শিবির দল থেকে দিনে হতে উঠতে এই সুন্দর ছেলেটাকে কি রকম শক্তি দিল অর্থ পরি-বেশের মধ্যে দিয়ে চলে আসতে হয়েছে তা কি কেউ জানে? আর যাত্রা? বারোয়ারি বাইরে পর্যন্ত। ভাবতেও ঘেন্না। সেখানে তারা তাকে মেয়ে সাজিয়ে কামনার শিকারের ব্যবহার করেছে।

কিন্তু তার জন্য চন্দ্রনাথ মাকে একটুও দোষ দেয়নি কোনদিন। যখনি বাড়ি থেকেছে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে তবে সকালের দাঁত দিয়েছে। যাত্রাদলের অন্ধকার জীবনের ক্লেদের কথা একদিনের জন্যও মাকে জানায়নি।

আর মায়ের মৃত্যুর পর বাকি পাঁচ বছরের কথা ভেবে। দুঃখও হয়। বিভাবতীর প্রতি কম অত্যাচার করেছে মায়ের? অথচ চন্দ্রনাথ বিশেষ করে জানত যে বিভাবতীর কাছে সে দেবতা। তাকে সে মনের মত ভক্তি করত ভক্তের মত ভালবাসে। দিনের দিনগুলি পরে পরেই যখন বাড়ি ফিরেছে মা বিভাবতীর বিশেষ দুঃখ হয়েছে। তার রূপ নেই। কালোকুচ্ছি কুৎসিত। তার গুণও বাকি কিছু নেই। চন্দ্রনাথ হয়ত বলতে পারত, 'এই মেয়েকে দেখে তবে পছন্দ করে যার পরের বছর বয়সে আমার

মাকে ভুলিয়ে দিয়েছ না ভুলিছি, এখন এসব বলে লাভ কি?' কিন্তু বিষ্টুর নির্দেশের চন্দ্রনাথ বাস্তুত্যাগী বটে। কিছুই বলেনি। শুধু মাকে দেখিয়ে অকালে বিভাবতীকে বলে দিতে হয়েছে, এমন কি তার পাছে ... ডুকরেও হয়েছে।

পাড়াতেই শ্বশুরবাড়ি চন্দ্রনাথের। মায়ের বুকে চুলের মুঠি ধরে হির হির করে টেনে নিয়ে বিভাবতীকে বাপের বাড়ির দরজার কাছে ফেলে দিয়ে আসতে হয়েছে। শুধু চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাচ্ছে কিনা দেখতে পা পথে এসে দাঁড়িয়ে থাকত। চন্দ্রনাথ বিভাবতী যদিও পাড়ারই মেয়ে-... তবু এ ভাবে তার অন্দরে যাওয়া কেউ দেখে! পাড়ার মেয়ে পুরুষ সবাই দেখত। হাসাহাসি করত।

কিন্তু বিভাবতীও আশ্চর্য মেয়ে। ... কিন্তু একটা প্রতিবাদ করেনি। চন্দ্রনাথ বাপের বাড়ি যাওয়ার চেয়ে একেও সে বাপের বাড়ির চুকত না। চন্দ্রনাথের পিছন পিছন ঘোমটা দিয়ে এসে শ্বশুরবাড়ির দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত হয়তো সেবারের মত। মায়ের বাদ সত্ত্বে বাড়িতে প্রবেশের পুনরাধিকার লাভ করত।

অন্নপ্রাশনের দিন বেশ লোকজন খেল। প্রায় সব সত্তর পাড়া-পড়শি চন্দ্রনাথের বাজারের ফর্দ মত কিনিয়ে। চন্দ্রনাথের বাড়িতে জায়গা নেই। খাওয়ার ব্যবস্থা হল জোড়াবাংলা পাড়ার প্রতিমা গড়ার আটচালায়। সরস্বতী পুজোর পরে এমন ফাঁকা থাকে ওই আটচালাগুলো।

ছেলেটাকে প্রোট সাদা মুখে ভাত দিয়ে গেল। বেশ মোটা হয়েছে ছেলেটা। তেমনি গায়ে সবার সব হাত হাতে সোনার বালা আংটি গলায় সোনার হার মুখে চন্দনের ফোঁটা পরা ছেলেটাকে কোলে নিয়ে খুবতে বেশ লাগছিল চন্দ্রনাথের। এতগুলো মেয়ের পর সে কিন্তু কোথায় যেন একটা কিছু নেই বলে মনে হোত। আজ সে ফাঁকটা ভরে গেছে সে গর্ব তার চোখ মুখে বোঝা যাচ্ছে।

নিজের গায়ের রঙের পাশে ছেলের রং কালোই লাগছিল এমন কি মেয়েগুলোর পাশেও। লোকেরা অত সকলেই বলছিল ওরে বাপ মুখ চোখের প্রশংসা করছিল সবাই। বলছিল সব মিলিয়ে ছেলেটার মুখখানা মিষ্টি।

বড় মেয়ে যোগমী এল বটে কিন্তু বেশিক্ষণ রইল না। বড় জামাইয়ের বেশ বড়লোকি চাল। থাকে কলকাতায় চন্দ্রনাথের বাড়ির মত কাছেই কিন্তু কোঠা-বাড়িতে। ভাড়া করা বাড়ি অবশ্য। জামাই বলার মত কিছু করেনা। মাঝারির দিকে কোন কিছু সম্ভাবনা আছে তাই জাহির যায়। এখানে বড়লোকদের মোসাহেবী করে লাহাবাবু দেবাবু বোসবাবুদের সঙ্গে ওঠাবসা করে।

যোগমী সুখী নয়। চন্দ্রনাথের কাছে এসেছে বড় জামাই অর্ধেক দিন রাত্রে বাড়ি ফেরে না আর ফিরলেও সুস্থ অবস্থায় ফেরে না।

যোগমীর মুখখানি খুবই শুকনো বিষণ্ণ। অত সুন্দরী মেয়ে চোখের কোণে তার কালি পড়েছে। রোগা হয়ে গেছে বেশ। কোলে বাচ্চা আসে এখনো ছেলেপুলে হয়নি। বেলা চারটে নাগাদ এসে চন্দ্রনাথকে বলল, 'যাই বাবা।'

প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিল যোগমী।

'সে কি! এখুনি যাবি কিরে! আর রাতটা থেকে যা।'

'না বাবা। রামচরণ নিতে এসেছে। তোমার জামাই খুব রেগে আমায় দেখতে না পেলে অনর্থ করবে।' একটু চুপ করে থেকে মুখ নিচু করে আবার বলল, 'তুমি তো জানো বাবা তোমার জামাই এখানে আসাটা পছন্দ করে না।'

মেয়েমানুষ আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে যোগমী চলে যায়। চন্দ্রনাথ চুপ করে থাকে। ভাল করে মেয়েকে আশীর্বাদটাও করতে হতে ওঠে না তার। সে জানে জামাই তাঁর ... পায় শ্বশুরের পরিচয় দিতে। শ্বশুর যাত্রা করে বড়িতে থাকে। তাই শ্বশুরকে তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না। চন্দ্রনাথ নিজে নিয়ে অনেক করে বলে এসেছিল জামাইকে আর তার বিধবা দিদিকে। তাই চাকরকে দিয়ে ছোট্ট ... গাড়িতে দিয়েছিল রূপোর থালা বাটি কিছুক দিয়ে লৌকিকতা রাখতে। কিন্তু কি বলবে চন্দ্রনাথ? জামাই তার থেকে মোটে পাঁচ ছ' বছরের ছোট। চেহারাটা ভাল। সবের সিল্কটাকে দিয়ো থাকে। বিদ্যুৎ বাটিকে মেয়েমানুষ ... মতিভ্রম করতে দেখেছে চন্দ্রনাথ। যেমন গায়ের রঙ তেমনি চেহারা তেমনি অভিজাত। তারিফ না করে পারেনি সে।

সম্বন্ধটা যাত্রা দলের মাধ্যমে চন্দ্রনাথই যোগাড় করেছিল। তখন মনে হয়েছিল ভাল বর। মোটামুটি লেখাপড়া আছে। অভিজাত আছে। কলকাতায় কোঠা-বাড়িতে ভাড়াবাড়িতে থাকে। এ পাত্র কোথায় মেলে। তখন কি জানি যাত্রার এ্যাক্টর সে। কোন মাইনে হয়নি। এ পাত্রের চেয়ে ভাল পাত্র যোগাড় করা চন্দ্রনাথ ভাবতেও পারেনি পাওয়া যাবে বলে। তাই তেমন খোঁজ খবর না নিয়েই বিয়ে দিয়েছিল যোগমীর। দুবার করে প্রচুর খাওয়া দেয়া করে। নাম ছিলেন কত তাড়াতাড়ি একটা কোঠাবাড়িও ভাড়া করেছিল।

হুঁ। বিভাবতীর সে কি আনন্দ হয়েছিল কত। নাম কোঠাবাড়িতে থাকতে দিলে। জীবনে কখনো কোঠাবাড়িতে

থাকে কি বেচারা। ইটের দেওয়াল ভর্তি বসবার ঘর। বাড়ির মধ্যেই কল পায়খানা। তিনকাল দরজাওয়ালা ঘরের জল আর বস্তির দরজাওয়ালা পায়খানা ব্যবহার করাই তার অভ্যাস কি বাপের বাড়ি কি শ্বশুর বাড়ি। অথচ তিনকাল বাকে যে কে নেই। পুনর্জন্ম। কিন্তু সেই তিনকালের স্মৃতি বিজয়বতীর জীবনে অক্ষয় হয়ে আছে। চার বছর পরেও মাকে তাকে বলে ওঠে, 'মধু কোটাবাড়িতে ছিনু—'

সব মিটে গেল নমাস মধ্যেই। বউটার মধ্যেই বাজার আসরে পৌঁছে গেল চন্দ্রনাথ।

সে রাত্রে অভিনয় করতে গুরুই কষ্ট হচ্ছিল তার। ঠিক মন লাগছিল না। মনে ভাবল হবেই! সামান্য বা বাটা বাড়ুনি আর দুশ্চিন্তা!

যাত্রার আসরে বারণ ভিড় হয়েছে। অনেক লোক এসেছে চন্দ্রনাথের নাম শুনে বিশেষ করে তার বাবা আদিনাথের পার্ট দেখতে। এই ভিড়কে শোনাবার জন্যে একটু চীৎকার করতে হোল চন্দ্রনাথকে। কিন্তু খানিক অভিনয় করতে গিয়ে মনে হোল গলাটা নষ্টই চিরে গ্যাছে। তৃতীয় অঙ্কের শেষদিকে গলাটা এত বসে গেল যে আওয়াজ বার করাই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াল।

কোনরকমে অভিনয় শেষ করল চন্দ্রনাথ। শেষ দৃশ্যটা খুব সংক্ষেপ করে চালাল। দর্শকরা হতাশ হোল। শেষ দৃশ্যের পর সাজঘরে ফিরে অন্যদিন যেমন ভিড় জমে অভিনন্দন পায় আজ তার কিছুই নেই। বুঝল তার অভিনয় আজ দর্শকদের হতাশ করেছে। করবেই। যাত্রা অভিনয়ের প্রথম সম্পদ অভিনেতার কণ্ঠ। সেই কণ্ঠ আজ সাথ দিল না। কিন্তু গলাটা অস্বাভাবিক জ্বালা করছে কেন? চিরে গেল নাকি সত্যি সত্যি?

সকালবেলা গোলা বাড়িতে ফিরে এল। স্নান করে মুখের রং তুলে মুখ মুছে যত্ন করে কেশে হাতের উপর থুথু ফেলে দেখল চন্দ্রনাথ। না রং নয়। সত্যিকারের রক্ত। বেশ ভয় পেল সে। মাঝে মাঝে এমন হয়। তবে কয়েকদিন গলাকে বিশ্রাম দিতে হবে বোধহয়। অন্তত আদিনাথের অভিনয় করা চলবে না।

চন্দ্রনাথের মোটা চামড়ার হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসার বাংলা বই আর একটা নানা রকমের ওষুধের বাক্স ছিল। ওটা বাইরে বেরোলে তার সঙ্গী। যাত্রা পার্টিতে মাঝে মাঝে এমন সব অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে পড়তে হয় যেখানে দশ বিশ পঁচিশ মাইলের মধ্যে কোন ডাক্তার মেলে না। তখন এই বই সম্বল আর ওষুধের বাক্সটাই ভরসা। চন্দ্রনাথ নিজেও খেত আর দলের লোক-দেরও দিত।

আজও হোমিওপ্যাথিক একটা ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়ল বড় ঘরের জানলা বন্ধ করে দরজা ভেজিয়ে। বিজয়বতী যখন চা দিতে ঢুকল তখন সে ঘুমে অচেতন। সারাদিন অন্নপ্রাশনের হাঙ্গামা তারপর রাত্রে পালা-গানের জন্য জাগরণ। গভীর ঘুমন্ত মানুষটাকে বিজয়বতী আর ডাকল না।

পালাটা দেখেনি বিজয়বতী। শুনেছে নতুন পালাটায় স্বামীর নাকি খুব নাম হয়েছে কিন্তু দুঃখের খাটুনি। চোখের কোণে কালিপড়া ক্লান্ত এই রূপবান মানুষটার মুখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল সে। কতদিন দেখছে কিন্তু দেখে দেখে যেন আশ মেটে না তার কখনই।

তিন

বিজয়বতী মুড়ির হাঁড়িটার দিকে এক-দৃষ্টে চেয়েছিল। কিন্তু হাঁড়িটাকে দেখছিল না সে।

শ্রাবণ মাস। অথচ একবিন্দু মেঘ নেই আকাশে। দিন সাতেক ধরে চারিদিকে কাঠ ফাটছে যেন এমন রোদের তাপ। আর বর্ষার এই ছিটে ফিটে খুচরো খুচরো জলের সঙ্গে চাষবাসের কোন লাভ নেই। অথচ গরম বিশেষ করে এই উৎসবের কাছে।

কিন্তু সে বোধও বিজয়বতীর নেই। তার মাথায় এখন তার ভাবার 'আসল ভাবনা।'

পাঁচ ছ'মাস চন্দ্রনাথ ভুগছে। গত তিন মাস একেবারে শয্যাশায়ী। চন্দ্রনাথকে নানা ডাক্তার দেখে গ্যাছে। কেউ কিছুই করতে পারেনি। খুব নামকরা ডাক্তার [illegible]। ষোল টাকা ভিজিট নিয়ে উনি আবার দেখেছিলেন তিনি বলে গ্যাছেন চন্দ্রনাথের গলায় ক্যানসার হয়েছে যার কোন ওষুধ নেই। তবে রেডিয়াম চিকিৎ-সায় নতুন বেরিয়েছে করে দেখতে পারা যায় কিন্তু তাতে নাকি হাজার টাকা খরচ।

হাজার টাকা! সে খরচ করার চিন্তা করা আকাশ কুসুম বিজয়বতীর পক্ষে।

চন্দ্রনাথ শয্যাশায়ী হবার পর থেকে অর্থাভাবের মধ্যে পড়ে সব। যাত্রা দলে আর চাইলেও পাওয়া যাবে না কিছু। চন্দ্রনাথকে তারা বাতিল করে দিয়েছে। আদিনাথ বন্ধ করে তারা অন্য পালা চালাচ্ছে এখন।

এই কমাসে সংসারের খরচ জোগাড় করতে হয়েছে। তোমাদের পাকা বাড়ার খরচ চালাচ্ছেন। বিয়ের সেই সব চাঁদ ওপর কোন বাকী নেই শুধু তিনি দিয়ে রেখেছেন তার। ছেলে মেয়েদের যা কিছু গয়নাগাঁটি সেসব প্রায়ই তিনি টুকটাক দিয়ে বসে সে তো অনেকদিন হলেই। বাজার খরচ অবশ্য সবখানি তার না। একটু ভাবনা করে রোপান। প্রতি বছর বৈশাখ থেকে সব পাল প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু করেন। দুর্গা লক্ষ্মী কার্তিক ইত্যাদি প্রতিমা তখন থেকেই

আস্তে হয়ে যায়। তার বংশ প্রবাদেই কালিমা রাখের কারবার নাম। এই সব কালিমাখা আসে কলকাতার পাতিপুর মহল্লা থেকে। তারা পাল মশাইদের কারখানাতে রোজ আর ভালো বানিয়ে যায়। বেশির ভাগ পালমশাইদের দেশের এই বাড়িতেই। কালিমাদের রাতটা তাদের সংসারে রাস্তায় কাটেই হয়। যেমন পালমশাইদের দেশের জমজমাট সেই তাদের কারি-গরের বেশ থাকে বহু কিছু দিতে হয়। তারা বিকেলে বেঁধে খেয়ে যায়। নয়তো হোটেল খরচ দিতে হয়।

ভোলানাথ পালের বিয়ের সময় চিত্ত-কাল যুবকদের। এতদিন তাঁর কালিমাদের হোটেল খোলাই ছেড়। তা কালির জন্য নয়। গোড়ায় দিকে দিন চারেক মত-বুদের খোলের দিকে কম রোজগার হোত বটে। এখন বৈশাখের শেষদিকে বিভা-বতীকে ডাকি বললেন, 'বৌমা এবার ভাবছি কিছু বেশি করে টাকা দেবো। তবে দরদাম থেকেই কালিমা লাগাবো। আবার শহরের মত লোকজনেরা খেতে খুব পায় না। তুমি যদি ওদের রাতের খাওয়াটা দাও তাহলে ওরা খেয়ে বাঁচে।' তারপর শুধু বিভাবতীর কানে যায় এমন করে বললেন, 'একই সঙ্গে ঝকঝোকের রান্না হাঁড়ি চড়বে। এ ব্যাপারে কিছু সাবধান থাকতে হবে।'

বিভাবতী নিরুত্তর। বুদ্ধিও এমন কিছু ক্ষীণ নয়। কিন্তু সে ঠিক বুঝতে পেরেছিল এ কথার ভিতরের উদ্দেশ্য। ভোলানাথ পাল দাঁড়াতে জানতেন চার লোকের চোখ বাঁচিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া দেখিয়ে হাসি হয়েছিল মস্ত বড় একভাবে।

ভোলানাথ পালের নিজস্ব দালান কৃষ্ণ-নগরে আছে। সেটাই তাঁর দেশ। কল-কাতা। সেখানে স্ত্রী আছে বিবাহিত বড় ছেলের সাথে আড্ডা আছে। দুই মেয়ের মধ্যে এক মেয়ের কৃষ্ণনগরেই বিয়ে হয়েছে অন্যজনের শ্বশুরবাড়ি বহরমপুরে। ভোলা-নাথ পালের এ সংসারে এমন ভাবে থাকা তারা কেউ কোনদিন পছন্দ করেনি। ভোলানাথের আত্মীয় স্বজন সব। তাদের অনেকেই এই বস্তিতে থাকে এবং তাদের না বলে দিন। কিন্তু সেই যে একদিন বন্ধুর সঙ্গে এসে এ বাড়িতে উঠে ছিলেন বন্ধুর মৃত্যুর খবরে পরেও এ বাড়িতেই রয়ে গেছেন। নিজের ছেলে মৃত্যুঞ্জয়ের চেয়ে চন্দ্রনাথ তাঁর অনেক বেশি কাছের। নিজের বাড়ি বাগবাজার চেয়ে বোধহয় ভুবনেশ্বরী চৌধুরী অনেক বেশি আপন ভাবতেনই তিনি।

কিছুই গ্রাহ্য করেন নি। স্ত্রীর গঞ্জনা ছেলের ভর্ৎসনা আত্মীয় স্বজনের টিটকারি। সব উপেক্ষা করে রয়ে গেছেন এবং সবাইকে। বন্ধুকে বলেছেন, 'চন্দ্রনাথ আমাকে ছেলের মত সেবা করে। ও না থাকলে আমি এ বাড়ি থেকে নড়বো না।'

এমনি মানুষের শেষে দশ পনের দিনের জন্য দেশে যান। নিজ বড় দালান খরচের টাকা দেন। এখানেও নিজের খোরাকি বাবদ কিছু টাকা দিতেন চন্দ্রনাথের হাতে। ইদানীং চন্দ্রনাথই নিতে চাইত না বলত, 'আপনি কেন এটা দেন? আপনি আমার ছেলে মেয়ের জন্যে যা খরচ করেন সেটাই অনেক। এ আমি আর নিতে পারব না।'

চন্দ্রনাথ তখন বাজার খরচের টাকা দাম বাইরে পাচ্ছিল।

ভুবনেশ্বরী চট করে এক বাটি জল দিয়ে তাকের হাঁড়িতে ঢেলে দিল।

'মা, ভাত টগ বগ করছে। তুমি এখানে কাছে বসে থাকো অথচ ভাবতে পারছো না।'

ভুবনেশ্বরীর কথায় সম্বিৎ ফিরল বিভাবতীর। খুন্তি দিয়ে হাঁড়ির ভিতরটা নেড়েচেড়ে দিল। ভাত ফুটে বেশ খুব গলে গেছে। 'ইস একেবারে পাঁক দিতি হয়ে গেছে সব কালো হোক খাবে,' নিজের মনেই বলতে বলতে বড় মাটির হাঁড়িটা উনুন থেকে নামাল বিভাবতী। ফ্যান গালতে গালতে বলল, 'আমি। তুই দেখিছিলি ভুবন নইলে বহরমপুর এতক্ষণ হয়ে যেত।' ভুবন মায়ের কাছ ঘেঁষে বসে পড়ে মায়ের কপালের চুলগুলো সরাতে সরাতে বলল, 'তুমি অত ভাবছো কেন মা? বেশ খেয়ে তুমিও অসুখে পড়বে তখন আমাদের কি হবে? আমরা কি করবো?'

বিভাবতীর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল এবার। ফ্যান গেলে হাঁড়ি ঠিক করে রেখে তরকারিটা উনুনে চড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ভুবন উনি কি করছেন?'

'বাবা একটু চুপ করে আছে চোখ বুজিয়ে'—

'ওটা দেখিয়েছে আর?' ওটা মানে রক্ত।

'না।'

তবে যেন একটু স্বস্তি হোল। মনে মনে ডাকল ভগবানকে বা কালীকে, 'হে মা কালী বুক দিয়ে রক্ত যেন না আর যেন না বেরোয়।'

কদিন যে কি যন্ত্রণা গ্যাছে। কাটা ছাগলের মত দিনরাত ছটফট করেছে চন্দ্রনাথ। আর কি রক্তই উঠেছে। গামলা গামলা রক্ত। চোখে দেখা যায় না। যে চেহারার দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ ফেরাতে পারত না বিভাবতী পাঁচ মাস আগে এখন চোখ তুলে তার দিকে চাইতে ভয় করে। মনে হয় একটা কঙ্কাল শাদা কাপড় দিয়ে মোড়া। গালের হাড় দুটো বিকট উঁচু হয়ে উঠেছে চোখ দুটো গর্তে ঢুকে গেছে। আর সে চোখ দুটো দিয়ে শুধু জল পড়ে। নিঃশব্দ হয়ে ছেলে মেয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে।

তিন বছর আগে পর্যন্ত তিন কিন্তু কথাও কিছু শব্দ বার করতে পারত এবং কিছুই পারে না উঃ আঃ ছাড়া। খুব যন্ত্রণায় পড়লে কাঁদো হাতে নিয়ে যায়। বেতু এখন বেশ হেসেখুশে চলতে পারে। বা বা দা দা দি-দি বলে। যখন দশ বছরের চন্দ্রনাথের মুখ দেখে, ছেলের বা বা বলে কাঁদত আর বলত, 'তোর বাবা আমি হতে পারলুম না বাবা। সেই এলি, নব পেয়ে ক্যামো এলি বাবা!'

বিভাবতীর মনে হয় আজ যদি শক্তি থাকত ছেলের জন্য নাগাড়ী কবিরাজ কাছে দৌড়োদৌড়ি করে ঠিক বৈদ্য এনে কোনো করে ছেলেকে সারিয়ে তুলত। কবিরাজ কি না পারে। কিন্তু বিভাবতী যে জানেন তা না। অনেকে বলছে বাবা তারকনাথের কাছে হত্যে দিতে। বাবার কাছে গিয়ে হত্যা দিয়ে পড়লে নিশ্চয় ওষুধ পাওয়া যাবে। ওঁর কাছে হত্যা দিয়ে অনেকের অনেক কিছু হয়েছে। কঠিন ব্যাধি সেরেছে কত লোকের, অন্ধ চক্ষু পেয়েছে, বন্ধ্যা নারীর পুত্র হয়েছে। বিভাবতীও ঠিক করেছে সেখানে যাবে।

তার মনে আছে এই নিয়ে নবীন তিন এখন ছোট ভাই কমলেশ নিয়ে থেকে চাকি হয়েছে। কাল সকালেই যাবে সে বাবা তারকনাথের কাছে তারকেশ্বরে। ছেলেমেয়েগুলোকে অমিয় মনমালা দেখবেন। তাছাড়া ভুবনেশ্বরী বাবার সেবার জন্য তো আছেই। পাঠশালা যাওয়া বন্ধ হলে পারে কতদিন থেকে বাবা পড়া দিয়েছে।

কিন্তু পারবে তো ওষুধ বিভাবতী? কথা হবে তো বাবার? কেন হবে না? চিরকাল তো একমনে স্বামী সেবা করে আসছে সে। কখনো ভুলেও অবহেলা করেনি অশ্রদ্ধা করেনি স্বামীকে। কোন পাপ তো সজ্ঞানে করেনি সে। তবে কেন বিমুখ হবেন দয়াময় বাবা তারকেশ্বর। কেন এত তাড়াতাড়ি তার সিঁথির সিঁদুর মুছে যাবে হাতের নোয়া খুচে যাবে?

মনমালা প্রায় সারাক্ষণ বসে থাকেন চন্দ্রনাথের কাছে। এরমধ্যে বাড়ুদটা একটু ভক্তিপূর্বক কিন্তু চন্দ্রনাথের চক্ষু-ভাদি অনেকবার পরিচয় করছেন। এখনো সেই ঘরেই ছিলেন। বাইরে এসে বললেন, 'বউ একবার যাও, ঠাকুরপো বোধহয় তোমায় খুঁজছে'। বিভাবতী বলল ভুবনেশ্বরীকে, 'তরকারিটা তুই দেখ। তাড়াতাড়ি এল ঘরে চন্দ্রনাথের কাছে। মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'খুঁজছো? কিছু বলবে?'

ডানের দিকের খাতা পেন্সিলটা দিতে বলল চন্দ্রনাথ। বিভাবতী তাড়াতাড়ি খাতা পেন্সিলটা হাতে দিলে অতিকষ্টে কাত হয়ে কাঁপা কাঁপা অক্ষরে কিছু লিখে দিল চন্দ্রনাথ খাতাটায়।

কি লিখলেন উনি। দুর্গা দুর্গা কি হলো! বিভাবতী আলোর দিকে ধরে দিতে দিতে চিৎকার করে ডাকল বিভাবতী 'ভুবন, ও ভুবন শিগগির আয়।'

ভুবনেশ্বরী তরকারি ছেড়ে দিয়ে ছুটে ঘরে এল। বিভাবতী খাতাটা দিয়ে বলল, 'কি লিখেছেন পড় তো'। এত কাঁপা আর এত অস্পষ্ট সে লেখা যে ভুবনেশ্বরীর পক্ষে পড়া সহজ হোল না।

বিভাবতী অধৈর্য হয়ে যেতেন খুশ- খাতাটা নিয়ে বলল, 'একটা লেখা পড়তে পারিস না এ্যাদ্দিনকাল ধরে পাঠশালে গিয়ে কি ছাইপাঁশ করলি?'

ইতিমধ্যে সোমনাথ ঘরে ঢুকলেন। ইনি কাছারিতে যান বটে কিন্তু এখনও দুবেলা সন্ধ্যে বাড়িতে দেখতে আসেন চন্দ্রনাথ কেমন আছে। কাছারিতে থাকতে পারেন না। ছটফট করে প্রাণটা।

বিভাবতীর চীৎকার শুনে বললেন, 'কি হয়েছে ভুবনেশ্বরী?'

'দাদা ও দাদামশাই, বাবা কি লিখেছে আমি কিছুতেই পড়তে পারছি না'।

'কই দেখি', ভুবনেশ্বরীর হাত থেকে খাতাটা নিয়ে চশমা চোখে লাগিয়ে দেখলেন সোমনাথ যেন কিছুক্ষণ ধরে লেখাটা। তারপর চন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ধরা ধরা গলায় বললেন, 'তুমি কিছু চিন্তা কোরো না চন্দর। বউমা যাবে তোমার জন্যে যা বলেছ আমি তা দেখব। আমি তো রইলুম।'

তারপর বিভাবতীর দিকে চাইলেন। বিভাবতীর মাথার মুখে কোন কাপড় নেই এবং বসনের দিকের খোঁপা উদার অবস্থা হয়ে পড়েনি। তাকে কি লিখেছে চন্দ্রনাথ সেই কথাটা জানবার জন্য উদগ্রীব হয়ে চেয়ে দিকে চেয়ে আছে।

সোমনাথ বললেন, 'চন্দ্রনাথ তোমায় যা লিখেছে পড়ি বউমা শোন।' বলে খাতাটা পড়তে লাগলেন, 'আমি চলে গেলেও ছেলেটাকে দেখো যেন কষ্ট না হয় ... ঘেন্নাক্ষা কিছু বাড়ির যেন দিও না'।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিভাবতী স্বামীর বুকে মাথা রেখে হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বলল, 'আমি পারবো না, ওগো আমি কিছুতেই পারবোনা। তুমি গেলে আমি একা কিছু পারবো না।'

সোমনাথ চশমা খুলে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। মনমালা এগিয়ে এসে বিভাবতীকে ধরে টেনে তুলতে চেষ্টা করতে করতে বললেন, 'আঃ বউ! কি হচ্ছে কি: ঠাকুরপোর লাগছে যে। ওঠো ওঠো, হরলিক্সটা খাওয়াও দিয়ে। খোকা সব দেখছে রে! বউ ও বউ! ভুবন, তোর মাকে ধর টেনে তোল ঠাকুরপোর লাগছে—'

সন্ধির বেলাতেই বিভাবতী সব ফেলে রেখে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে পাড়ার পুজোয় ছুটল। সেখানে পৌঁছে হুড়মুড় করে নিয়ে বিস্ময়ে দেখে বাবার পুজো তৈরী নিয়ে মাটিমন্ডিতে হয়েছে। নিয়ে সকল। দু'দিন দু'হাজির সেন, উঠল না কেউ সরে দূরে নিজেরা। নিজ নিজের নিজ খেলা এখানেটা মাথায় বিভাবতীর হাত দিয়ে ডাকল, 'বিভা ওই। বাড়ি ফিরে চ।'

বিভাবতী আশ্চর্য হয়ে উঠে বলল, 'কেন? বাবা? আমাদের উঠোনে আবার? কোনো নতুন কিছু তো পাইনি এখনো। কোনো গলপো উপহারও তো—'

রবিন বলল, 'নতুন বাড়িতেই পাওয়া যাবে।'

'সে কি! বাড়িতে? নতুন? পাওয়া যাবে? তুমি কি বলছ দাদা। বা আমার হল নাকি?' 'হ্যাঁ হল। দুই ওই। মুখে চোখে জল দিয়ে কিছু খেয়ে নে। তারপর বাড়ি চ। আমি তোকে নিতে এসেছি—'

বিস্মিত অবাক অনুভূত বিভাবতী আর কিছু বলল না বাহাদুরে। বলার মত মানসিক অবস্থা তার ছিল না। বাড়ি চলে এল দাদা আর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে। বাড়ি এসে দেখল তার ঘরের দিকের চৌকি দুর। কই সে বাড়ুটা কই?

একধারে জড়ানো মা-বাবাদের মধ্যে পাড়ি দেয়া কুসুমেশ্বরী ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে মায়ের বুকে মুখ লুকায়। কেঁদে কেঁদে বলতে থাকে, 'তুমি যে শেষ সময় তাকে দেখতে পেলেনা। বাবা যে তোমার নাম খুঁজছিল মা—'

চার

সন্ধ্যাবেলা হাতে বাতি নিয়ে নিলে পুতুল ছুঁয়েছিল বিভাবতী। বাবার ঘরের একটা চৌকি পাতা হয়েছে। তোমাদের ধানসিঁড়ি চাঁদ রেখেছে। বছর তিনের পরে তাঁর বই হয়। তাই বাবার লেখার বাক্স। চৌকির ওপর বসে পড়তে চণ্ডী আর বেদ লেখা করতে। চৌকির পাশে বাবার বিভাবতী বসেছে তার চার বাতি নিয়ে।

তোমাদের পাশে এখনো ভাবনায়। আর বারোমাসের পরেই সরস্বতী পুজো। আশেপাশে এখন তাদের ঢাক দূর। কখনো বাবা ভুলতে পারে না। কোথায় যাওয়া যে মাঠে যে সবাই যে সেতেক বড়ি বড় বাড়ি খোরা, গাছ, আর দাদপোলাপ সবের ফুল টেঁটুল বিচিত্র আঠা মধুর আঠা কত কি হাত। বাবাজীর ভিতর আসে প্রতিমা গড়ার কাজে। তারপর সাদ করতে সবাই নিতে দিন রাতে খাটা। পুজোর পরিবার। সেবিনে পুজোর সময় যত এগিয়ে আসে তখন ঠিক সময়ে খাওয়া নেই থাকা নেই রাতের পর রাত জাগতে। দূর্গা কালিত বিশেষ করে সরস্বতী পুজোর দিন সকালে পাল বসাই আর তার কারিগরদের তৈরী অসংখ্য মূর্তি দেখবার মত। আঁকা ফুল একধারে বাড়ি সকলে চিরকুট কাগজ আঁকা পড়ে চোখ যদি পড়ে যাবি ভাবছে! মনে হয় অমুক পুজোর আগের প্রায়শ্চিত্ত করছে সবাই মিলে।

এত খাটুনি, পরিশ্রম অথচ আয়ের পথ নিশ্চিত নয়। প্রতিমা গড়া হয়, সব হয়, কিন্তু বিক্রি কেমন হবে তা কেউ বলতে পারে না। বেশির ভাগ সময় ভাগ্য বাছ পুজোর দিন সকালে অনেক মূর্তি অবিক্রীত থেকে পড়ে থাকে কারখানা ঘরে আর পাল-মশাইয়ের মুখে লেগে থাকে যেন মৃত্যু শোকের ছাপ। এভাবে দেখা করে এই মূর্তি তৈরি। আর দেখা যেটাকে কারিগরের পাওনা যেটাকে আর পরের মজুর লোক নিয়ে সংসার খরচ চালানো সব নির্ভর করে এই বিক্রির ওপর। অথচ সেটাই একে অনিশ্চিত। সব কারিগর পুজোর সময়ে তোমাদের মত মাটি পালমশাইয়ের ঘরেও প্রায় এক মূর্তি মূর্তি অবিক্রীত পড়ে থাকে।

বিভাবতী পুতুলের ভাব জানত না। তবু এমন তাই করতে হচ্ছে। বিভাবতীর বাপের বাড়ি হচ্ছে চাকের কাজ করা কুমোরের বাড়ি। বাপি তুমি তাঁর মূর্তি গড়া কুমোর। প্রতিমাগড়া কুমোররা তাদের বলে নাড়িকাটা কুমোর। মুখ চাকের ওপর থেকে মাটির বাসন তৈরি হলে একটা সুতো দিয়ে কেটে তারা নামিয়ে রাখে বলে তাদের প্রতি এই নাম। নামাবলম্বী দু পক্ষের মধ্যে বিয়ে সাদী সচল হয় না। অশান্তি হয়। এই অশান্তি ব্যাপারটা বিভাবতীর ক্ষেত্রে ঘটে গিয়েছিল। তবে বিভাবতীদের বাড়িতেও একদিন চাকের কাজও কেউ করত না। তার বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে এ পাট উঠে গিয়েছিল। দাদা রবিন সরকারী অফিসে চাকরি করে। এতকাল পরে ছোটভাই কপালে আবার চাকের কাজ শুরু করেছে।

চন্দ্রনাথের বাড়িতেও পুতুল বা ঠাকুর-গড়ার চলন ছিল না। চন্দ্রনাথ ওসব জানত না। ছোটবেলাতেই বাজারে দোকানো হয়েছিল তাকে।

কিন্তু তোমাদের উপদেশে আজ বিভাবতীকে এদিন শুরু করতে হয়েছে। দেখিয়ে দেখিয়ে আর তোমাদের পাশে। হাতেখড়ি বিধিই করে দিয়েছেন। অন্যান্য সবের কারিগর মাজবী আর না থাকি। এবং যো টা দু টি পারে বিভাবতী। বড়ো মূর্তিগুলো অবশ্য তোমরা ধারা এমন পারে না। সেগুলো কুসুমেশ্বরী ১৫ বছর নিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কিছু তোমাদের মত তার একটু অবলম্বন। নইলে কোন কারিগরকে দিয়ে করাতে হ'ত।

গত শ্রাবণ মাসে বৃন্দাবনীর বিয়ে হয়ে গেছে। যা জুটেছে তাই ধরে দিতে হয়েছে। উপায় ছিল না। সংসার প্রায় অচল অবস্থা। স্বামী বিয়ে তো দেননি দিয়ে গেল বিদ্যাবতীর সংসারের দুর্ভাবনা। চন্দ্রনাথের কথায় সোনার গয়না ছিল সেগুলো বিদ্যাবতী কিছুতেই বিক্রি করতে চায় নি কিন্তু চন্দ্রনাথ জোর করে প্রথম কন্যারই সেগুলো বেচে দিয়েছিল।

কিন্তু সোনার দামটাই বা কি! দিদি সোনা গলের গোলো টাকা। আট ভরি সোনা বেচে কতটুকু পাওয়া গেছে। বৃন্দাবনীর বিয়েটা প্রায় নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল। শাঁখা ছাড়া কিছুই। বেশ গয়নাগুলো পায়ের সঙ্গে। বয়সটা বৃন্দাবনীর তুলনায় দুই বেশি।

খোঁজটা পেয়েছিলেন চন্দ্রনাথ। পাত্রের বন্ধুর সঙ্গে চন্দ্রনাথের যোগাযোগ হয়েছিল প্রতিমা বিক্রীর সূত্রে। সব ধরে দিয়ে চন্দ্রনাথ বিদ্যাবতীকে বলেছিলেন, 'পাত্র লেখাপড়া জানা। একটেশ পাশ। বাড়ি মেদিনীপুর থেকে ট্রেনে যেতে একঘণ্টা লাগে। সেখানে হাটের ওপর বড় মনিহারি দোকান। নিজের দুখানা বাড়ি। একখানা পাকা একখানা মাটির, অন্যটা টিনের। একা লোক। বাপ মা ভাই বোন কাকা জ্যাঠা কেউ নেই। একেবারে একা লোক। মনিহারি দোকানের আয় মাসে চারশ পাঁচশ। টিনের বাড়িতে হাটের দোকানদারদের ভাড়া বসানো আছে তাতেও আয় আছে। অবস্থা বেশ ভাল। তবে দিদির তুলনায় বয়সটা বেশি। দুই বেশি।'

বিদ্যাবতী ঘোমটার আড়ালে শুনে গিয়েছিল। কিছু বলেনি। একটু থেমে চন্দ্রনাথ আবার বলেছিলেন, 'শুধু তাই নয় দোজবরে।'

নন্দবালাও বিয়ের ব্যাপার বলে শুনছিলেন। এই কথায় তিনি প্রায় আঁতকে উঠলেন, 'সর্বনাশ! বলছেন কি ঠাকুর। দোজবরের হাতে বুবুকে দিতে হবে! না না ও সবের কাজ নেই।'

চন্দ্রনাথ বললেন, 'সবটা বলি, শোন তোমরা আগে, তারপর যেটা কি করবে। দোজবরে হলেও আগের পক্ষের কোন ছেলেপুলে নেই একেবারে ঝাড়া হাত পা।'

এবার নন্দবালা বললেন, 'তা বয়েসটা কত?'

'বলছে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ কিন্তু আমি দেখে বয়স দিয়ে যা বুঝলুম এ চল্লিশ বিয়াল্লিশ হবে।'

নন্দবালার ঘোরতর আপত্তি। চন্দ্রনাথ শান্তকণ্ঠে বললেন, 'আমার তো মনে হয় এই সম্বন্ধে বেমানান হবে আমাদের বুবুর সঙ্গে।' চন্দ্রনাথ আর জোর করে বললেন না চুপ করে রইলেন। বিদ্যাবতী পাত্রের বয়সটা ঠিক বুঝতে পারেনি। নন্দবালা বাংলা লেখাপড়া মোটামুটি জানলেও ডাবলের যোগাযোগ এখনো শিখে উঠতে পারেননি কিন্তু বিদ্যাবতীর বোধ এক খোঁচ কম। তারপর চারটের একধরা পাঁচ সত্তর এককুড়ি আর পাঁচকুড়িতে শেষ। পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ একচল্লিশ এসব বোঝা তার সাধ্যের বাইরে।

চলে গেল নন্দবালার কাছে। জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁ দিদি, ছেলের বয়স কত?'

নন্দবালা বললেন, 'দুকুড়ি দুগণ্ডা।'

শুনে একটু থম মেরে গেল বিদ্যাবতী। দুকুড়ি দুই। সে যে অনেক। বুবুর বয়স তিনগণ্ডা হতে এখনো পাঁচমাস বাকি।

নন্দবালা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বউ ভেবে?'

বিদ্যাবতী ধরতে উঠেছে বলল, 'উনি যদি ভালো বিবেচনা করেন—'

চন্দ্রনাথের কানে কথাটা গেল। বাবা ঠিক হয়ে উঠলেন, 'আমার এ ব্যাপারে কোন বিবেচনা নেই বউমা। হাত পা বাঁধা। অনেকদিন এ সংসারে আছি মায়ার জড়িয়েছি তাই সরে যেতে পারিনে। তোমার মেয়ের ভালোমন্দ সব এখন তোমার। ভাবনা আমি আর কদিন বল? কিছু ঘটলে হলে কলি পোয়াতে তুমিই পোয়াবে। আমি তো আর থাকবো না। তার চেয়ে বরং তোমার বাবা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কর, তাই জগদীশের পরামর্শ নাও, তাদের মতামত নাও—'

ছোট ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করাও না করাও সমান। সে এখন একেবারে বসে আছে। বাবা তার বিয়ে দিয়ে হাল করে বড় তার খাওয়া পরার ব্যবস্থা কিছুই রেখে যায়নি। আর সকলের চোখের ওপর কিছু করে বিশেষ করে বাবার কাছে তাই।

বাবা ঠাকুরের অবস্থাও এখন একেবারে একা। কিছুদিন আগে বৌদি চোখ বুজেছেন। লোকের বাজারের কাজ রোজ চার টাকা। তাঁর সংসারের কিছু ঠিক নেই। বিদ্যাবতী একদিন গিয়ে বাবার সংসার গুছিয়ে দিয়ে আসে। ছোট ছেলেটিকে মানুষ করার ভার নিয়েছিল বাড়িতে এনে মানুষ করতে হয়। বিদ্যাবতীর মা বলে আছে কিন্তু তারও কোন ঠিক নেই। আজ এখানে কাল ওখানে। কোনদিন ভোর উঠনে ভাত চাপিয়ে গঙ্গা নাইতে গেল ফিরল তিনটে পরে। ভাত পুড়ে তখন কয়লা। দুজন লোক খেলে দশজনের রান্না করবে। পরদিন বাকি ভাত জলকাদি ঢেলে বাড়ির সামনে ফেলে দিয়ে আসবে।

বাবা সকাল আটটায় বেরিয়ে যান শুধু কাপ পাঁচ ছয় চা পর পর সকালে খেয়ে। ফেরে ভাত খেতে সাড়ে বারটায়। তার চারদিন সকাল নটা থেকে বেলা চারটে

সময়। বাকি চার পাঁচজন নাকি সবার সামনে বসে ঘুরে বাড়ীর। উঠোনে দেবতার বসিয়ে বসিয়েও খেতে। বাকি কিছু বিভাবরীর চুপচাপ বসে বসে একের পর এক সব কিছু দেখছিলেন চাঁদ বাড়ে বাড়ে মনে হচ্ছিল একটা বাড়ী গাছ। কথা বলছে আমিরটির মত তাঁরা বসে খাবার খায়। তোমরা কি ভাবছ সকলেরা উৎসব হচ্ছে কিনা, কোন কথার অর্থ কিনা। আমাদের দেশের কোন খবরই রাখো না।

তবু রবিবার দিন বাবাকে সব বলে তার মতামত চাইল বিভাবরী। বাবা সবই শুনলেন চুপচাপ। তারপর দার্শনিকের মত বললেন,— 'সুখ দিতে সবাই চায়। কপালে যদি থাকে তো ঐ ছেলে দিয়েই তোর বোনের সিঁদুর পরে সুখে চলে যাবে। আর যদি না থাকে। তোর মনের মতো হবে। তোর দিদি বিয়ে দিয়েছিলুম একটা রাজপুত্তুরের সঙ্গে। তবে বাঁচতে পারল কি? দিয়ে দে দিয়ে দে। পয়সা কড়ি আছে ছেলেটা বেশ পড়ে বেড়াবে। ভাবনা তোর বৌদির কি বলেন হয়েছিল বাবার? অথচ আমার আড়ালে কেঁদে চলে গেলো।'

আমরাও সব কথায় কেঁদে বাবা বৌদির কথা এসে মনে পড়েছে। বাবার কথায় মর্মাহত হলো কেমন বিভাবরী। সত্যিই তো কপাল ছাড়া পথ আছে নাকি মানুষের?

বিয়ে হয়ে গেল ভুবনেশ্বরীর। ধুমধাম করেই বিয়েটা হলো। জামাই দাবী দাওয়া কিছু করেনি। তার চাহিদা শুধু একটা বড় সড় মেয়ের। তা সত্যি এগারো বছরের ভুবনেশ্বরী বেশ বড় মেয়েই। দেখেই পছন্দ হয়ে গেল। মা হবার আগ্রহ নেই। ভুবনেশ্বরী চৌধুরীর ঘরণী।

পাড়ী শেষে এসে পার জিজ্ঞাসা করেছিল ভুবনেশ্বরীকে, 'রাঁধতে জানো? না। কালিয়া পায়েস নয়। মাছের কোন ঝোল।'

ভুবনেশ্বরী মাথা নেড়ে হবে বলেছিল। তার মাথাটা মাটিতে ঠেকে যাবে।

সকলেরা বললেন, 'আজকের দিনটা যেতে দাও যদি দিনে হাতে পরমান্ন রান্না করে আমাদের খাইয়ে দেবে ভুবনেশ্বরী তখন দিকেয়াই বুঝবে ও রাঁধতে পারে কিনা।'

শ্রীর বিবাহে পার হোল ভুবনেশ্বরী। বাকির ঠিকানা কেমন বিভাবরী। বাড়ীতে খুব একটা শুভ খবর।

মেয়েটা শাড়ি গয়না অনেক পেয়েছে। যখন বিয়ের পর জোড়ে এসেছিল তখন পাড়ার মেয়েবৌরা আর সবাইকে গয়না দেখে পাড়ার লোকের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। কলকাতাতেই মটোরগাড়ি চাপে কটা লোক? অথচ বাবা মটোর-গাড়িতে বাপের বাড়ি এসেছিল মেয়ে-জামাই। গাড়িটা দু'দিন বড় রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। দু'দিন পরে মেয়ে জামাইকে নিয়ে ফিরে গিয়েছিল বাগবাজার। বস্তিতে সে একটা আশ্চর্য ঘটনা। বস্তির মানুষের বড় রাস্তাটা দিয়ে একটাই মটোর গাড়ি যাতায়াত করে। সেটা হোল বিখ্যাত ডাক্তার অবিনাশের গাড়ি।

সবাই বলেছিল জামাইয়ের মত জামাই পেয়েছে বিভাবরী। রূপে গুণে এ যেন হরগৌরীর মিলন।

একমাথা ঘোমটায় ফাঁক দিয়ে জামাইকে দেখেছিল সে। তা হরগৌরীই বটে। পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল মেয়ে জামাই। জামাইয়ের চেহারা ফুটবলারের মত। সাধারণ গলা, চৈত্রের মত মাথায় টোপর পরা জামাই যার পাশে সোনালের মত উঁচুতে হলেও জামাই তো ভুবনেশ্বরী। মেয়ে অপূর্ব। জামাইয়ের পাশে তাকে যদি একটা কথাও বলতে পারেনি বিভাবরী। তার নিজের বয়েস থেকে অনেক বড় তো। চল্লিশের থেকেও বয়েস বড়। আজিমটা বিরাট লোক। একটা পান। বলে যাই হোক বেয়াইমশাই মাত্র ঐশ্বর্যে আড়ালে সব কিছু ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। ভুবনেশ্বরীর কপালকে হিংসে করেছিল পাড়ার অনেক মেয়েরা।

ভুবনেশ্বরীর বর পছন্দ হয়েছিল কি? কে জানে? তার হবে নাই বা কেন? অত গয়না গাড়ি সোনাদানা। চেহারাও কিছু খারাপ নয়।

জোড়ে এসে যে দুদিন ছিল এক ফাঁকে ভুবনেশ্বরীকে বিভাবরী জিজ্ঞাসা করেছিল, 'হ্যাঁ রে, কি রকম বর হল?'

ভুবনেশ্বরী মায়ের কোলে মুখ গুঁজে দিয়েছিল।

'ওমা কাঁদছিস ক্যানো মা,' বিভাবরী মেয়ের চিবুক হাতে তুলে ধরে আবার জিজ্ঞাসা করেছিল বিস্মিত হয়ে, 'কাঁদছিস ক্যানো বুবু?'

ভুবনেশ্বরী বলেছিল, 'বড্ড ভয় করে মা।'

'ক্যানো, কিসের ভয়?'

'বড় বাড়ি। বড় উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। আর কি ফাঁকা! কেউ কোথাও নেই মা।'

'জামাই তো থাকে।'

'সব সময় তো থাকে না। কোর্টেই তারে গাড়ী করে বেরিয়ে যায়।'

ভুবনেশ্বরীর কাছে কেউ থাকে না? এতটুকু মেয়ে নতুন বিয়ে হয়ে সারাদিন একা একা থাকে? আশ্চর্য হয়ে ভুবনেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করে বিভাবরী, 'সারাটা দিন

তুই একলা একলা থাকিস? কেউ থাকে না? [illegible]?'

ভুবনেশ্বরী বলেছিল, 'ওখানে থাকার পরেও দিন থেকে তো আমিই আছি বাবা। একটা কি আছে। সেই ছেলের থাকার জন্যে। সারাদিন থাকার জন্য। কিন্তু মন ছট ফট করে বেরিয়ে যায়। দু'দিন একা নিঝুম হয়ে থাকে।'

চোখ মুছে ভুবনেশ্বরী আবার বলেছিল, 'একদিন তো কি এমনি না। ওদের বড়-বাবাকে একটা কাজ দিয়ে চলে এলেন। আমার মনে হয়েছে থেকে সত্যি ভালো লাগিয়ে এলেন। যা বলবেছিল; উনি ফিরলেন পথে উঠবে। আপনাদের তো কেউ নেই যে কিছু হলে থাকবে।'

আবার মন বলেছিল ভুবনেশ্বরীর কাছে। কি বলবে আর ঠিক না বুঝে বিভাবতী। শুধু মেয়ের মুখটা দু হাতে তুলে নিয়েছিল নিজের বুকের মধ্যে। মা আর মেয়ে খানিকক্ষণ কেঁদেছিল নিঃশব্দে।

এই চার মাসের মধ্যে আর একবারও আসেনি মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে। জামাই একবার এসেছিল হুগলিতে বদলির খবরটা পরে। চিঠি আর বাবাদেরকে। জোনাথান বলেন, 'খুব পণ্ডিত লোক আমাই। বড় বড় নিষ্ঠে একখানে মানুষ করেছে। লোকে সাহেবপাড়াই বলে। আর কি সুন্দর চিঠি লেখে। ঠিক বইয়ের মত।'

একদিন ছোট মাসিকে সঙ্গে নিয়ে জোনাথান দেখতে এসেছেন সেই দিদিকে। মুখে বলেন না কিন্তু ভুবনেশ্বরীর কথা যে তাঁর প্রাণটা ছটফট করে বেশ বোঝা যায়। বড় আদরের ছিল তো মেয়েটা। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল বিভাবতীর। কি আছে জীবনে এক এক। এই সবের বেলা? যা দুঃখের কথা।

এর পরেই বড় মেয়ের কথা মনে পড়ল। কোন সংবাদ নেই বহুকাল। যোগমায়া দুধবাই যেন হয়ে গেছে এসেছে বিভাবতী। রূপের বিয়েতে যোগমায়াকে পাঠায়নি জামাই। তখন চারমাস এসে গৌরাঙ্গী হয়ে আছে। জুটের একটা মেয়েও সুখী হল না বোধহয়। এখন জেঠিমার থাকতে কি আছে কে জানে?

'ওমা মাগো, ভালো আই আমাকে পড়তে দিচ্ছে না। বই নিয়ে টানছে', চণ্ডী চেঁচিয়ে করে দুটো চড় মারল বেণুকে।

বিভাবতী মেয়েকে বকে উঠল, 'সব সময় আইকে মারবি না চণ্ডী। একটু শান্তভাবে পারোনা থাকি কখনো।'

এ মেয়ে ভুবনেশ্বরী নয় চণ্ডী। সঙ্গে সঙ্গে বিড়বিড় করবে 'আমি পারবো না তুমি পারলাও না। বিয়ে পাবে না আমাকে বলে। বাঁদর বুড়ো ছেলে চুপ করে বসে থাকি খালি বই ধরে টানছে। বই পড়তে পারিস তুই বাঁদর—'

সঙ্গে সঙ্গে বেণু বলে উঠল, 'হ্যাঁ। আমি তো অ আ পড়ছি দাদাদির বড় দাদা ও বিবি এ বই ও বউ' বলে হি হি করে হেসে উঠে নিজের দুহাতে তালি বাজাতে লাগল।

অবাক হয়ে যায় বিভাবতী। দুবছর চার পাঁচ মাস বয়স ছোট ছেলেটার কিন্তু সব কথা স্পষ্ট বলে আর কি স্মরণশক্তি। শুধু অ আ নয় ক খ গ ঘ সব মুখস্থ বলে যায় দাদুর কাছে শুনে শুনে। এই কদিনের মধ্যে সব শিখে ফেলেছে।

'বেণু মণিমালা দিদির বই দিও না।'

বেণু বলল, 'আমার বই কই!'

আমি কাল সকা মাইনে বাবার সঙ্গে কোথায় অ আ বই কিনে দেবে বলেছেন?'

'আমি ইস্কুলে যাবো।'

'হ্যাঁ তুমিও যাবে। দিদির মত বড় হও।'

আবার নিঃশ্বাস পড়ল বিভাবতীর। কত সাধ ছিল যোগমায়ার ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবে। সেই ছেলেটা এখনো আছে বছরের দুদিন আগে ছেলেটা চলে গেছে বিভাবতীকে দিয়েছিল। কি করে একা একা সে সাধ পূর্ণ করবে বিভাবতী। সে বোকা ছেলে। তার পরে খুব আক্ষেপ আর পড়া সেই বোঝা হবে না! বাঁচবে তো? এই তো সেদিন অতিথ ব্যারাম থেকে উঠল। কতদিন বলেছিল পুজোর মুখে। উঃ কি কাণ্ড! ভাবলে শরীর শিউরোয়। দুজনেই ছুটোছুটি করে আমি ডাক্তারকে ডেকে আনলেন। হোমিওপ্যাথির ব্যবস্থা ডাক্তার ছিবি। না পারার উপায় ছেড়ে উঠল ছেলে।

ডাক্তারের কোন কথা ফেলে দেবু। কথা আছে পাঁচবছর পর্যন্ত খাবার চুন কাটি হবে না। পাঁচবছর পূর্ণ হবার পর তাড়াতাড়ি নিয়ে দিয়ে ছেলের মাথা কাঁধা করে চুলগুলো সোনাকাটার নরীর ভরে না। পুজোর পরে ফেলতে হবে। তা শান্তি তো ছেলেটা অন্যায় আগেই চলে গেল। ওর ছেলেও যে হবে শিশু শিশু বৌভ হবে। এখন সে সুন্দর আজগুলো কে দিয়ে যাবে সাজাবে।

অনেক ভাবনাই আমি বড় অন্তর পায়। এখনও সংসারের বাধে না আবার ধমির। সে সকালে পৌঁছতে হল কোন পর ইস্টেও হয়। কোন শান্তি খোঁজা পাওয়া যায় না।

যা হবার হবে। পাঁচ বছর তো বাঁচুক আগে তারা থাকে। কলেরার সময় সেই যা ভাবার বাধ করে খোল আমা ছেলের কপালে ছুঁইয়ে শরীর ছাড়িয়ে তুলে রেখেছে বিভাবতী। আর রেখেছে মাত-ঠাকা। অর্থাৎ বছরের না মানবিক পুরো; সোনার বস্তু তাহলে খুব পাট বদলে আর শরীর উঠা যাবে না সে। শরীর উঠা যাবে চাল দিতে সব উঠাবি। কম দুধ কিছু অবশ্য হাসপাতাল কিন্তু বিভাবতী সেনা

পাওয়া যায় খেতে পারে তাতেও নয়। তার ছোটবেলা থেকেই এখনো দুধ খায় মোটে। হোক ভাত খাবে কম খেয়েছে। অথচ যোগিনী রূপবতী চণ্ডী সবাই একবার দেখলেই মুগ্ধ হয়েছে এই বয়সে। তার এখনো দুধের দাম বাকি রেখে দুটো টাকা জোগাড় করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে বিভাবতী।

কবিরাজের কম্পাউন্ড পাওনা যে বাকি পড়েছে। লোকজন যাতায়াত রোজ এসে বিরক্তি করে যাচ্ছে। কিন্তু দেবে কোত্থেকে বিভাবতী! দুবেলা খরচ করে চলার মতো পাঁচটাকা রোজগার কথা বা কিছুও সংসারে দিতে পারছেন না। তিনিই বা করবেন কি করে! তাঁর বড়ছেলে মাসে যে টাকা কিছুই দিচ্ছে না। তিনি বলেছেন, 'একখানা ঘর ছেড়ে দেবো বউ তুমি ভাড়াটে আন।'

কিন্তু ভাড়াটে পাওয়াও তো শক্ত। খেয়ে ভাড়াটে সবাই বাড়িতে কল পায়খানা খোঁজে। কিন্তু বিভাবতীর বাড়ির ওই ব্যবস্থাটা যাবে সরকারী কল পায়খানা। বাড়ির খুব কাছেই কিন্তু খেতে তো হয় পাঁচটা লোকের সঙ্গে। সে বলে ভদ্রলোক আছে ছোটলোকও আছে সেরকম বাড়ির বউও আছে বেহায়াও আছে। এমন পুরুষ আছে যারা আইন বাঁচিয়ে হাসিয়ে বেড়ানোর সঙ্গে রসিকতা করে, লোকের বউ ঝিয়ের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

বিভাবতী চণ্ডীকে বলল, 'কি হোল। পড়ার আওয়াজ শুনছি না যে!'

চণ্ডী বলল, 'আমি লিখছি'—

বেবু বলে উঠল, 'চণ্ডী কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং লিখছে মাগো।'

চণ্ডী মুখ ভ্যাংচালো 'বেশ করছি তোর কিরে বাঁদর!'

বিভাবতী বলল, 'খবরদার চণ্ডী বার এর আবার মেয়েকে তুই বাঁদর বলে গাল দিবিনি। একে বোনে বোনে শেষ হোতে যাচ্ছে আবার বাঁদর বলে গাল! বেরো পিঠের চাল তুলে দোব হারামজাদী।'

চণ্ডী রেগে টান মেরে বই খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিভাবতী উঠে ঝাপাঝাপি মাথা হাতেই চণ্ডীর চুলের মুঠি ধরে দুম দুম করে গোটা কতক কিল বসিয়ে দিল। চণ্ডী ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল। বেবু চৌকির এককোণে চলে গিয়ে তার মায়ের ঘর বিভিন্ন মার খাওয়া আর তারা উপভোগ করতে লাগল।

পাঁচ

নীলা হাওড়া থেকে কলকাতায় এসেছে। বাগনান স্টেশন থেকে চার ক্রোশ উত্তরে তাদের গ্রাম। মানে তার শ্বশুরবাড়ি। স্বামী চাষী। তবে সচ্ছল পরিবার নয়। নিজেদের যা জমি তা দিয়ে বছরে দুটো মাসও চলে না গোটা পরিবারের। নীলার স্বামীকে তাইতো নানান উঞ্ছবৃত্তি করে দিন চালাতে হয়। পরের জমিতে মজুর খাটা করবে। বর্গাদার কাজ করবে। বাগনান টাউনে গিয়ে মোটবওয়া মজদুরীর জোগাড়ে। কিন্তু কাজ কোথায়? পরিবারের সংখ্যা কম নয়। কম করে দশটি মুখ। নীলারাই তো চারজন। নীলা তার স্বামী দুটি ছেলে মেয়ে। মেয়েটা বড় পাঁচ বছরের ছেলেটি ছোট তিনবছরের। দুবেলা ভাত বেশি সময়েই জুটত না। খালি 'নয় পান্তাজল দিন করে খেয়ে বাঁচাত, তখন সময় তাও মেলে নাই।

তার ওপর ম্যালেরিয়ায় গাঁ প্রায় উজাড় হয়ে গেল। জ্বরে জীর্ণ দিয়ে সবাই প্রায় কলকাতায়। নীলা কিন্তু সেভাবে আসে নি।

বছর খেতে না পায় পান্তাজল দিন খাম নীলার স্বামীর যেইন বছরের মাথা-ঘরে মেয়েটা অবেক পুকুরে ডুবে মারা গেছে। তবু নীলা দু বেলা না। আর একটা অভাব তাও গ্রামে প্রায় সবারই ম্যালেরিয়া হয়েছিল কিন্তু সে দু'চারজন ছাড় পেয়েছে তার হাত থেকে নীলা তাদেরই মধ্যে একজন।

গ্রামের সম্পন্ন চাষী গ্রামের মোড়ল। তারই মেজছেলের নজর পড়ল নীলার ওপর। তাদের বাড়ির পাশাপাশি যে পুকুরে জল সরে সেই পুকুরপাড়ে দিন কতক মোড়লের মেজছেলে ঘুরঘুর করতে লাগল। সে যে আড়ালে আবডালে কথা বলা। মোড়লের ছেলে বাগনান স্টেশন থেকে খাবার দাবার এনে খাওয়াতে লাগল। আর দুয়েকটা কাচের চুড়ি দু বেলা কোটানো শক্ত হাতে দিয়েছে আলোয় সুখ আসে না তার সঙ্গে বাগনানের মধু ময়রার জিলিপি রাঁধে চপগোলার লোভ সামলানো শক্ত। কিন্তু এমনিতে তো কিছুই পাওয়া যায় না জগতে মাছরাঙার ছাড়া। কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়। নীলার দেবার মধ্যে একটাই ছিল। তার দেহটা। সেটাই দিতে হোল মোড়লের মেজ ছেলেকে।

বেশিদিন চাপা রইল না ব্যাপারটা। গাঁয়ের লোক ঠিক জেনে গেল নীলার আর মোড়লের ছেলের সম্পর্ক। নীলার শ্বশুরবাড়ির লোকে এ নিয়ে বিশেষ কিছুই বলত না। কারণ তখন মোড়লের ছেলে লোকাচুরিই বাড়িতে আসত। নীলার যৌবনে জিলিপি কচুরী তাদের সবারই খাওয়ার মাঝে মাঝে জুটত।

কিন্তু টিকতে দিল না গাঁয়ের লোক আর বড় মোড়ল। নিজের ছেলেকে সামলাতে পারলে না বরং দিল নীলার স্বামীকে তাড়িয়ে। নীলাকে নিয়ে ঘর করলে তাদের হুঁকো নাপিত পুকুরের জল সব বন্ধ হবে।

অতএব নীলাকে ছাড়তে হোল গ্রাম।

চলে আসতে হোল মোড়লের সেই ছেলের সঙ্গে কলকাতা। ছেলে থেকে এক সওদা-গরি বা দুয়ার সেই সঙ্গে ছুটো দিত। ছেলেটা আমার সাথে কান্নাকাটি করেছিল কিন্তু তাকে আনতে চায় নি মোড়লের ছেলে। সে তাকে নিয়ে আসতে কলকাতায় স্ফূর্তি করতে তার ছেলে মানুষ করতে নয়। তখন মনে হয়েছিল যাবে না কলকাতা। কিন্তু না গেলেই বা থাকবে কোথায়? গাঁয়ের সমাজ তার গাঁয়ের বাস উঠিয়ে দিতে হুকুম দিয়ে দিয়েছে।

নীলা মোড়লের ছেলের সঙ্গে কল-কাতায় এসে প্রথম উঠেছিল বাগবাজারের খালপাড়ের দিকের একটা খোলার বস্তিতে। মাস ছয়েকের মধ্যেই মোড়লের ছেলে গাঁয়ে ফিরে গেল বোধহয় নতুন কোন গাঁয়ের মেয়েকে কলকাতার পথ চেনাতে।

ততদিনে নীলা বুঝেছে কলকাতায় শুধু খাবারের বদলে নয় দেহটা বেচা যায় নগদ টাকার বদলে। সোনা সেই পথটাই বদল সে। ছবির মোড়লের ছেলের মত অপেক্ষা করে ভিখিরিদের দিন অত বাড়ায়টে মেয়েগুলোর সঙ্গে সহজ হওয়ার কাছে দাঁড়াল। তার মত ভালবাসা নয় পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক শুধু টাকার। কিন্তু সেদিন মাঝে মধ্যে থাকেনা মনটা হু হু করে ছেলেটা মেয়েটার জন্য। বিশেষ করে কোলের ছেলেটার জন্য। চোখের জলে বালিশ ভিজে যায় মাঝরাত্রি ধরে।

রোজগারের টাকা কিছু জমলেই মাসীর হাতে রেখে পাঁচটা টাকা মনিঅর্ডার করল নীলা। রসিদ ফেরত এল। এক সপ্তাহ পরে একটা পোস্টকার্ড এল মাসীর কাছ থেকে। সে জানিয়েছে ছেলে মেয়ে সে নিয়ে ভাল আছে। আর একটা বিয়েও করে ফেলেছে নইলে ছেলে মেয়েদের দেখবে কে!

নীলা এ সংবাদে দুঃখ পেল না। পুরুষ মানুষ। একটা শরীরের জ্বালা সে যে বড় অসহায়। বেশ বুঝেছে। কিন্তু সংসার কাছে সই পারে না যে ছেলেমেয়ে দুটো। নীলা অনেক পর ভেবেছে সতীন কাঁটা তুলতে সতীনরা কি যৌবন কাটে না করে!

ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। এর পর থেকে নিজের যতই কষ্ট হোক মাসে মাসে পাঁচটা টাকা ছেলে মেয়েদের জন্য পাঠিয়ে যেতে লাগল অন্তত টাকা পয়সার লোভেও যদি সতীন তার ছেলেমেয়ের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে। মাঝে মাঝে গাঁয়ে যায়। গাঁয়ে ঢোকার আগে একটা গাছতলায় অপেক্ষা করে কোন ছেলেপুলেকে দিয়ে খবর পাঠায় ছেলে মেয়ের কাছে। তারা এসে তাদের কোলে বসিয়ে খাবার খাওয়ায়। জিজ্ঞেস করে সৎমা ভালবাসে কি না।

ছেলে আবার দুঃখ হয় যে যেমন আদর চাইত না অথচ ছেলে মেয়ে দুটোকে পালাপালিও যায় না বাবারও করে না তার সতীন।

এ বস্তি সে বস্তি পাল্টাতে পাল্টাতে বিভাবতীদের বস্তিতে এসে উঠেছে নীলা বছর খানেক আগে। ঠিক বিভাবতীদের পিছনের বস্তিতে। জায়গাটা তার ভাল লেগেছে। এখান থেকে মা গঙ্গা খুব কাছে। বাবা পশুপতিনাথ মা সিদ্ধেশ্বরী বাবা মদন-মোহন সবই খুব কাছে। যেন সবাই ঘিরে রয়েছে এই বস্তিটাকে। তাছাড়া নীলা আগে আগে যে সব বস্তিতে থেকেছে এটা ঠিক সেরকম নয়। আগেরগুলোয় শুধুই বেশ্যাদের বাস। কষ্ট আর বেশ্যা সব। কেউকেউ দু তিন পুরুষে! পুরুষে না বাড়ীতে বসাই আছ। অর্থাৎ বিবিরা বা সব বেশ্যা।

এখানে তা নয়। এখানে বেশ্যাবৃত্তি আছে পাশে পাশে বটে কিন্তু বেশির ভাগই গরীব গেরস্থবাড়ি। বস্তির লোক বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে বাস করে পুরুষানুক্রমে কেউ কেউ কলকাতা শহরের জন্ম থেকে। আর সেরকম কষ্ট বেশ্যাপাড়ার মত নয় রোজগারি এখানে নেই। লোক বউ-ঝি-দের সঙ্গে দুপুর অবসরে ঠাকুর দুটো সুখ দুঃখের কথা বলা যায় তাদের ছেলে-মেয়েদের আদর করা যায়।

এ পাড়ায় অনেক ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে। বস্তির মধ্যে কল দিয়ে গিয়ে অনেক ছেলেমেয়ে দেখতে পায় নীলা তাদের সঙ্গে খেলা করে। কোলে তোলে আদর। আদর করে। কোন কোন বাড়ীর শিশু মায়ের থাকে যতক্ষণ না ঘুম পাড়িয়ে দেয় করে।

এমনি করে বিভাবতীর ছেলে মেয়েদের ভালবেসে ফেলেছে নীলা।

রোজই দিন বেলা বটা নাগাদ বিভাবতীদের বস্তির উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাক পাড়ে সে, 'কই বাবা কই! আমার বেবু-রানী কই—'

বেবুরা ছুটে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। নীলার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে, 'এই যে আমি'

নীলা জড়িয়ে ধরে বেবুকে বুকের মধ্যে, 'ওমা তাইতো। এই তো আমার বেবু-সোনা বাবুসোনা। সত্যিই আমি দেখতে পাই নি দুষ্টু হয়ে গেছে তোদের মতো বেইডি।'

বেবুর মাথার সঙ্গে নিজের গাল ঠেকে ধরে রাখে নীলা। 'হাঁ বাবা পিসীর ঘরে যাবে নি?'

তাই চায় বেবু। কারণ নীলা পিসীর ঘরে খাওয়া মানে খাওয়া আর আদর।

'হাঁ ভালো হবো' তাগাদা দ্বারা বেবু। নীলা বিভাবতীকে বলে, 'বৌদি ও বৌদি—'

ঘরের ভেতর থেকে উত্তর দেয় বিভাবতী, 'কি বলছো?'

'বেনু বসবাবে যে বাচ্চি গো—'

'খাও কিছু খাবোই তো পেট ভরে। অন্য কিছু খাইও না।'

'না না কিছু খাওয়াবো কি গো।'

নীলা বেনুকে বুক ভরিয়ে বরে বলে বাধ সরি দিয়ে মিসেসের বাড়ির দিকে।

রত্নমালা এসব পছন্দ করেন না। পথে ফিরিওয়ালা খোকা মেয়েছেলের সঙ্গে এই মাখামাখি! বলেন, 'বেনুকে ভালো ভালো ভদ্দর মেয়েছেলের কাছে?'

বিভাবতী কাজের চোটে নিঃশ্বাস ফেলতে অবকাশ পায় না। আশ্রিতদের চেয়ে। কোটা বাড়ী বাসন মাজা ধোয়া কাচা সব একহাতে। তার ওপর পুতুলের কাজ। মেয়েটা যার পাঠশালে এ সময় পড়া সেরে বাড়ির কাজে সাহায্য করে একটু।

বাবার ছেলেকে এ কিসের ভালোবাসা করে তার ওপর নজর রাখা ভারি মুস্কিল। চিনির শস্যটা হট হট করে গলি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ওদিকে কোনদিন যে টুকটুক করে হাঁটতে হাঁটতে একা একা গাড়ির তলায় কি ছেলেধরার খপ্পরে কিম্বা গঙ্গার জলে গিয়ে পড়বে কে জানে। তাই নীলা যে ওকে নিয়ে যায় ছেলেকে এটা তার পক্ষে ভালো হয়েছে।

বিভাবতী বলে মন দিলে একগাল হাসিয়া বলতে বলতে, 'কি ভক্তি হল দিদি! ছেলেটাকে বড্ড ভালোবাসে'—

'তা বাসে। কিন্তু ঐ বেনারসের মেয়েছেলে কত খোকা খোল টোল আছে। বুকে বুক দিয়ে চুমুটুমু খাচ্ছে। কে জানে ওর পাতা গলি কিছু আছে কিনা।'

শিউরে ওঠে বিভাবতী। কত পাপবার মন ওই ছেলে। কত প্রার্থনার ফল। তার ঐ সব রোগ।

না। আগে করে বেনু নীলা কেমন নিয়ে এলো। সত্যিই তো দিদি ঠিকই বলে —পাতা গলি! আবার মা নিশ্চিন্ত করে ওঠে।

এদিকে নীলার ঘরে তখন মনের আনন্দে বিছানায় পা ছড়িয়ে বসে ভজিয়া খাচ্ছে বেনু।

নীলার ঘরটি বেশ পরিচ্ছন্ন। একটা বিছানা পাতা। শাড়ির পাড় মুড়ে মুড়ে একটা চাদর করে সেটা দিয়ে বিছানাটা ঢাকা। একটা দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট দেরাজে ওই কথা 'কার্পাস শিলনামের' খাবার। পরিচার করে রাখা সব। দুটো কলকাতে কাঁসার মাল। উল্টোদিকের দেওয়ালে একটা ছোট চৌকির ওপর বসানো দুটো টিনের তোরঙ্গ। সেগুলোও শাড়ির ঢাকা দেওয়া। এক কোণে একটা ছোট চৌকির ওপর একটা মা লক্ষ্মীর ছবি তার সামনে ধুপকাঠি। একটা পরিচ্ছন্নতা নীলার এই ছোট্ট ঘরের মধ্যে বিরাজ করছে। দেখলে বস্তির দুটোর ঘর বলে মনেই হবে না।

নীলার ঘরের সব কিছু টেনে টেনে ভাবে বেনু আর প্রশ্ন করে, 'এটা কি?'

'এটা আয়না।'

'এটা?'

'ওটা ছবি।'

'কিসের ছবি'

'মা লক্ষ্মির।'

বেনু ভেবে বলে, 'মা লক্ষ্মি ঠাকুর হয় না? ভালো মেয়ে হয় না?'

নীলা আদর করে গাল টিপে দেয়, চুমু খেয়ে বলে, 'আমার বাবাটা পাকা বুড়ো। সব জানে বাবাটা।'

বেনুর ছোটো ভজিয়া খাওয়া শেষ হয়েছে। ও বলে, 'দিদি আরো ভজিয়া।'

'আর ভজিয়া তো নেই বাবা—'

'হ্যাঁ আছে।'

'কোথায়?' এবার হাতে ধরা ঠোঙাটা দেখিয়ে বলে নীলা—'এই দ্যাখো নেই।'

বেনুকে ফাঁকি দেওয়া অত সোজা নয়। নীলার ঘরের সব অলিগলি তার জানা। গোটা গিয়ে শাকের ভাঁড়ের ভিতর হাত পুরে দায়, একটা ভজিয়া তুলে বলে, 'এই তো—'

লোকলজ্জার যেন এটা। নীলা রোজই কিছু না কিছু খাবার লুকিয়ে রাখে। বেনু সেটা টেনে বার করে তারপর তুলবেই খিল খিল করে হেসে ওঠে। 'উঃ! আমিবেনো?' নীলা ভাবতে পায়। চোখ দুটো উঠোনে সীটা দিচ্ছে যেমন। খানি মাথে মাথা পড়া। মুখ দিদি। যেন পুতুল রাজা।

এই সব বস্তির বাঁশিদ ভাড়াটেদের প্রায় সবাইকে রোজ কাজে হয় দুটো তিনটে পর্যন্ত সকলের দিয়ে। উঠতে প্রায় সকলেরই বেলা নটা দশটা। এবার নীলা রোজই ভোর ছটায় উঠে সকালের পরিচার করে কাপড় চোপড় কেচে স্নান সেরে আসে বেলা আটটা সাতে আটটার মধ্যে। নীলার বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা বেলায় ওঠে। চায়ের দোকানের ছেলেকে ডাক দেয় কেটে চা খায়। খানিক পরে মুড়ি কেটে তাদের খাবার। দুপুরে রান্নার পাট বেশির ভাগেরই নেই। বেলা একটা থেকে দুটোর মধ্যে হোটেল থেকে আনে ভাত তরকারি। চার পয়সা থেকে দু পয়সার মধ্যে হয়ে যায়। তারপর দিনের ঘুম। বিকেলে সাজগোজ। সন্ধ্যের দিকে বসে থাকা। রাতে অনেকের পয়সায় খাওয়া মদ আর মাংসের চাট। পয়সা না জুটলে উড়িয়া ঠাকুরের দোকান থেকে কিনে আনা কটি তরকারি। এর খাবারে পেট ভরা।

নীলা এখনো এদের মত হতে পারে নি। তার গায়ে এখনো গ্রামের মাটির গন্ধ। তাই সে অন্যরকম। আর এই অন্যরকম বলেই ওকে অন্য মেয়েগুলো যেন

পড়তে পারে না। মেনকার পাতা আর উঠোনে ঝাঁটা দেবার। তখন ডাক্তারের বাড়ি। সবাই মিলে পাতা করে উঠোনে ঝাঁটা দায়। মেনকার পাতা হলে সবচেয়ে বেড়িতে ঝাঁটা পড়ে।

মেনকা ভাবিয়ে ভাবিয়ে বলে, 'বিয়ের আগে ছেলে দেখে বুকের মধ্যে তো কোন-কালায় এলি। সেটের ছেলে কোথায় রইলো কি কাজে ঠিক দিবো সেই ভাল, এখোন পরের ছেলে নিয়ে মাখামাখি। চং দেখে আর হেসে বাঁচিনি বা।'

নীলা সব শোনে। গায়ের মধ্যে জ্বালা ধরে যায় কিন্তু জবাব দেয় না। অনেকা লোকেরা সব বেরোচ্ছেন। সে যদি কারো ছেলেকে নিয়ে আদর করে তাতে লোকের গা জ্বলে কেন বাপু?

বেণুকে কোলে তুলে নিয়ে সে বলে, 'চল বেণুবাবু, বাড়ি ফিরে এলি। মা খুঁজবে'।

বেণু বলে, 'না যাবো না। আমি তোমার কাছে থাকবো—'

মেনকা বলে ওঠে, 'ফাজিল নি-কে ছাড়িস নি। ঘরে যাক্। এ বাড়িতে ওইটেই দেখা যায়।'

ঝ্যাং ঝ্যাং করে হাসতে থাকে মেনকা।

নীলা তীব্র দৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখে বেণুকে কোলে-করে দ্রুতপায়ে বেণুর বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায়।

ছয়

বেণুর অত্যন্ত খারাপ লাগে মা যখন কাঁদে। কাজ করতে করতে বাবা বকতে বকতে যখনি খানিক ঝি হয়ে বলে তখনি এবার ভ্যানভ্যান করে শুরু করে তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নানা কথা বলে চড়া গলায় মস্ত সুর করে কাঁদতে থাকে।

খেলা তখন বন্ধ হবে। বেণু চণ্ডীর কাছে বসে চণ্ডীর পুতুল খেলা দেখছে। চণ্ডী পুতুলগুলোকে কাপড় পরাচ্ছে খাটে শুইয়ে রাখছে আবার তুলে বসাচ্ছে। তার মধ্য আকৃতির পুতুলের সঙ্গে বড় পুতুলের বিয়ে হবে তিনদিন সেই সব কথা বলছে। চণ্ডীর ছেলে আকৃতির মেয়ে অথবা খাওয়াদাওয়া কি হবে কি না হবে তারও আলোচনা চলছে। এমন সময় শেফিম বিন্দাবতীর কান্না শুরু হোল।

বেণুর কথা চণ্ডীর খেলা সব থেমে গেল। সমস্ত আবহাওয়াটাই যেমন যেন বদলে গেল।

অনেক পরে বেণু আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, 'এই চণ্ডী, মা খালি খালি কাঁদে কানো রে?'

চণ্ডী ধমক দায়, 'চুপ কর্ আন্দর। বকবক করিস নি। মা বাবার জন্য কাঁদে, ঠাকুরদার জন্যে কাঁদে।'

বেণু অবাক হয়। বলে 'তারা তো মরে গ্যাছে—'

'সেই জন্যেই তো কাঁদে। বোকা কোথাকার। লোক মরে গেলে কষ্ট হয় না?'

বেণু অত বুঝতে পারে না। সে বাবাকে ঠাকুমাকে দ্যাখেনি। তারা মরে গেলে কষ্ট হয় কিনা অতশত সে জানে না। তবে লোক মরা সে দেখেছে। এই পাড়াতেও লোকেরা মরে। তাদের খাটিয়ায় তুলে লোকেরা বল হরি হরিবোল বল হরি হরিবোল বলতে বলতে কাঁধে চড়িয়ে শ্মশানে নিয়ে যায়। সেখানে চিতার ওপর কাঠ সাজিয়ে কাঠের ওপর লোকটাকে শুইয়ে দায়। তারা থেকে পাকাটি দিয়ে আগুন জ্বেলে কাঠ ধরিয়ে দায়।

বেণু এসব জানে। প্রতিদিনই মায়ের সঙ্গে গঙ্গায় যায় স্নান করতে। গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে কী ভাল লাগে। কত জল। জলের মধ্যে লাফালাফি করে। মা বকে। কোনদিন মাছও পায়। স্নানের পর মা প্রণাম করে শিবকে গিয়ে প্রণাম করে। আসে তারপর বাবা গঙ্গাদেবের শিব-ঠাকুরকে প্রণাম করে। বেণুও মায়ের দেখাদেখি সবাকার প্রণাম করে। গঙ্গার ঘাটে যাবার পথে কত যে দোকান। আর দোকানে কত রং কত কি যে ঠাকুর দেবতার ছবি! কোথাও কালীর কোথাও শীতলা কোথাও বা লক্ষ্মী। নমস্কার করতে করতে হাত ব্যথা হয়ে যায়। ঠাকুর, মন্দির, ঝর্না মিলে সে। তাছাড়া খাবারের দোকানে ছিল গেলে কত মজা যে হয়। ফিরে আসে বল হরি হরিবোল ধ্বনি করতে করতে মরা যাত্রা। মরার সঙ্গে পয়সা আধলা ছড়াতে ছড়াতে চলে। অনেক ছেলে এমন কি বড় বড় লোকেরাও পয়সা আধলা কুড়োতে কুড়োতে যায়। বেণু একবার একটা পয়সা চাপার কুড়িয়ে পেয়েছিল হাত মধ্যে ছিল সে। মা কিছুতেই সে পয়সাটা নিতে দিল না বলল, 'ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা, ওটা মড়ার পয়সা, ছোঁয় না ওসব পয়সা ছি।'

বাবা হলে সে একটা ঠিকঠিক পয়সাটা নিয়ে নিত। কিন্তু কষ্ট হয়েছিল খুব। একটা পয়সায় কত কি খাওয়া যেত। চারটে কমলা, চারটে ফুলুরি, দুটো কুলফি দুটো বড় বড় বেগুনি, ফুচকা ঘুগনি নকুলদানা আলুকাবলি কাবলিছোলা কত কি। অথচ মোটা একটা পয়সা মা নিতে দিল না। মড়ার পয়সা বলে।

কিন্তু যবে বাবা আর ঠাকুমা মরে ভূত হয়ে গ্যাছে তাদের জন্যে মায়ের এই কান্না ভাল লাগে না বেণুর। বিশ্রী লাগে। এই কান্নার পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মা কেমন

খুব হেসে যাবে। কেউ কাউকে বলা যায় না বাবে।

'চণ্ডী তুই বাবাকে দেখেছিস?'

'হুঁ' মাথা নেড়ে জানায় চণ্ডী। সে একটা আদুরে পুতুলের মাথা হাত বলো দিয়ে বেঁধে তোলা লাগাবার চেষ্টা করছিল।

'ঠাকুমাকে?'

'হুঁ', এটা কিন্তু ঠিক বলল না চণ্ডী। কর্তা মুখুজ্জে তেতলার ঘরের কথা যদিও আবছা মেয়ের মনে পড়ে কিন্তু ঠাকুমার কথা মোটেই না। শুধু একটা কেমন আবছা পড়া যে একজন হাতে নিয়ে তুল খাচ্ছে সেই এইটুকুই মনে আছে তবু ছোট বাচ্চা যেন গম্ভীর ভাবেই হুঁ বলল।

কিছু পরে কমলাদি নিজের ঘর থেকে বিভাবতীকে বললেন, 'এবার খাবো বউ। আর কত দাঁড়াবে! এ বাড়ি তো এখনো অনেক দিন দাঁড়াতে হবে যদিন না ছেলেটা মানুষ হয়। যাও এবার একটু খাও।'

কমলাদির কথাতেই হোক আর রাগ করেই হোক বিভাবতী কাজ থামায়। ডেকিয়ে কাছে, 'চণ্ডী ও চণ্ডী'—

চণ্ডী খুব আনমাহুরের মত মায়ের কাছে যায়। 'কি বলছো মা'

'কি করছিস কি এখানে? পুতুল খেলছিস কিছু। পাঠশালা যাবি না?'

'আজ তো রোববার,' চণ্ডী আস্তে আস্তে বলে।

বিভাবতী কাজের দিকে ওঠে, 'রাম রাম তাহলে আর কি, মাটির পুতুল খেলে কাটুক। তোমার শিশির সোনার মত মাই আমি। আরো বড় হলে একটু লেখাপড়া শিখে ভাল হবে কিছু নেই। একা কাঁদি পুতুল খেলা পড়ে রয়েছে। ওগুলো রং করবে কে? সব আমি দেবো?'

চণ্ডী খুব কাঁদুকাঁদু করে বলে, 'রং দেখো তেই দেখো। তুমি রং গুলে দেবে তবে তো!'

কথাটা সত্যি। চণ্ডীর বয়স এই সবে চলছে। পুতুল রং করাই করতে পারে সে কিন্তু রং ঠিক করে গুলতে পারেনা। মাটির পুতুল রং করার রাস্তা কম কিন্তু এই রং গোলা ভৌমার ব্যাপার অনেক। খুঁটো বা আলা রং অনেকক্ষণ ধরে আগুনে করে পাতার সাথে দিয়ে মিশিয়ে মিহি করতে হবে। মাঝে মাঝে দু ফিরতে রং একদম মেশাতে হবে, পরিমাণ মত তেঁতুলবীচির আঠা মেশাতে হবে। আঠা মেশানো আর এক সমস্যা। যদি আঠা কম মেশানো হয় তো ফুল ফুল করে উঠে যাবে আর যদি বেশি হয় রঙের চেহারা নষ্ট হয়ে পুতুলের গায়ে রং ভালোই চড়বে না। তাছাড়া বিভাবতীর কাজ। ওই একটা অবসর। এতবড় মেয়ে আজ বাদে কাল বিয়ে দিতে হবে যার সে মাটির গুলতে পারে না। বকতে বকতে রান্নাঘর থেকে উঠে আসে, 'সব আমায় করতে হবে। পোড়াকপালের ভগবান কাকে হতে বলে আছে আমায় তো দেবে না, মনির মত আপনমনে থাকতে হবে সব—।' হাতের খুরি মালা সব যায় ঘরের টেনে টেনে তারপর আঙুল হাতে ধরে কম মিশিয়ে আঙুলে নিখুঁতে নিখুঁতে চণ্ডীকে বলে 'খাও ভারপ্রতিটা নাকো, কামাই পড়ে না যায়। কম কম থাকলে একটু জল দিও।'

রং গোলা শেষ করে বিভাবতী আবার রান্না করতে গেল। চণ্ডী এবার এক পুতুল রং করায় দিকে। মাটির নাটোর সারি সারি কার্তিক ঠাকুর। ছোট বড় মাঝো মাপের। বসানো হোমানো। বিভাবতী কোনটার মাটির কাজ শেষ রেখেছে, কোনটা খড়ি মাখানো। পুতুলগুলোয় রং করতে বসল চণ্ডী।

দিন পনের পরেই কার্তিক পুজো। দিন পনেরর মধ্যেই পাইকারেরা আসবে। সব বাড়ি ঘুরে ঘুরে পুতুল কিনবে। এখানে নতুন পাল বসাইদের বাড়ির মেয়েরা সবাই প্রায় এই সব ছাঁচের ঘুটি তৈরি করে। চণ্ডী বাঁশের চোঙা কলম মতো থেকে ছাপগুলোর তৈরি তুলি ধার ধরল একটা প্রয়োজন মত। তারপর একটা ছোট খড়ি মাখানো পুতুল তুলে নিল হাতে। মা এখন পিটুলি গুলে দিয়েছে। কার্তিকের গম্ভীর প্রায় অনেক খোলা। সেই খোলা থেকে অল্পটুকু বসুন রং আঁচলো প্রথম কাজ। তারপর মুখের চীন রং, মাথাটি কালো রং তারপর চোখমুখ চুল কালি দিয়ে হবে, কালি দিয়ে পাকা কানকোর পাড় টানা। বাস রং শেষ। তারপরে ময়ূরশ দিয়ে গুলে গোটা পুতুলটায় তিসির সিরা মাখানো, তারপরে বার্নিশ।

কত কাজ কত পুতুল! কিন্তু কি ওর রাখার হয়। তিন আনা চার আনা কুড়ি পাইকারি হয়। তারা বেচবে একটা দু'পয়সা। বাজার খারাপ হলে একপয়সা দেড়পয়সা।

বেবু চণ্ডীর পাশে বসে বিরক্ত করতে লাগল, 'এই চণ্ডী, আমি একটা পুতুলে রং লাগাবো।'

চণ্ডী ধমক দিল ভাইকে, 'না, রং নষ্ট করিস। পুতুল খারাপ হয়ে যাবে। মাকে বলে দোব।'

'নষ্ট করবো না। তুই একটা তুলি দেনা—'

'না। ওমা—আখো বেবু জ্বালাচ্ছে, কাজ করতে দিচ্ছে না।' ঘর থেকে চিৎকার করে চণ্ডী মাকে নালিশ জানাল বেবুর নামে।

বিভাবতীর চ্যাঁচাতে লাগল, 'এবার আরো দু'ঘরে দিয়ে পুতুলগুলো। এই বেবু আয় ইদিকে আয় বলছি—'

বেবু ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যাবেরাবে ঘুরে

মাকে বলল, 'মা এটা তুমি খাও না, আমি রং মাখাবো। খাও না।'

মায়ের পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়ে বেনু আবদার করতে লাগল।

বিভাবতী বিরক্ত হোল খুব, 'আঃ বেনু সর্, বলছি এখান থেকে, নয় মারবো খাবি। ও চণ্ডী দে বাপু ওকে একটা তুলি। যা উঠে বস। নইলে বড় জ্বালাচ্ছে। যা ছোটদির কাছে গিয়ে বস।'

বেনু ছুটে এল ছোটদির কাছে। চণ্ডী একটা তুলি ধার করে তার হাতে দিল। বেনু খড়ি মাখানো একটা পুতুল তুলে নিয়ে বাবু হয়ে বসে মনোযোগ সহকারে রং মাখাতে লাগল। বেনুর বয়স চার বছর চলছে। মাথায় বেড়া বিনুনি। মায়-দিদের চুল পাঁচ বছর না হলে কাটা হবে না। গায়ে ছিটের ছোট হাতকাটা বেনিয়ান ফ্রক। পরনে ইজের। হাতে দুটো রূপোর বালা। দু'হাতে গলায় কোমরে অনেকগুলো মাদুলি বাঁধা। ছেলের চেয়ে ওকে দেখে ছেলেই মনে হয়। একটু ফর্সা ফর্সা লাগে এখন কিন্তু রোদে ঝিকমিকিয়ে বেড়ায়। ভোলানাথ পাল বলেন, 'পাড়া দিন দিন আদলাতার সোনাই হচ্ছে।'

বেনু পুতুলটায় রং মাখিয়ে চণ্ডীকে দেখাল।

'দ্যাখ চণ্ডী, হয়েছে?'

চণ্ডী দেখল। খুব অবাক হোল। ছোলেটা পুঁচকে কিন্তু খুব মাথা খাটিয়েছে। এইটুকু ছোট ছেলে হ্যাবোজিবি কি সুন্দর রং করেছে দেখে দেখে! সব জায়গা-গুলোয় ঠিক ঠিক রং লাগিয়েছে। তুলিতে ফিনিয়ে পুতুলটা রেখে চণ্ডী ছুটে গেল মায়ের কাছে। 'মা দ্যাখো বেনু কি সুন্দর রং লাগিয়েছে! আশ্চর্য! ঠিক লাগিয়েছে মা আর খুব তাড়াতাড়ি।'

বিভাবতী দেখল। সত্যি এইটুকু ছেলে ঠিক যেখানে যেখানে লাগাতে হবে বলুন ত' সেখানে সেখানে পরিষ্কার করে লাগিয়েছে। মোটে একবার বলে বলে দেখিয়েছে। আর লেখাপড়া! যে পোকে সেই আবার হয়ে যায়। চণ্ডীর পড়া দেখে দেখে পড়া শিখতে বসতো। তখন মুখ দিয়ে সব কথাও বেরোত না কিন্তু কত তাড়াতাড়ি প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ শেষ করেছে।

ভোলানাথ পাল তো গর্বে ফেটে পড়েন বলেন, 'বৌমা, দাদু যদি ভগবানের আশীর্বাদে বাঁচে তাহলে তোমার দুঃখ ঘোচাবে।'

রোজ সন্ধ্যাবেলা ভোলানাথ এখন ওকে নিয়ে রামায়ণ পড়তে বসেন। ভোলানাথ পাল সুর করে সুন্দর রামায়ণ পড়েন, বেনুকে বলেন, 'পড় দাদু তুমিও পড়।' কচি গলায় বেনু যখন দাদুর মত সুর করে দুলে দুলে রামায়ণ পড়ার চেষ্টা করে কি মিষ্টি যে লাগে। যে শোনে সেই হাসবে হাসে। আর তখনই চন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে বিভাবতীর। মন খন চোখের জল মুছতে থাকে আর খান খুঁতির আঁচলে।

বিভাবতী হাসিমুখে বলল, 'দেখেছিস তো বেনুর আমার কত গুণ'—

বেনু ও চণ্ডীর পিছন পিছন এসেছিল। মা আর দিদির মুখে প্রশংসা শুনে খুব আনন্দ হলো তার। এরই মধ্যে কান কান শুনে শুনে তার একটা নেশা লেগেছে। প্রশংসা শুনতে খুবই ভালবাসে।

'আরো রং করবো মাগো?'

'না, তবে রং বেশ বেশি ছিটিয়ে নষ্ট কোরো না আর পুতুল টুতুল ফেলে ভেঙো না।'

'আচ্ছা, বেনু গিয়ে বসল পুতুল রং করতে।

বেনুর পুতুলে রং করার হাতেখড়ি হোল সেদিনের মত নিতান্ত খেলাচ্ছলে তা নয় ডাক এ বাড়ি ...

নীলা আসে। 'কই গো বেনু বাবা, কি হোল? আজ যে বড় খেলতে নি আমার ঘরে।'

বেনু গম্ভীর হয়ে বলে, 'না! আমি পুতুল রং করছি।'

'ও বাবা দেখি দেখি,' নীলা উঠোন থেকেই উঁকি দিল। কোনদিন সে বিভাবতীদের দাওয়ায় ওঠে না। উঠোনে দাঁড়িয়েই কথা বলে। উঠোন থেকেই বেনুকে নিয়ে যায়। বেনু অবশ্য আজ-কাল একা একাই সকাল সাঁঝে দুপুরে বাগানে চলে যায় নীলার ঘরে। যেদিন না যায় সেদিন নীলা নিতে আসে।

উঁকি দিয়ে নীলা বলল, 'ওমা সত্যিই তো! ও বৌদি, ছেলে তোমার যে বড় শিল্পী হয়ে উঠবে গো।' তারপর বলল, 'তাহ' শেষ হলে এসো কিন্তু।'

বেনু তার দিকে একবার চাইল। নীলা হাত ইশারা করে কিছু জানাল। বেনু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। নীলা হাসিমুখে চলে গেল।

নীলা দিদির বাড়িতে যেতে আজকাল যেমন একটা ভাল লাগে না বেনুর। ওদের বাড়ির সব লোকগুলো ভাল নয়। কেমনা দিদি বলে যে মেয়েছেলেটা সে তো ওকে বলেই, 'এ বাড়িতে এসো নি বেনু। আমরা বোষ্টম জাতো নই। আমরা ছেলে নই, তাদ—'। সত্যিই তাই নিয়ে মহা কিল কিল করে হাসে মেয়েরা। আবার দিতি যায়।

তাছাড়া যাও নানা করে, ব্যাটাছেলে যাবা করে। কিন্তু যাবে না যাবে না করেও শেষ অবধি না গিয়ে পারেনা বেনু। নীলা দিদির ঘরে ওদিকা কমপুতি বৌদের জিনিস একটা না একটা কিছু যে থাকেই। যেটা নিয়েদের ঘরে দেখেতে পায় বেনু। আর

পৈতাগিন্নি লোকটা যে রক্ত তাল। কি আবহাই না করে তাকে!

সাত

বাঙালী হিন্দুরা পাঁচ বছরে ছেলেদের হাতেখড়ি দায়। অর্থাৎ সেই হোল পড়ার বিদ্যারম্ভের কাল। বাঙালী হিন্দু পুরুষেরা। মেয়েদের ওসব বালাই নেই। আর মেয়েদের মধ্যে পড়াশোনার চর্চাই বা কত? আজকাল শহরে একটা ঢেউ এসেছে বলেই অনেকেই লেখাপড়া শেখাচ্ছে। কিন্তু শহরের বস্তিতে এখনো যেমন ঢেউ লাগেনি। যদি কোন মেয়ে পড়েও বা ঐ তিন পাঁচটা পর্যন্ত। বিদ্যাবতীদের বস্তিতে ছোটো পাঁচ ছয় মেয়ে পাঠশালায় পড়তে যায়। বস্তিতে স্কুল দুটি। একটা কর্পোরেশনের ফ্রি প্রাইমারি, আর একটা পাড়ার গৌরনিতাই ইংরেজ-বর্জিত নাইটস্কিলে বিদ্যারম্ভ পাঠশালা। কেউ কেউ বলে গৌর পণ্ডিতের পাঠশালা। গৌর পণ্ডিত এই পাঠশালা স্থাপন করেছেন। সত্তরের বেশি তাঁর বয়স। এখনো পড়িয়ে যাচ্ছেন। চন্দনাথ তার মেয়েদের গৌর পণ্ডিতের পাঠশালাতেই ভর্তি করে দিয়েছিল। কর্পোরেশনের স্কুলে বিনা বেতনে পড়ানো হয়। বিদ্যারম্ভ পাঠশালায় বেতন লাগে। শ্রেণী অনুযায়ী মাসিক আটআনা বারোআনা একটাকা। দুটো স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে রেষারেষি চলে। কর্পোরেশনের ছেলেরা বলে, গৌর পণ্ডিতের পাঠশালা, দিতে হবে চাঁদকলা। বিদ্যারম্ভ পাঠশালার ছেলেরা বলে, কর্পোরেশন ইস্কুলের মেকিপড়ো সব, বাঁদরামি শেখা, ছেলেরা সব বখা। কর্পোরেশনের ছেলেরা রেগে যায়। বিদ্যারম্ভ পাঠশালায় বসতে হয় মাটিতে মাদুরের ওপর।

কথা হয়েছিল বিবির সঙ্গে বিদ্যারম্ভ পাঠশালায় যাবে বেবুও। আজ গিয়েছিল। ফেরেনি কিছুই ভাল লাগেনি বিবুর। অনেকক্ষণ আটকে থাকা। বেবুর ওসব মাদুরে বাবু হয়ে ঠায় বসে থাকা। তার ওপর মাথা জোড়া টাকওয়ালা বুড়ো গৌর পণ্ডিত মশাই বেত হাতে সব সময় বসে থাকেন, 'এ্যাই এ্যাই চুপ চুপ। নিয়ে হয়ে বোস। এ্যাই ও—' একটু গোলমাল হলেই সপাং করে বেত পড়ছে পিঠে।

ফিরে এসে বেবু বলল মাকে, 'আমি ও পাঠশালে যাবো না—'

বিদ্যাবতী বলল, 'কি হোল কি, দিদির সঙ্গে রোজ ইস্কুল যাবো ইস্কুল যাবো বলে বায়না ধর আর একদিনেই সব মিটে গ্যালো?'

বেবু বলল, 'ও বিচ্ছিরি ইস্কুল ওখানে পড়বো না।'

সন্ধ্যাবেলা চন্দনাথ পান কারখানা থেকে ফিরলেন। উনি হাঁপাচ্ছেন। দিন দিন হাঁপানীটা বেড়েই যাচ্ছে। একটু সুস্থ হয়ে বললেন, 'বাচ্চু তনপুর ইস্কুলে গিয়েছিলে আজ। কেমন হোল পড়াশোনা?'

বিদ্যাবতী হাতের কাজ ফেলে স্বামীকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছিল। বেবুটার আড়াল থেকে বলল, 'সব মিটে গ্যাছে। বসতে ওখানে আর যাবেনা।'

বেবু এসে হাফপ্যান্টটাকে কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। চন্দনাথ মেয়ের মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'এর তাড়াতাড়ি সব মিটল বাচ্চু?'

'ও ইস্কুল ভালো না। বিচ্ছিরি ইস্কুল। আমি ভালো ইস্কুলে পড়বো।' বলে উঠে বসল বাচ্চুর পাশে। দু হাতে জড়িয়ে ধরল বাচ্চুর গলাটা।

বাবার পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়ক বার করতে করতে চন্দনাথ বললেন, 'ও ইস্কুল বাবার পছন্দ নেই তোমার। তোমাকে ভালো ইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হবে। একেবারে হাই ইস্কুল। কেমন?' তারপর মোড়কটা বেবুর হাতে দিয়ে বললেন, 'এটা ছোট-দিদির সঙ্গে ভাগ করে খেয়ে নাও। তারপর হাতমুখ ধুয়ে মায়ের পড়ানো ছিটিয়ে খাবার নিয়ে আসবে।'

কাগজের মোড়কটা হাতে নিয়ে বেবু বলল, 'কি বাচ্চু এতে?'

'খুলেই ভাখো'—

বেবু মোড়কটা খুললে, যা ভেবেছে তাই। কেক! বলে উঠল, 'কেক!'

কি সুন্দর যে খেতে এই চৌকো চৌকো কেকগুলো। তুলোর মত নরম। মিষ্টি। ভিতরে কিসমিস গোঁজা থাকার দেওয়া! বাচ্চুটা যে কি! দুটো আনতে পারে না। এটা আবার ছোটদির সঙ্গে ভাগ করে খেতে হবে! ইস! কিন্তু বাচ্চু দুটো আনবেই বা কি করে। দামতো কম নয়। দু'পয়সা। চার চারটে আধলা। মা তো একদিনও তাও না এনে দিলে। কেবল বাবার হাতনা হলেই বলে, 'বাচ্চু তো ছিদি পালের দোকান থেকে এনে দেবার পাঁজরায়। আমি অত পয়সা কোথায় পাবো। যা তাল। মোলা বেড়ে গ্যাছে। ফিরে পেলে পরে মুড়ি আছে খাও।'

মায়ের খাবার মধ্যে মুড়ি আর রুটি। এছাড়া রোজরোজ বেবুর মা আর খাবার চেনেও না।

চণ্ডী মণ্ডপে মধ্যে গৃহদেবতার পঞ্চ্যা-চরিত বিবিধপত্র লোচাচ্ছিল। একটু পরেই পুরোহিতমশাই আসবেন। এই একটা দিন বিদ্যাবতী অতিকষ্টে বসার বেশ চলেছে। দিনে হয়ে এসে দেখেছে যত ঘটের একপাশে একটা কোষাকুষি কাঠের পাটিপাতা দিয়ে একটা আয়গায় কাঠের সিংহাসন পাতা। সেই সিংহা-সনের ওপর শালগ্রাম শিলা, শিবদের

ছোট লক্ষীনারায়ণ মূর্তি, রাধাকৃষ্ণের একটা ছবি। এরা সবাই গৃহদেবতা হিসেবে পুজো পান। তারজন্য যাঁরা পুরোহিত আছেন দুবেলা পুজো সন্ধ্যারতি করে দিয়ে যান। শাশুড়ির কাছে নয়। প্রথমে ছিলেন কট্টর বৈষ্ণব, পরে ঘোরতর শাক্ত। মারা যাবার বছর খানেক আগে একটা কাণ্ড করেছিলেন শাশুড়ি। ইদানীং কালীভক্ত হয়ে উঠে প্রায় উন্মাদের মতই থাকতেন। পরনে গেরুয়া কাপড়। মাথায় জটা। হঠাৎ ভোলানাথ পালকে দিয়ে জোর করে একটা ছোট তারামূর্তি তৈরি করালেন নিজেরই। ঘরে পুজো করবেন।

ভোলানাথ বলেছিলেন, 'তারা মূর্তি ঘরে কেউ পুজো করে না। ও হচ্ছে শ্মশানে পুজো করার ঠাকুর।'

শাশুড়ি, বলেছিলেন, 'না আমি ঘরেই প্রতিষ্ঠা করবো। স্বপ্ন পেয়েছি।'

ভোলানাথ অনেক ওজর আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড জেদী মানুষ ছিলেন শাশুড়ি। অগত্যা ভোলানাথ একটা তারামূর্তি তৈরি করে দিলেন। মূর্তি গড়ার সময় অত্যন্ত শুদ্ধাচারে থাকতেন তিনি। নিরামিষ খেতেন। সকালবেলা গঙ্গাস্নান করে তবে মূর্তি গড়ার কাজে হাত দিতেন।

মূর্তি তৈরি হোল। ঘটা করে প্রতিষ্ঠিত হল। এক কালীপূজারী বাঁধা হোল নিত্য পুজোর জন্য।

কিছুদিন যেতেই একদিন ভোরবেলা উঠে চন্দ্রনাথ বলল তার মাকে, 'মা, এইমাত্র একটা স্বপ্ন দেখলুম, মা তারা যেন স্পষ্ট বললে খিদে পেয়েছে খেতে দে। আমার গলায় এখনো কাঁটা বিঁধছে।'

শাশুড়ি তখনি কালী পূজারীকে ডেকে পাঠিয়ে মা তারার পুজো আর সেই সঙ্গে বিশেষ ভোগের আয়োজন করলেন।

কিছুদিন পরে আবার স্বপ্ন এবার শাশুড়ি দেখলেন। মা তারার কাছে [illegible]

দিয়ে গেছেন, কিছু খেতে চাইছেন।

আবার পুজো আবার ভোগ।

এমনি একমাস দু'মাস পর পরই কেউ না কেউ স্বপ্ন দেখে, মা তারা খালি খেতে চাইছেন। সবাই মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল।

বছরখানেক বাদে কি একটা বিদ্ঘুটে রোগে ঘাড় শক্ত হয়ে শাশুড়ি মারা গেলেন। লোকে বলল, 'খিদে খিদে করে মা তারা শেষ অবধি তাকে খেয়েই নিশ্চিন্ত হোল।'

শাশুড়ি মারা যাবার দু'দিন পরে এক অপরিচিত জটাজুটধারী সন্ন্যাসী বাড়িতে এসে হাজির। 'এ বাড়িতে কোন তারামূর্তি আছে?' সন্ন্যাসী প্রশ্ন করল।

অশৌচ গায়ে চন্দ্রনাথ বাড়িতেই ছিল। বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে? কোত্থেকে আসছেন?'

সন্ন্যাসী বলল, 'আমি সন্ন্যাসী তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। আসছি কাটোয়া থেকে। আছে এখানে কোন তারামূর্তি?'

'হ্যাঁ একটা তারামূর্তি ঘরে আছে। প্রতিষ্ঠা করা মূর্তি! নিত্যপুজো হয়।'

চন্দ্রনাথের কথা শেষ হতে না হতেই সন্ন্যাসী বলল, 'ওটা আমায় দিয়ে দে। আমি নিতে এসেছি'।

চন্দ্রনাথ বলল, 'বাঃ তা কি করে হয়! প্রতিষ্ঠা করা মূর্তি!'

সন্ন্যাসী বলল, 'ঘরে ও মূর্তি কেউ প্রতিষ্ঠা করে? খোলা শ্মশান যার বাসস্থান, মড়াপোড়ার গন্ধে যার আমোদ তাকে চার দেওয়ালের মধ্যে ধূপ ধুনোর গন্ধ শোঁকালে তার ভালো লাগবে ক্যানে?' তারপর বললেন, 'ও বেটি আমার স্বপ্নে বলেছে এখেনে থাকবে না। ঠিকানাটাও ওই তো বলে দিয়েছে। দিয়ে দে নইলে আরো অকল্যাণ হবে।'

চন্দ্রনাথ ভোলানাথ পালকে খবর পাঠিয়ে আনাল। ভোলানাথ এলে তাকে সব খুঁটিনাটি বলল। শেষে বলল, 'আমার কেমন সবটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। হয়তো কোথাও খবর পেয়ে মূর্তিটা হাতাবার তালে এসেছে।'

ভোলানাথ বললেন, 'যাই হোক তুমি ওটা এখুনি দিয়ে দাও। তোমার মাকে তখনি মানা করেছিলাম, বাড়িতে তারা মূর্তি প্রতিষ্ঠা না করতে বলেছিলাম, কিন্তু তিনি শোনেন নি। যা হবার তা হোক এখন সন্ন্যাসী যখন নিতে এসেছে দিতে যেতে চাইছেন দিয়ে দাও। দেরি কোর না।'

সেই সন্ন্যাসী তারা মূর্তিটা নিয়ে চলে গিয়েছিল।

কিন্তু এই নিয়ে শালগ্রাম দেবতার মত চন্দ্রনাথের বিশ্বাসী ভক্তির [illegible] না। রোজ সন্ধ্যেবেলা আরতির সময় বার বার [illegible] শঙ্খ, ঘন্টা [illegible] আর শাঁখ। বাতাসা এক পয়সার ও একটা পয়সা রাখা। পুরোহিতের বাঁধাবরাদ্দ একটা করে টাকা [illegible] বিশেষ মাসে প্রায় তিনটাকা। একটা [illegible] মাইনে হয়েছে বিরাট [illegible] সঙ্গে পুরোহিতের বাঁধাবরাদ্দটা মাসের শেষে ঠিক বাড়িই পড়ে থাকে। আমি [illegible] পুরোহিত মশাই। শাশুড়ির কাছে [illegible] ভোগ খাবেন। তাই বলেন টাকার জন্য কিছু বলেন না।

বেবু চণ্ডীকে নিতে গেল অবশ্যম্ভাবেই। বিকেলবেলা ঘরের সামনে বসে পুতুলের কাজ করছিল। হাঁ হাঁ করে বাধা দিল। ও সব ঘরে ঢুকিস না, ঘরে ঢুকিস না। চণ্ডী কাল সেরে বাইরে নিয়ে যাবে অখন। রেখে দাও।'

ভোলানাথ পাল বললেন, 'হাত বাড়ু ওটা আমার কাছে রেখে দি।'

বেবু পাড়ার ছোটদির কাজটা দিয়ে বলল, 'আমার মতো, কেন ঘরে তোমাকে

মুরগির ডিম বেশ্যা খাবে আর মুরগাকে তৈরি করে।'

'হ্যাঁ।'

বেবু একটা জানে যে মুরগাদের ডিমের ভিতর দিয়ে বড় বাচ্চারা কেউ বাস না। ভেঙে চুরে খেয়ে ফেলে। আর বাড়িতে ডিমের ভিত রাখা হয়। মুরগির ডিম কিন্তু খায় না, খেতে নেই।

বেল পাকা শেষ করে বেবু ভাল করে হাতমুখ ধুয়ে একা পুরোহিতকে থেকে। পূজো নর বাড়ি বাড়িতে আছে। খা খা চ ড ক দু'দিনের জন্য বিজয়ডী আর চণ্ডী বাইরের মন্দিরের জন্য খেতে রেখে দেওয়া হয়েছে।

চণ্ডী বেবুর মাথায় গামছা চিঠিয়ে দিল। মাথের ভিতর ঢুকে রামায়ণ বার করে আনতে গেল বেবু। তখনও বিজয়ডী কালোবাবা হাত তুলে তাদের বিচারা করে দিয়েছে রান্নার পাশ চৌকিতে। ভোলানাথ তখনও আরপার উঠছেন সকালে শেষ। কিন্তু ভোলানাথের নাকের উপর কথা সব সময় রাওয়া করতে হয়। গৌরকান্তও। রান্নাঘরটা তুলে দিল বিজয়ডী চৌকির ওপর। রাস্তা পাশে চাটু ধুয়ে বার্‌ হয়ে বসে আছেন দিদির ওপর কৃত্তিবাসী রামায়ণ খানা রেখে আসনের পড়ার কাজগাটাও পাতা খুলল। বলল, 'তুমি পড়বে তো দাদু?'

ভোলানাথ বললেন, 'না, আজ তুমিই পড় আমি শুনি। আমার চোখটা আজ বেড়েছে। এখন তুমি তো জানই পড়। নাও শুরু কর। ভোলানাথটা হবে আর? তার তো রামচন্দ্র বনবাসে বাড়ি পৌঁছে গিয়েছেন। আজ রাবণ বধ।'

বেবু বলল, 'আমি যে তোমার মত পড়তে পারি না দাদু'।

'ঠিক পারবে। গলাটা শুদ্ধ করে নাও। এবার মাইকটা আছে মনে করে পড়ার আইনটা তোলো। নাও শুরু কর।'

নমস্কারে ঘোমটা টেনে বসলেন দিদের কাছেই। অমন হাতে আছে পশম চাটার কাঁটা। গোলার পশমটা রঙ দিয়ে টুক টুক করে কাটতে কাটতে শুনতে লাগলেন বেবুর রামায়ণ পাঠ।

রামায়ণ পড়ার আগে হাত জোড় করে চোখ বুজে বিড়বিড় করে বলে বেবু আরও কতক রামায়ণের শ্লোকটি।

রামং লক্ষ্মণ পূর্বজং রঘুবরং

সীতাপতিং সুন্দরং

কাকুৎস্থং করুণার্ণবং গুণনিধিং

বিপ্রপ্রিয়ং ধার্মিকং........

এই শ্লোকটা বেবু মুখস্থ বলে। কচি গলার পরিষ্কার শুদ্ধ উচ্চারণ করে বেবু। শুনতে দুইই মিষ্টি লাগে সবারো কানে।

পড়া শুরু হতে একে একে আশপাশের বাড়ির বুড়ো বৌ'রা এসে জুটল। বিজয়ডীর পাতকির পাই, ম ম রা রাধার বোনের স্ত্রী। কেউ বসল নমস্কারের কাছে, কেউ বিজয়ডীর কাছে। বিজয়ডীও শুনছে কিন্তু তার হাতের বিরাম নেই। নরম্যী পুতুল উঠছে চাচ থেকে।

ঘণ্টাখানেক পড়া হতে খেতে পুরোহিত মশাই এলেন। নিজের আসনে বসে চুপচাপ খানিক বেবুর রামায়ণ পাঠ শুনলেন। ভোলানাথ পাল বললেন, 'আজ থাক দাদু, পুরুত ঠাকুর এসে গিয়েছেন।'

সন্ধ্যারতি আরম্ভ করলেন পুরোহিত মশাই। বেবু বসে গিয়ে কাঁসর বাজাতে লাগল। পুজো শেষ হলে চণ্ডী নকলকে শকরদীপের তাপ দিলে, প্রসাদ বিতরণ করল। যাবার সময় বেবুর মাথায় হাত দিয়ে পুরোহিত মশাই বললেন, 'পাল মশাই, বেবু এই বয়সে এমন সুন্দর শুদ্ধ উচ্চারণে রামায়ণ পড়তে শুনি আর অবাক হয়ে যাই। এ একেবারে ঈশ্বরের কৃপা। নইলে এমনটা হয় না। কত বাড়িতে তো পুজো করতে যাই কিন্তু কোথাও এইটুকু ছেলেকে এমন করে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়তে দেখি নি।'

ভোলানাথ পাল বললেন, 'আশীর্বাদ করুন যেন বেঁচে থাকে। ওর বাপের দুঃখ ঘোচাতে পারে।' তারপরে বললেন, 'ঠাকুর-মশাই, এই সরস্বতী পুজোর দিন হাতে-খড়িটা দিয়ে দিন। তখন ও পাঠে পাঠ হয়ে যাবে।'

পুরোহিত মশাই হেসে বললেন, 'ওর আর কি হাতেখড়ি দেব পালমশাই। মা সরস্বতীর আশীর্বাদ তো ও পেয়েই গেছে।'

ভোলানাথ বললেন, 'তবু নিয়মটা তো পালন করা দরকার।'

'বেশ, দিয়ে দেব', পুরোহিত বেবুর মাথাটা নেড়ে দিয়ে চলে গেলেন।

বেবুর মাথায় এখন আর চুল বড় বড় নয়। গত মাঘে বাবের চোখ তাড়িয়ে ওর পাঁচ বছর পূর্ণ হতে কর্ণবিধি পালন করা হয়েছে। মাথার চুল ন্যাড়া করে তুলে রাখা হয়েছে। তারাপীঠে মা তারার মানসিক পুজো শোধ করার দিন সেখানে গিয়ে জলে দিয়ে আসা হবে।

মাকে ছাড়া বেবুর ঘুম আসে না। মায়ের পাশে শুয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখটা গুঁজে না দিলে কিছুতেই স্বস্তি পায় না যেন। কিন্তু এই তো সবে ন'টা। সবে খাওয়া দাওয়া হোল ভাইবোনের বাচ্চার। এর পর মা বাসন মাজবে, তারপরে হয়ত আরো পুতুল তৈরি করবে। মায়ের তো রাতে দম ফেলবার কিছু থাকা নেই। বেবুর বড় মায়ের হাত বাঁধা। বড় কষ্ট লাগে বেবুর। এখন বুঝতে শিখেছে একটু একটু। চোখে দারারাত উপোস থাকলে একটা মানুষের কত কষ্ট হয়। মা তো রাতে উপোস থাকে। একটু বড় হলেই বেবু সেই তারাপীঠে মা কোথায় গিয়ে পুজো দিয়ে মায়ের হাত বাঁধা ছাড়িয়ে দিবে

আসবে। অবশ্য চণ্ডীর পাশে ওর শোবার উপায় তবে পড়ল বেণু।

'ছোটদি—' বেণু ডাকল চণ্ডীকে।

'উঃ', চণ্ডী সাড়া দিল। এখন আর চণ্ডীকে নাম ধরে ডাকে না বেণু।

'হাতেখড়ি কিরে?'

'ঠাকুরের সামনে স্লেটে খড়ি দিয়ে লিখতে হয়।'

'কি লিখতে হয়?'

'আমি কি জানি!' চণ্ডী ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল।

'তোর হাতেখড়ি হয়েছিল?'

'দূর বোকা। মেয়েদের আবার হাতেখড়ি হয় নাকি?'

বেণু ভাবল, আশ্চর্য! মেয়েদের কিছুই হয় না। হাতেখড়ি হয় না জন্মতিথি হয় না। সেদিন আষাঢ়ে বেণুর জন্মতিথি হোল। মা পারেন না রাঁধতে, তবু কি রাঁধলে। নতুন ধুতি পরিয়ে চন্দনের ফোঁটা কপালে এঁকে সাজিয়ে দিলে ছোটদি। তারপর কত রকম করে থালা সাজিয়ে খেতে দিলে তাকে! অথচ ছোটদির কখনো জন্মতিথি হয়নি। মেয়েদের নাকি হয় না।

হঠাৎ বাইরে খুব হৈ হৈ শুরু হোল। কটকট করে কি সব ফাটতে লাগল। বেমক্কা গলার আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। [illegible] বাজছে সে।

চণ্ডীর খুব কাছে সরে এসে তাকে বেড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে বেণু জিজ্ঞাসা করল, 'দিদি, কিসের শব্দ রে?'

'ও বাজনদার বাজাবাজি করছে বোধায়।'

'কিসের আওয়াজ হচ্ছে রে কটকট করে?'

চণ্ডী বলল, 'পটকা বোমা ফুটছে বোধ।' তারপর বেণুকে জাপটে জড়িয়ে ধরল সে। আরেক কানে হাতটা চাপা দিয়ে ধরে বলল, 'ভয় নেই ঘুমো তুই।'

দিদি ভয় নেই বললেও ভয় যায় না বেণুর। এ সব শুনলে খুব ভয় পায় সে। একবার মাকে জড়িয়ে ধরলে ভয়টা আর করে না। কিন্তু দিদিতো ছোট। তাই দিদির কাছে ভয়টা যায় না।

রোজ সকাল হলে পাড়ার চেহারাটা পালটে যায় আর সব তার কাছে চেনাচেনি হয়েও থাকে।

পুজোর পর বেণুর বাইরে বেরোবার হুকুম নেই। চণ্ডী তো পাঠশালা যাওয়া ছাড়া আর বেরোয় না। বারান্দাই তোমাদের পাশে ছাড়া কেউই পাড়ার পর বাড়ির বাইরে থাকে না। কালেভদ্রে কোন পুজোপার্বণ উপলক্ষে বিভাবতী মাসিমা সঙ্গে ঠাকুরদালানে গেলে বেণু সঙ্গে যায়, চণ্ডীও যায়। গলির বাইরে বেরিয়েই শিশিরদের বাড়ির সামনে বেণু দেখে বাড়ির বাচ্চা সবাই গুটিয়ে বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আর কি তাদের সাজগোজ! যুদ্ধ সাজ পাঞ্জাবী। কারো গায়ে রং। ঠিক যেন যাত্রাদলের ছবি সব। অনেক বড় বাড়ীর ছেলেরাও ওখানে থাকে। শিশিরদের বাড়ি থেকে পর পর তিন চার বাড়ি বাড়ির দরজায় অমনি ভিড়। সব মেয়েছেলেরা অমনি সেজে গুজে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ বা রোয়াকে বসে আছে। কেউ বা বিড়ি খাচ্ছে। কেউ বাটাছেলের সঙ্গে গল্প করছে।

একদিন বিভাবতীকে বেণু জিজ্ঞাসা করেছিল, 'মাগো, ওরা সব বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ক্যানো কিছু করে? কি হয়েছে ওদের?'

হাতে হাত চেপে বিভাবতী বলেছিল, 'জানি না, তোমার সবে খবর রাখতে চাই।'

'বাবে, এখন বুঝি খবর জান? এখন তো জবাব দাও দিয় পড়ে।'

বিভাবতী বিরক্ত হয়ে বলে, 'আঃ বাছা বিরক্ত কোর না বাছা। আমি কেমনাদি এটা কি ওটা কি? যাও বাবে এখন বিরক্ত করো না।'

আর কখনো জিজ্ঞাসা করেনি বেণু।

কানে হাত চাপা দিয়ে বাবুদের বেলকার ডিঙ্গার অনেক কথা সব ভাবতে পায় বেণু। ছোটদিকে জিজ্ঞাসা করে, 'হাঁরে ছোটদি, বাবুদিনিদি এ সব কি বলছে রে?'

চণ্ডী বলে, 'দিদি দিদি বলবি না তো। দিদি না হাতী। কিছি বলছে ছোটলোক লোকগুলো।'

বেণু ভাবে ছোটলোক আর ছোটলোকের কিসি করে। বড়লোকরা তা করে না।

আরো কাছে টেনে চণ্ডী ছোটভাইকে কাছে টেনে নিয়ে হাত তার কানে বেকার কথা না ঢোকে।

আট

আজ বেণুদের বাড়িতে সরস্বতী পুজো হবে। বেণুর হাতেখড়ি হবে সেই ঠাকুরের সামনে। [illegible] তোমাদের পাশে দিয়ে হাতে ছোট একটি সরস্বতী মূর্তি কিনে এনে দিয়েছেন। আমি খুব হয়েছে মূর্তিটা। তোমাদের হাতের কাজ চেয়ে দেখার মতো।

বেণু খুব সকালেই স্নান করে এসেছে মায়ের সঙ্গে গঙ্গা থেকে। যদিও সরস্বতী পুজোর সকল দেরে আজ বিভাবতীর আর তোর খাওয়া করে স্নান করার কথা বেলা চাইছে। কিন্তু বাড়িতে ঠাকুর পুজো, ছেলের হাতেখড়ি ইত্যাদির জন্য সকাল সকাল আসে [illegible] করছে বিভাবতী। [illegible] বাড়ির চেহারা যা থাকে! [illegible] মাটির পুতুল সব চারিদিকে ছড়ানো থাকে। চারিদিক আলোকিত এলোমেলো [illegible]। সাড়া আর পুজোর কাজ ছাড়া

বামদারের কোনদিকে কখন কোথায় কত পায় না কেউ।

পুরোহিত মশাই সকালে প্রথমে এলেন বেবুদের বাড়ি। পুজো শেষে বেবুকে নিয়ে বসলেন ঠাকুরের সামনে। নিজেই বানানো মোটা দুরে পরিবার উঠোনে আঁকা রেখেছে চণ্ডী। বেবু ঠাকুর মশাইয়ের পাশে বসল। পরনে নতুন রং দিয়ে ছোপানো নতুন ধোঁয়া ধুতি। একটা নতুন রঙের পাঞ্জাবি পাওয়া। ঠাকুরমশাই তার হাতে খড়িটা ধরিয়ে দিলেন, তারপর তার হাতের মুঠোটা ডান হাত দিয়ে ধরে বললেন, 'বেবুবাবু, তোমাকে আমি আজ কি শেখাবো? তুমি তো সবই লিখতে পড়তে পারো। তাহলে বর্ণমালার পড়। দ্বিতীয় ভাগের বানান শেখো।'

এই বলে বেবুর হাত ধরে অ আ ক খ লেখালেন তিনি। আধঘণ্টা হাতেখড়ির সময় পুরোহিত ঠেকেছেন অ আ ই ঈ লেখায়।

বেবু বিরক্ত হোল। বলল, 'পুরুত কাকা, কি হাত ধরে আমার ঠ্যাং ধরে ঠ্যাং শেখাচ্ছ! এসো আমি লিখছি।'

পুরোহিত মশাই হাসতে হাসতে হাত ছেড়ে দিলেন। বেবু মাটি থেকে খড়ি তুলে অ আ ক খ তো লিখলই। ইংরিজির এ বি সি ডিও লিখতে লাগল।

জোনাথন পাল চৌকিতে বসে সব দেখছিলেন। এবার হেসে বললেন, 'বাবু আর থাক। হাতেখড়ির দিন ইংরিজি লেখা দেখলে মা সরস্বতী আবার রেগে যাবেন। ক্ষী হোলো ভাল বিদ্যা! মা সরস্বতী যে খাঁটি হিন্দু মেয়ে। যাও এবার অঞ্জলি দিয়ে দাও।'

বেবু অঞ্জলি দিয়ে মা সরস্বতীকে প্রণাম সেরে পুরুতকাকাকে প্রণাম করল। তারপর বাবুর কাছে এসে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে যেই প্রণাম করেছে জোনাথন পাল তাকে দুহাতে নিয়ে টেনে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আহা আহা, এ আবার কে শেখালে? মা?'

বেবু লাজুক মুখে ঘাড় নেড়ে বলল, 'হাঁ।'

'আর?'

'কাটাইমা—'

'তা ক্যাটাইমাকে প্রণাম করেছ? যাও ওদের প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়ে এস—'

বেবুরাও ছুটে গিয়ে প্রণাম করতে পায়ের ধুলো নিলো নন্দবালার বিভাবতীর।

নন্দবালা বাড়িতে হাত দিয়ে চুমু খেয়ে বললেন, 'ওরে আমার সোনা, বেঁচে থাকো। বাপের মুখ যোচাও। লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হও।'

বিভাবতী কিছুই বলতে পারল না কারণ তখন তার দুচোখ ছাপিয়ে বান ডেকেছে। বেবুরাও মুখটাই ম্লান করে দেখতে পাচ্ছিল না সে।

সপ্ত

বিভাবতী আজকাল কোথাও বেরোতে চাইত না। সংসারের নানান কাজ আর ওপর নতুন ছেলের কাজে সময়ও পেতো না তেমন। সরস্বতীর পুজোর পরে কিছুটা অবসর মেলে। তেমন আর বড় যাতায়াত নেই কারো। সেই চৈত্র সংক্রান্তিতে হয়ত ওটা গাজনের ঠাকুর বিক্রি হবে। ঐ সময়ে কালিঘাটের পাওয়ালোও নেই। জোনাথন পালও সরস্বতী পুজোর পর বেরোন না। দুপুর পরেই দিন থেকে আসেন।

এবারে এই সময় আপনাদের বাড়ির অনঙ্গ দিদিমা এসে নন্দবালা আর বিভাবতীকে বলল কালীঘাট যাবার কথা। নন্দবালা একপায়ে রাজি। বিভাবতী প্রথমে অতটা কথা ভেবে রাজি হোল না। নন্দবালা হিসেব করে বললেন, 'কি এমন খরচ হবে বউ? টেরামের সেকেন ক্লাসে এখান থেকে কালীঘাট ট্যাকসনার টিকিটে পাঁচ পয়সা। তাহলে সব তোমাদের ছ'জনার যাওয়া দশ পয়সা। কালীঘাটে না হয় দুটো পুজো দেবে। পাঁচ পয়সার ডালাও দিতে পারো, দু'পয়সা আমারে দিতে পারো। ওখান থেকে হেঁটে হেঁটে ক্যাওড়াতলা শ্মশান থেকে আলিপুর চিড়িয়াখানা হেঁটে হেঁটে যাওয়া যাবেইটি। তারপর বড়জোর থেকে তিনপয়সা করে ছ'পয়সা দিয়ে বাড়ি আবার টেরামে। যাওয়া সব ছ'পয়সা পয়সা। তাহলে মোটমাট আটআনা পয়সা হলেই হয়ে যাবে। কদিন না কালী দর্শন হয় নি বলত! চল বউ আর আপত্তি কোর না।'

বিভাবতী সব শুনে বলল, 'বেবু আর চণ্ডী অত হাঁটতে পারবে?'

চণ্ডী শুনে একটু থাবো থাবো করে মাকে নিচু করছিল বলল, 'হাঁ মা খুব পারবো। খুব পারবো মা।'

নন্দবালা বললেন, 'তা আর পারবে না। আজ হাঁটে কাল তো বে হয়ে যাবে। কোথায় কার বাড়ি গিয়ে কোমর দুলে বাড়ি ঠেলতে হবে। ওর হয়ত আর যাওয়াই হবে না। আর বেবুকে? আমরা এ্যাতো-গুলো লোক থাকি কোলে কোলে চলে যাবে। হ্যাঁ তোমার ছেলে হালকা সোনা।'

অতএব রবিবার দেখে সকালবেলা ঘর বাড়িতে তালাচাবি দিয়ে বেরোবার উদ্যোগ হোল। শীলাও দলে জুটে গেল। প্রথমটা দলের কারো কারো আপত্তি ছিল, বিশেষ করে নন্দবালার। শীলা হাসার জোকে একেবারে 'ছুটো।' 'হাবগোবা' হলেও না হয় কথা ছিল। তাকে লোক বউ নিয়ে সঙ্গে যাওয়া! অসম্ভব। খুব কান্নাকাটি করে শীলা এসে বিভাবতীকে ধরল, 'বৌদি যেতেনি তোমাদের সঙ্গে? নইলে আমার তো যাওয়া হবে নি কখনো।'

নন্দবালা কাছেই ছিলেন। বললেন, 'ন্যাকো বাছা, তোমরা তো এ্যাকা এ্যাকা সম্ভব যেতে পারো।'

অবশেষে পিসিমাদিদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হোল পীলা যাবে। পীলার ওপর এমনিতে কেউ বিরক্ত হয়। কারো সঙ্গে সে ঝগড়া করে না। বড়ির ঝলে ঝাল দিতে গিয়ে চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। বউ দিদের ঝাল খেওয়া হয়ে গেলে তবে ঝাল খেত। সব বাড়িতেই যাতায়াত আছে, বিশেষ করে যে বাড়িতে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে।

বেবু খুব খুশি! ট্রামে বাসে চড়া তার জীবনে বিশেষ ঘটনা। যদিও ঘরে থেকেই ট্রাম বাস দেখছে জিভখুর চোখে। মা বলে তাদের ছোটবেলা ট্রাম নাকি ঘোড়ায় টানত এখন ইলেকট্রিকে চলে। আগে তাকে বেবু বাহুর সঙ্গে ট্রামে চেপে কোম্পানীর বাগানে বেড়াতে যেতে পারে। বাড় আগে, এক আধদিন বেবুকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন কোম্পানীর বাগানে, গড়ের মাঠে, কিন্তু এখন এত হাঁপানীর টান বেড়েছে ভাল করে হাঁটতেই পারেন না।

সকাল বেলাই বেরোন হোল। মাঘ মাসের শেষ দিক। সকালে খুব কুয়াশার পর পরিষ্কার রোদ উঠল। সব মহিলা। পুরুষ বলতে দলের বাচ্চা ছেলেগুলো। প্রায় জন দশেক একসাথে। ছেলেমেয়ে ছটি প্যাকেট।

ট্রাম ডিপোর অনেকটা আগে থেকে উঠল সবাই। কিন্তু ভোরে ভিড় নেই। সারা গাড়িটায় দু তিনজন বসে আছে। সবাই মহিলা আর বাচ্চা ছেলেমেয়ে দেখে গাড়িটা অনেকক্ষণ থেমে রইল। কণ্ডাক্টার এসে ধরে ওঠালে।

গাড়ি চলতে শুরু করল। বেবু জানলা দিয়ে দেখতে থাকল কোথায় বাড়ি ঘর সব করে পিছনে চলে যাচ্ছে। কি মজা লাগে না। খানিক দূর গিয়ে দেখলে ভাজাভাজি অনেকগুলো গরুর অনেকগুলো মোষের অনেক-গাড়ির আস্তাবল। তারপরেই বেবু চেঁচিয়ে উঠল, 'মা ভাখো দ্যাখো, কত অনেক গাড়ি। বাবার বাজার দল, ঐ যে ঐ যে—'

মায়ের মুখে বাবার বাজারদের অনেক গল্প শুনেছে সে। মারা যাবার আগে বাবা খুব অসুখে ছিল। সেখানে বাবা খাবিপুরের পাট ক্লাব। অনেক গল্প শুনেছে আছে। বেবুকে মা দেখিয়েছে।

নিমতলার ঘাটের ঠিক পিছনে গেল। কিন্তু লেখাপড়া জানে না তাই কোনটা যে খুব পবিত্রভূমি বলে সব তা বুঝতে পারল না।

পিসিমাদিদিরা চন্দ্রাদের কথা আলোচনা করতে লাগল। যারা তার আকৃতি দেখেছে সেই আকৃতি কত সুন্দর ছিল, চন্দ্রাদের রূপ কি রকম ছিল এই সবের আলোচনা সব। কিন্তু কানে গেল বেবুর কিছু তার মন তখন অন্যদিকে। সে দেখছে নতুন নতুন পাতা গজাচ্ছে গোলকচাঁপা। কোনখানে অশথগাছে কত রকমের রোদ। তারপর হাতিবাগান মোড়ের মোড়।

নীহারের মা বলেন 'দেখো'। ওদিকে দোকানে দোকানে আসছে বলল, 'এই রাস্তাটা ডান দিকে চলে গ্যাছে হাওড়ার পোল পর্যন্ত', তারপর বেবুকে বলল, 'ওই চাকো বেবু তোমারে কী দিবে। ওটা হোল মন্দির। ওইটেই সবচেয়ে বড় মন্দির কোলকাতায়। ওকে বলে নাখোদা মন্দির।'

'মন্দির কি মাসী?' নীহারের মাকে জিজ্ঞাসা করল বেবু।

নীহারের মা বলল, 'মন্দির হোল সে যেখানে মুসলমানরা পুজো করে।' এবার বেবু বুঝল। মসজিদ। নাখোদা মসজিদটা কি বিরাট। চূড়াটা কত বড়। আর ওগুলো কি? ওই যে লম্বা লম্বা গোল উঁচু হয়ে উঠে গ্যাছে আকাশে। জিজ্ঞাসা করল নীহারের মাকে।

'ওগুলো কি মাসী, যে লম্বা উঁচু-সারা—'

'ওগুলো হোল মিনার।'

'কি হয় ওগুলো দিয়ে?'

'কি আবার হবে।'

তারপর শুরু হোল দুধারে দোকান। সব দোকানে ঝুলো ঝুলছে। লোকগুলো কেমন অদ্ভুত। লম্বা লম্বা গোল গোল মুখ, চাপ্টা চাপ্টা নাক, ছোট ছোট চোখ। ওরা সব কারা? নীহারের মাকে জিজ্ঞাসা করে জানল ওরা চীনে। ওদের ছেলেমেয়ে কি সুন্দর। ছোট ছোট চোখ চোখে চেয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

'লালবাজার এসে গেল,' নীহারের মা দেখাল লাল রং লাল বাড়ি পুলিশের থানাটা।

'সবচেয়ে বড় থানা।'

বেবু শুনে এসেছে গাজনবাবুদের কাছে। চৌরঙ্গি পাড়ার কথা। ওখানে শুধু সাহেব মেমরা থাকে। সে দেখবে এই গাড়িতে। কিন্তু 'বিবিদি' এই চৌরঙ্গি পাড়াকেও ভয় করে না। কোথা যাবে উঃ 'বিবিদি' কি বীর চৌরঙ্গি পাড়াকেও ভয় করে না!

গাড়ি এসে থামল ধর্মতলায়। অবাক হয়ে গেল বেবু। কি সুন্দর! কত বড় রাস্তা! দুধার জুড়ে সুন্দর সুন্দর গাছ সব। কত ফুল ফুটে আছে। বড় বড় বাগানটাকে ঘেরা দিয়ে উঁচু পাঁচিল পারা। বাগানের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ও পাশে কালীঘাটের ট্রাম ধরতে হবে। এত বিশাল ফাঁকা জায়গা এত বড় চওড়া রাস্তা আগে কখনো দেখে নি বেবু। চোখ বড় বড় করে দেখছে। শুনছে নীহারের মায়ের কথা।

'এই রাস্তাটা হোল চৌরঙ্গি,' বড় বড় চওড়া রাস্তাটাকে দেখিয়ে বলল নীহারের মা। 'ঐ দিকের ওই যে সব বাড়ি সব সাহেবদের। ঐ দেখ ওই যে বড় গড়িক-

বাড়ি ওইটে সাহেবদের সবচেয়ে বড় ছবি-র দোকান। ওই যাকো দেবু, ওই যে উঁচু মত বাড়িটা ওটাকে বলে মনুমেন্ট।'

দেবুর বিস্ময়ে বাকরোধ হয়ে গেছে। সব যেন ছবির মত লাগছে। ফাঁকা সবুজ মাঠের বুকে ঐ মনুমেন্টটা যেন পাহারা-ওয়ালা। মাঠের খুঁটোগুলো যেন ওর চোখ। সব দেখছে নজর রাখছে।

'ঐ যে যেটা দেখতে পাচ্ছো ওটা লাট সাহেবের বাড়ি, তার পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা সেটা গেছে গঙ্গার ধারে সোজা। গঙ্গার ধারে সুন্দর একটা বাগান আছে তেমন বাগান বাড়ি পিসিমাদেরও নেই।'

একটা বউ জিজ্ঞেস করল, 'কিসের বাগান দিদি। আর কদ্দূর?'

মীরাদের মা বলল, 'ওই তো খালি বোধ হয়। আর কতটা। এ বাগান গঙ্গার ধারে ফুলের বাগান। বলে ইডেন গার্ডেন। তবে বাড়ি গো দেখতে কলকাতার?'

ঠাকুমারা বললেন, 'ফেরার সময় হবে দিদি। আগে চল দেখব গো মা কালীকে দর্শন করা যাক।'

অতএব আবার ট্রামে চড়া। এ রাস্তায় ট্রাম যেন হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যায়। তার দিকে যতদূর চাও তবু নতুন নতুন আর নতুন। এটা যে কলকাতা হতে পারে তা বিশ্বাস হচ্ছে না দেবুর।

চণ্ডী দেবুকে বলল, 'ভাল লাগছে না রে দেবু?' দেবু বলল, 'ভীষণ। তোর?'

চণ্ডী বলল, 'আমারও'

মীরাদের মা বলল, 'ওই যে গো ভালো দেখে যাও সব বাঁদিকে গোরার হোটেল।'

সবাই ঘুরে ঘুরে তাকায়। বিরাট বাড়ি সারা সারা। এ মোড় থেকে ও মোড়। ঝকঝক করছে যেন। খাবারের দোকানে বসে লোকগুলো খাচ্ছে যেমন রোজের চা খাচ্ছে।

তারও একটু পরে ডানদিকে দেখা গেল মহারানী ভিক্টোরিয়ার সাদা বাড়িটা। ঠিক যেন ছবি। সবুজের মধ্যে ধবধবে সাদা ঠিক যেন রাজা সেজে বসে আছে। নীল-আকাশের রোদ্দুর তার গায়ে পড়ে চোখে এসে লাগছে ঠিকরে। এক চকচকে সাদা।

মীরাদের মা বলল, 'আগাগোড়া শ্বেত পাথরের।'

এসে গেল কালীঘাট। ট্রাম থেকে নেমে অনেকটা হাঁটতে হয়। পথের দুপাশে দোকান। দেবদেবী, ফুল, ছবি মনোহারী কত কি সব জিনিসের। দলে দলে মানুষ চলেছে। কিন্তু আর ভিখারী। দেবুর মনে হোল ঠিক যেন ওদের গঙ্গাসাগরে যাবার পথটার মত। তবে পথটা চওড়া। ভিখারিরা পিছন ছাড়ে না।

গঙ্গার ধারে এল সবাই। মেয়ে পুরুষের ভিড় ঘাটে। ছোট খালের মত নদী। এই নাকি আদিগঙ্গা! কি নোংরা আর কাদা-গোলা জল। আসল গঙ্গা নাকি এটাই। হবেও বা। তবে দেবুর ভাল লাগল না। তাদের নিজেদের গঙ্গাটাই ভাল। কি চওড়া কি স্রোত কত স্টীমার কত নৌকো!

সকলে স্নান করে কাপড় ছেড়ে মন্দিরের দিকে গেল। পাণ্ডা লেগেছিল ট্রাম থেকে নামার সময় থেকেই। সে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। সেখানে হাতের জিনিসপত্র রেখে ডালা কিনে নিয়ে পাণ্ডার পিছন পিছন সকলে মন্দিরে ঢুকল। সাধ্যমত ডালা দিল সবাই। কেউ পাঁচ পয়সার কেউ দু'পাঁচ আনার। বিজয়বৌ দিলেন পাঁচ পয়সার।

মন্দিরের বড় চত্বরে আছে ছোট ছোট মন্দির। একটাতে কালভৈরব। সব মন্দিরে সবাই পুজো দিতে বলে দান করতে বলে। মূল মন্দিরের ওপর পাণ্ডার পিছন পিছন উঠল সবাই। দেবুকে কোলে তুলে নীলাও উঠল। বেশ ভিড়। ঠেলাঠেলি। সেখানে মা কালী রয়েছেন সেখানটা খুব অন্ধকার ঘর। দেবু উঁকি মেরে বিশেষ কিছু দেখতে পেল না। বিরাট কালো মুখ মস্ত বড় জিভটা চকচক করছে। দেখলে ভয় করে। চোখ বুজিয়ে দুহাত জড় করে কোন মতে প্রণাম করে ফেলল দেবু।

পাঁঠাবলি দেখতে গিয়ে বিপদ বাধাল চণ্ডী। দেবুরও খুব ভাল লাগছিল না। দিয়ে পাঁঠাটাকে যখন কসাইদের মত লোক-গুলো হাড়িকাঠে যখন ফেলছিল পাঁঠাটা ব্যা ব্যা করে পরিত্রাহি চিৎকার করতে লাগল। আর চণ্ডী হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। থর থর করে কাঁপতে লাগল। অতগুলো লোকের সামনে কেঁদে উঠতে দেখে সবাই অবাক। বিজয়বৌ তাড়াতাড়ি মেয়েকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নাটমন্দিরের সিঁড়িতে বসে পড়ল। মীরাদের মা আঁচল দিয়ে চণ্ডীর মাথায় হাওয়া করতে লাগল।

প্রচণ্ড জোরে ঢাক বেজে উঠল। পাঁঠাটা চাচাচ্ছে ব্যা ব্যা করে। কসাইদের মত লোকগুলো চিৎকার করছে মা মা করে। তারপরে একজনের হাতের মস্ত বড় ঝকঝকে খাঁড়াটা উঠল মাথার ওপর। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে 'মা মাগো' বলে খাঁড়াটা নামাল সজোরে পাঁঠাটার ঘাড়ে। পাঁঠার মুণ্ডটা ছিটকে পড়ল চার পাঁচ হাত দূরে। ধড়টাও যারা ধরেছিল টেনে ছুঁড়ে দিল বাইরে। গল গল করে কাটা গলাটা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে জায়গাটা রক্তের নদী হয়ে গেল। লোকে ছুটে গিয়ে সেই রক্ত নিয়ে কপালে টিপ পরতে লাগল। দেবু ভয়ে পালিয়ে এল একছুটে মায়ের কাছে।

একটু পরে চণ্ডী ঠিক হোল। সবাই মিলে গঙ্গার ধারে ফিরে গেল। ফেরার পথে যে যার মত মুড়ি মুড়কি জেলেপাড়া চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে নিল। যাত্রীদের কথা, খাওয়া দাওয়া মন্দিরের কাছে ছোট ছোট ঘর ভাড়া আছে। দুটো হোটেল মত ঘরে ঢুকে সবাই পেট ভরে খেল।

নীলা তাদের মতো নয় না। বেণু বলল নামবেই পথের ধারে দাঁড়ালে বৃষ্টি নিয়ে।

সমতলে এল হেডকোয়ার্টার শহরে। এখানে বেণুবাবুকে পোস্টিং হয়েছিল। তাঁর চিন্তায় ভার যদিও উঠেছে। বিজয়বতীর মনে পড়ে যে বছর বেণু জন্মালো সেই বছরই আষাঢ় মাসে বেণুবাবু মারা গেলেন। লোকে খুব কান্নাকাটি করেছিল। কত গান বেঁধেছিল। বিজয়বতীর এত মনে থাকার কথা নয় তবু মনে আছে বেণুর জন্মের বছর বলে। তাছাড়া সেদিন যখন খবর দেবার হল থেকে বাবার মরণ পেয়ে চন্দ্রনাথ সেদিন বাড়ি এসেছিল। সবার মনোযোগী বাড়ি এল মুখখানা থমথমে কালো কালো। বিজয়বতী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কি হোল গো?'

'মহানায়ক হলেন বুঝবে না। বেণুবাবু মারা গিয়েছেন। বাকিরিং থেকে একটু আগে খবর এসেছে।'

বিজয়বতী বুঝতে পারে নি এতে তাদের দুঃখটা কোথায়! বেণুবাবু তো তাদের আত্মীয়কুটুম্ব কেউ নন। তবে? তবে হাঁ। ভাল লোক ছিল। মায়াবান লোক। দশদিশি অমৃত। কেমন খেটেছে। গরীব দুঃখীদের খুব উপকার করত।

খাবার থেকে বেরিয়ে সোজা চিড়িয়াখানা। বেণু কিছুটা হাঁটল। বাকিটা নীলাদিদির কোলে চড়ে গেল। বিজয়বতী নিতে গেলে চায় না, বলে, 'দাদু না বৌদি।'

বিজয়বতী বলে, 'আপাতত দাও নি। তোমার কষ্ট হচ্ছে।'

নীলা হেসে বলল, 'এই কলকেতে ছেলেকে বইতে কষ্ট দিলো গো বৌদি! আমরা চাষার মেয়ে। এর চেয়ে অনেক ভারী বোঝা নিয়ে ক্রোশ ক্রোশ হেঁটেছি বেগে।'

বেণু হেসে এদিকটার মত সুন্দর সুন্দর বাড়ি। প্রতি বাড়িতে বাগান। কত সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ সে সব বাগানে। লাল, নীল, হলদে সাদা কত রংবেরংয়ের প্রজাপতি উড়ছে।

একগুচ্ছ লাল ফুল পথ থেকে কুড়িয়ে নিল বেণু। চমৌকে দেখাল, 'দিদি দ্যাক্ দ্যাক্ কি সুন্দর।'

নীলাদের মা বলল, ওকে বলে মোরগ-ঝুঁটি ফুল। ঠিক মুরগির মাথায় ঝুঁটির মত দেখায়।'

চিড়িয়াখানায় ঢুকে কত কত জানোয়ার! সিংহ বাঘ, কুমীর সাপ হাতী। আর কত যে পাখি!

বেণু বলল, 'হাঁ মামী ওটা ঘোড়া? এই যে গায়ে ডোরা ডোরা মাথার ওপর কালো কালো। এ কেমন ধারা ঘোড়া?'

পাশ থেকে এক ভদ্রলোক বললেন, 'ওটা ঘোড়া নয় খোকা ওকে বলে জেব্রা। আর ঐ যে লম্বা লম্বা গলা নিয়ে উঁচু গাছের ডাল থেকে পাতা খাচ্ছে ওটাকে বলে জিরাফ।'

যাই দেখুক না দেখুক বাঁদর আর হনু-মানই সবচেয়ে ভাল লাগল বেণুর। কেমন ছোলা খায় হাত থেকে নিয়ে।

ওখান থেকে বেরিয়ে রেসের মাঠের পাশ দিয়ে হাঁটা ভিক্টোরিয়ায় এল। বেণুর আবার 'খানিক হাঁটা খানিক বিজয়বতী খানিক নীলার কোলে চড়া। সবাই খুব খুব ক্লান্ত হচ্ছে। নীলা কেমন বেণুকেই নিচ্ছে না আমাকেও কোলে নিচ্ছে। আজ অত বাচ্চাদের। তাহলে এটা শীতকাল বইলে এত হাঁটা কঠিন হোত।

ভেতরটা কিন্তু হাঁটতে খুব ভাল লাগছে। একে বলে মাঠি সবুজ মাঠ। যতদূর চাও সবুজ সবুজ আর সবুজ। বহুদূরে সেই মনুমেন্ট দেখা যাচ্ছে। বাগানের কি বাহার! যেন ছোটবেলার মত। বাগানটাও কি পরিষ্কার। যতদূর নজর দেখা যায়। মাঠে মাঠে ঘাসে লোকেরা দল বেঁধে বসছে। সারা মাঠখানা জুড়ে মানুষ পড়ে।

বস্তির সেই গোলমালের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এ এক অন্য নতুন জগৎ বেণুর কাছে ধরা দিল। যেখানে দুর্গন্ধ নেই, নোংরা নেই, কাদা নর্দমা নেই ছোট ছোট খুপরি ঘরে একগাদা করে লোক নেই। যেখানে আছে সবুজ মাঠ উদার আকাশ পাখির ঝাঁক গাছে গাছে ফুল। কেমন মিষ্টি হাওয়া। বেণু সবটা বুঝল না কেন এমন হোল এ জগতে কিসের জন্য কিন্তু ব্যাপারটা মনে গেঁথে রইল! যার যার মনে হোল হ্যাঁ, সে যদি রোজ এইখানে ছুটোছুটি করে বেড়াতে পারত, তবে বাবাকে পাড়ার ভিড় ছেড়ে কোলাজই ঘাসের বুকে নীল মস্ত আকাশটার দিকে তাকিয়ে থাকত বেশ হোত। কেমন পাখি ওড়া দেখত। ঐ যে কেমন ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাচ্ছে ঠিক যেন ইংরিজি বই-এর কি অক্ষরটার মত।

ভিক্টোরিয়া হলের ভিতরে কেউ ঢুকল না তবে সকলেরই 'মহা ধুমাইটি'তে যাবার ইচ্ছে। কিন্তু বেণুর খুব ইচ্ছে করছিল অক্টারলোনিতে উঠতে দেখবার। এমন একটা সেই পাহাড়ের মতন লম্বা বাড়ি যার দিকে তাকালে চোখে ধাঁধা লাগে তার মুন্ডু মাথা পাহাড়ের ওপর ছুটোছুটি করে বেড়াতে ইচ্ছে করছিল তার। আর বাগানটা। লাল নীল হলদে ফুলগুলো! কত গাছ। কি চমৎকার সবুজ ঘাসে। সারাটা রোজ থাক মহা ধুমাইটি থাকা। এই চমৎকার জায়গায় যদি সময়টা কাটিয়ে দিয়ে গেলেই তো হয়।

সব কিছুকে ছাড়িয়ে দিয়ে ওরা এল মহা ধুমাইটিতে। কারোরই ভাল লাগল না। বিশাল বলে বড় বাড়ি। কত যে বড় আর কত যে উঁচু তার ঠিক ঠিকানা নেই। ভেতরে ঢুকলে গা ছমছম করে।

এক একটা ঘর যেন মস্ত বড় পাহাড়ের মত। যেমন বড় তেমনি উঁচু। মাথা তুলে দেখতে গেলে ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়। বড় বড় পাথরের দেওয়াল। তাতে সব পাথরের মূর্তি, পাথরের টুকরো, বড় বড় জীব জন্তুর কঙ্কাল, ছবি, পুরোনো আমলের জামাকাপড় আরও কত কি যে আছে। সবকিছুই পুরোনো পুরোনো গন্ধ।

বেণুর বিচ্ছিরি লাগল। একটা জন্তুর কঙ্কাল দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে এল মায়ের কাছে।

বড় মূর্তিটির বাড়ির মতন বড় ঘুরে ঘুরে উঁচু উঁচু সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করে সবাই যখন বারান্দার টেবিলে বসে এসে দাঁড়াল তখন সবাই এত পরিশ্রান্ত যে কেউই আর 'ইয়েস ম্যাডাম' বলতে যাবার কথা উচ্চারণই করল না। সবাই হাঁপ ছাড়তে ছাড়তে ধুপ করে উঠে পড়ল।

ট্রাম বাসের সবাইকে বড় বড় ঠাসা নয়। অফিস ছুটি হয়েছে তাই বাড়িমুখো লোকজন কলকাতা যাচ্ছে, তবু একটু সবাই কোনো রকমে উঠে বসার জায়গা পেয়ে গেল।

চন্দ্রা একসময় বেণুকে বলল, 'আমি আর পারছি না। এই জানলাগুলো কেটে কেটে যাচ্ছে ভাই—বাপরে—'

ট্রামের জানলা দিয়ে বাকিটা দুধ কেমন চন্দ্রা।

দশ

বেণু বাইরের জগতের পরিধি এখন আরো একটু বিস্তৃত হোল। কলকাতার বাইরে। আলিপুর বিদিরপুর ভবানীপুর নয়। বারাসাত। বড় এক ভুবনেশ্বরীর মাসী গোবিন্দ মাস্টার। একেবারে মফঃস্বল পাড়াগাঁ। কে যাবে? বিভাবতীর যাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। যেতে পারে ভুবনেশ্বরীর মামাদের কেউ। কিন্তু তখন মামার অফিস আর কোর্টকাছারিতে কিছু বলাও যা না বলাও তা। আগে সে বহু বছরে বেড়ে এখন তার মতো বড় কেউ বেশ হয়েছে বোধহয়। সারাদিন বুঁদ হয়ে বসে থাকে। কিছু জিজ্ঞাসা করলে জবাব পায় না। চোখ বুঁজিয়ে মুচকি মুচকি হাসে।

অতএব একদিন ভোরবেলায় শালাই বাবলা শাখায় সব বেলা দুটো নাগাদ বললেন বেণুকে, 'চল বাছু, মেজদাদা-বাবুকে একটু দেখে আসা যাক।'

মেজদাদাবাবু লোকটা বেণুর ঠিক মনের মত নয়। অদ্ভুত লোক। খুব রোগা রোগা। লম্বাচওড়া সাদা কোট পরা। মাথায় সামনে টাক। মাথার ওপর দিকে কুচিটা বেরিয়ে থাকে। বেণুর সঙ্গে চমৎকার করে কথা বলেন বার বিশেক কিন্তু বেণুর বোধগম্য হয় না। সে মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবখানা এই যে বাবাবাবুর প্রশ্ন করলেই শেষ হবে সে পালিয়ে বাঁচবে। গোবিন্দ প্রায়ই বড়বাজারে কাজ করে, যাকে বলে দুপুরের দিকে চলে আসে গঙ্গাবাড়ি। রিক্সাওয়ালা পথঘাট চেনে ওঠে। মামী বিমান শহরের ভরাইকে কি দিয়ে খাতির করবে ভেবে পায় না। কিন্তু গোবিন্দ খাতিরের ব্যবস্থা আগে করে নিয়েই আসে। এক হাতে থাকে একটা মুখবাঁধা হাঁড়ি হাঁড়ি বাড়ে নবীন ময়রার বড় বড় রসগোল্লা হয়তো বা ঠোঙা, যাকে বলবাজারের দিকে আমা মুদের মাল আর অন্য হাতে একটা বই কিংবা কাগজ থাকে। বইখানাও হবে ইংলিশ। বেণু তখনি কাছ থেকে মেজদাদাবাবুকে। লোকটা নিজেও থেকে জামসাপ্টে লোককে খাওয়াতেন।

কিন্তু মেজদিদিকে সব সময় ভাল লাগে বেণুর। যখনি আসে; যে মুহূর্তে পা দায় এ বাড়িতে সে মুহূর্ত থেকে আবার চলে যাওয়া পর্যন্ত বেণু সব সময় মেজদির। খাওয়ানো দাওয়ানো ঘুম পাড়ানো গল্প বলা আবদার কি খুব কি যে সব নাপ জাহাজ জাহাজ পাড়া পাইলে মেজদির। সাতে সব সময় গুনগুন করে এমন সুন্দর গল্প বলে মেজদি। 'রাজপুত্তুর আর নীলকমল' গল্প নয়। সত্যিকারের সব গল্প। টাইটানিক জাহাজ ডুবির গল্প! উঃ কি ভীষণ! অতবড় জাহাজ কোটি কোটি টাকা খরচ করে তৈরি হল। সবাই ভেবেছিল সে জাহাজ কোনদিন ডুববে না। কিন্তু সেই জাহাজই একদিন ডুবে গেল। আর কাসাবিয়াঙ্কার গল্প। জলন্ত জাহাজের ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজ পুড়ে যাচ্ছে, তাকে সাবে আগুন লাগল বলে, কিন্তু কাসাবিয়াঙ্কা যেতে পারছে না কোথাও জাহাজ ছেড়ে! কারণ জাহাজের ক্যাপ্টেন তার বাবা তাকে বলে দিয়েছেন জাহাজের সেই ডেক ছেড়ে তিনি না ফেরা পর্যন্ত সে যেন কোথাও না যায়। কি পিতৃভক্ত ছেলে। রামচন্দ্রের চেয়ে বেশি।

মেজদির কাছেই সে জেনেছে পৃথিবীটা কমলা লেবুর মত গোল। সূর্যটা ঘোরে না, পৃথিবীটাই ঘোরে, তাইতেই দিনরাত হয়। সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তাহলে মেজদি আমরা পৃথিবী থেকে তো ছিটকে পড়ে যাব।'

মেজদি বলেছিল, 'না, পৃথিবীটা এতবড় আর আমরা এত ছোট যে বুঝতেই পারছি না পৃথিবীটা ঘুরছে বলে। তুই যদি একটা পিঁপড়েকে আমার গায়ে রেখে আমাকে ঘুরিয়ে থাকিস দেখবি পিঁপড়েটা পড়ছে না।'

বেণু সবটা বুঝতে পারে নি। কিন্তু মেজদির মুখে এসব গল্প শুনতে ভারি ভাল লাগে। সাত সমুদ্দুর মেজদি কথা বলে।

বেণু জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি এত শিখলে কোথায় মেজদি?'

ভুবনেশ্বরী বলে, 'তোর বাবাবাবুর কাছে।'

বেনু বলে, 'দাদাবাবু খুব লেখাপড়া জানে? না বেনুদি?'

ভূবনেশ্বরী বলে, 'বোসেদের কাছ থেকে যেটুকু সময় পায় বই পড়ে। পড়া রেখে।'

'পড়া? কি পড়া দিদি, আমি দেখব, দাদাবাবু?'

'তুই বড় হ বেনুদি, এখন বুঝতে পারবি না।'

মেজদিদিকে দেখলেই বা কি চমৎকার! মায়ের ঘরে একটা লক্ষ্মী প্রতিমার ছবি আছে ঠিক তার মত। সন্ধ্যা পরে যখন মেজদি ঘড়াখানি নেয়ে এসে এখানে ঢোকে মনে হয় যেন ঠিক সেই ছবিটা থেকে মা লক্ষ্মী নেমে এল। বেনুর মা অবশ্য বলে তার বড় মেয়ে নাকি মেজমেয়ের চেয়েও দেখতে ভাল। বড়দিকে দেখার সুযোগই হয়নি। বিনুদির আগে বিয়েকনের মত এসেছিল। বেশ লম্বা। চোখমুখও বেশ বড়বড়। টিকলো টিকলো নাক। কিন্তু তার মেজদির মত অত ফর্সা তো নয়। তাকে কোলে নিয়ে বার বার চুমু খেয়ে বুকে চেপে চেপে ধরে আদর করেছিল।

বেনুর মা অবশ্য বার বার করে বড় মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কি হয়েছে তোর বল। তোর কি অসুখ বিসুখ করেছে?'

ঘাড় নেড়েছিল রোহিণী, 'না তো—'

'তবে তোর চেহারা এমন কালীবর্ণ হোল কি করে?'

রোহিণী কিছু বলে নি। ঠিক সেই সময় মায়ের দিকে পিছু ফিরে বেনুর গালে গাল চেপে ধরেছিল। একটু পরে বেনুর গালে গরম জল পড়তে সে মুখ তুলে অবাক হয়ে দেখেছিল বড়দি কাঁদছে। কিন্তু মা দেখতে পায়নি। বড়দি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে চোখ মুছে নিয়ে বলেছিল, 'বাবাঃ! আগুনের ধোঁয়া এখানে, চোখ কিরকির করে।'

বড়দির বাড়ি কেউ যায় না। বড় জামাইবাবুকে কখনো দেখে নি বেনু। শুনেছিল বড়জামাইবাবু [illegible] করে।

হারাণদাই বেনুকে বাসে চাপিয়ে নিয়ে গেল ধু ধু মাঠ পেরিয়ে। বাসস্ট্যান্ডের কাছটা থেকে গোলচটা পেরোলেই কলকাতা যেন ফুরিয়ে গেল। কেমন যেন ফাঁকাফাঁকা। ফাঁকাফাঁকা। কত নারকেল গাছ। পুকুর। পুকুরে দু একটা ছেলে সাঁতার কাটছে। চরছে হাঁস। প্যাঁক প্যাঁক করে ডাকছে তারা। বড় বড় বাগান। হারাণদাই একটা পাঁচিলওলা বাড়ি দেখিয়ে বললেন, 'জানো এটা হচ্ছে একটা রাজবাড়ি।'

'কোন রাজার বাড়ি দাদু?' বেনু জিজ্ঞাসা করল।

'নাটকপাড়ার রাজার।'

ধুলোভরা স্টেশনের কাছে দু সারি মনোহারি দোকান। খোলার চাল অথবা টিনের চালের ঘর। দোকানে দোকানে ঝুলছে কি বড় বড় জেলিপেলি। লাল লাল গোলা যেন! ধুলোভরা জেলিপেলি নাকি কেকবিস্কুট। যেমন বাগবাজারের রসগোল্লা। একটা মাটির হাঁড়িতে এক হাঁড়ি জেলিপেলি কিনলেন হারাণদাই। আট আনা সের। বললেন, খুব সস্তা দাম। কেষ্টনগরে নাকি চার পাঁচ আনা সের।

উঁচু সিঁড়ি দিয়ে উঠে ধুলোভরা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। দু'চারটে লোক বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে বসে। ওই উঁচুতে উঠে সেখান থেকে চারপাশটা দেখতে কি ভালই লাগছে বেনুর। মাঠ, বন, গাছপালা দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। রেল লাইনটা সোজা বহুদূর চলে গিয়ে যেন একটা বিন্দুতে মিলেছে যেখানে আকাশটাও নেমে মাঠের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

ট্রেন এল বারাসাতের। লাল লাল কামরাগুলোর রং। বড় ইঞ্জিনটা উঁচু উঁচু করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটা গদিওলা কামরা দেখিয়ে হারাণদাইকে বেনু বলল, 'দাদু, এটায় চড় না, বেশ আরাম গদি আছে।'

'না না, ওটায় অনেক ভাড়া। ওটা সেকেন্ড ক্লাস। আমাদের টিকিট থার্ড ক্লাসের। এই আলো এই যে বিলটে থাকি।'

বেনু দেখল কামরার দরজার পাশে ইংরিজি একেবারে বড় লেখা। কামরাটা চাকাই। তারা দু'জনা আর ঢোকে জায়গা পেল। হারাণদাই তাকে একটা জানলার ধারে বসিয়ে দিয়ে পাশে বসলেন।

এই যে প্রথম রেলগাড়ি দেখল বেনু তা নয়। [illegible] প্রায় প্রত্যহ [illegible] দেখেই রেখেছে। শহরের ভেতর হরদম [illegible] রেলগাড়ি চলতে দেখেছে। অবশ্য উঠিনি আগে কখনো। [illegible] রেলগাড়ি প্রথম দেখল সে। [illegible] বাইরে [illegible] দিকে জানলা দিয়ে [illegible] আর [illegible] কামরার গায়ে [illegible] লেখা—'নিজের জিনিস নিজে সাবধানে রাখবেন। চোর ছ্যাঁচোড় ও পকেটমার নিকটেই আছে।'

আস্তে আস্তে দাদুকে জিজ্ঞেস করল বেনু, 'তাই নাকি দাদু?'

কোনাবাবু বললেন, 'কি?'

'এখানে চোর ছ্যাঁচোড় পকেটমার আছে? ঐ যে লেখা।'

দাদু হাসলেন মৃদু মৃদু। আগে বললেন নারানের অক্ষরগুলি শুনতে পেয়েছিলেন বেনুর কথা, বললেন, 'হাঁ, থাকতে তো পারেই। এই যে তুমি, তুমি যে জানলা

ফেলে তোর বুড়োটার পকেটমার বলে ভাববো কি করে? এঁ্যা—'

বেণুর জীবন বার হয়ে গেল। কি অসভ্য লোকটা! আমাকে বলছে চোর বুড়োটার পকেটমার! লোকটা যেমন দেখতে তেমনি কথাবার্তা। আবার পান খেয়ে কেমন দেখাচ্ছে? লাল লাল দাঁত। মন খেয়ে গায়ের রং বেরোচ্ছে। লোকটা আবার বলল, 'তুমি দেখছি এই বয়সে বেশ পকেট পারো। বড় হলে তোমার কী!'

ভোলানাথ বললেন, 'চল এখনো পূর্ণ হয়নি।

'তাই নাকি? হাঃ হাঃ কি নাম তোমার?'

নাম বলার দরকার হয় নাকি। বিশ্রী লোকটা, নাম শুনতে চাচ্ছে বেণু! জানলা দিয়ে চেয়ে রইল।

ভোলানাথ বললেন, 'বল নাম বল তোমার।'

তখন লোকটাকে 'বেণু' বলে আর কিছু বলল না সে। লোকটি তখন ঠাকুরের নাম জিজ্ঞাসা করছে। বেণু জানে ঠাকুরের নাম কেউ জিজ্ঞাসা করলে বাবার নাম বলতে হয় কিন্তু সে আর মুখ খুলল না। তখন লোকটা ভোলানাথ বাবুর সঙ্গে আলাপ করতে লাগল।

বেণু বাইরের দৃশ্য দেখছে। যা দেখছে সব ভাল লাগছে সব নতুন নতুন মনে হচ্ছে। মাঠ, গাছপালা, টেলিগ্রাফের লাইন তার উপর বসে কি সব পাখি, ঠোঁটে ঘা। বউ কি ছেলেমেয়ে কাজ করতে করতে থেমে গিয়ে রেলগাড়ি দেখছে।

বেণু দাদামশাইকে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদু বাড়িগুলো ছুটে পালাচ্ছে ক্যানো?'

বাড়ি পালানো শুনে সকলেই হেসে উঠলেন।

ভোলানাথ-জিজ্ঞাসা করলেন, 'পালাচ্ছে নাকি? তাইতো?'

'হ্যাঁ, ঐ তো ভাগছে।'

'ঠিক উল্টো। পালাচ্ছি আমরা, মনে হচ্ছে বাড়ি পালাচ্ছে। আমরা খুব জোরে সামনের দিকে ছুটে চলেছি কিনা! বাড়িগুলো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে'।

এবার বেণু বলল, 'তাই নাকি? আশ্চর্য ব্যাপার।'

ব্যারাকপুর স্টেশনে যখন বিকেল বেলা। স্টেশনটা ফাঁকা ফাঁকা। দু'চারজন লোক। স্টেশনের কাছে গোটাকতক দোকান। বেশির ভাগই খাবারের। তারা চিৎকার করে খদ্দের ডাকছে। 'আসুন বাবু আসুন। গরম সিঙাড়া, কচুরি আসুন—'

স্টেশনের সামনে কোন ভাড়াটে গাড়ি নেই। একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল যাবে না তার ভাড়া আছে।

ভোলানাথ বললেন, 'চল দাদু হেঁটেই যাওয়া যাক। কাছেই তো পথ।'

পথ চলতে চলতে ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকে নাম জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিতে লজ্জা পাও ক্যানো? নাম জিজ্ঞাসা করলে পুরো নামটা বলবে না?'

বেণু বলল, 'বলি তো। ও লোকটাকে উত্তর দিতে ইচ্ছে করছিল না।'

'সে কি? ক্যানো?'

'লোকটা ভালো না। খালি খালি পান খায়। লাল লাল দাঁত। ইচ্ছে করছিল না ওর সঙ্গে কথা বলতে।'

স্টেশন থেকে গুহদের বাগানবাড়ি সোজা রাস্তা। ধূলো নেই আর পথটিও মনোরম। পথে লোকজনও খুব কম। চৈত্রমাসের প্রথমদিক। মাঝে মাঝে সুন্দর একটা হাওয়া বইছে। আহা কি মিষ্টি লাগছে বেণুর। কি পাখি ডাকছে চারিদিক! কোথায় যেন একটা কোকিল ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কোকিলও কু কু করে তার উত্তর দিল।

পথের দুদিকে বড় বড় গাছ। পাতায় ছেয়ে আছে মাথার ওপরটা।

'এটা কি গাছ দাদু? এত্তো বোঁটা এত্তো ফুল!'

'শিরীষ'।

'এটা?'

'মেহগিনি।'

এমনি করে আম জাম কেমন কাঁঠাল গাছ চেনা হোল। শিমুল গাছের মাথাটা বড় বড় লাল লাল ফুলে ঢেকে আছে। কি একটা পাখি ডেকে উঠল। যেন কথা বলার মত কিছু বলছে খুব জোরে।

ভোলানাথ বললেন, 'কি বলছে বল তো পাখিটা?'

'জানি না।'

ভোলানাথ বললেন, 'ভাল করে শোন পাখিটা বলছে বউ কথা কও।'

বেণু কান খাড়া করে শুনল, আরে সত্যিই তো! পাখিটা বলছে বউ কথা কও, বউ কথা কও।

রাস্তার দুপাশে খুব ফাঁকায় ফাঁকায় দু'একটা কোঠা বাড়ি। বেশিটাই বাগান। ফলের বাগান। অনেক কলাগাছ একটা বাগানে।

'এখানে গ্যাস নেই দাদু?' বেণু প্রশ্ন করল।

'না, ঐ যে দেখতে পাচ্ছো ঐ তো আলোর থাম।'

'ও আবার কেমন আলো। কি করে জ্বলে?'

'কেরোসিনে।'

এবার বেণু বলল, 'ইলেকট্রিক? ইলেকট্রিকও নেই বুঝি?'

'না। এটা পাড়াগাঁ কিনা।'

রাস্তার বাঁ দিকে বড় বড় বাড়ি। তার পরে খেলার মাঠ।

দাদু নাতিকে দেখালেন, গভর্নমেন্ট স্কুল, খেলার মাঠ। পুকুর। বেণু বলল,

'খুব ভালো। কত বড় বাড়ি বাবা!'

ভোলানাথ বললেন, 'এই ইস্কুলে পড়বে?'

'কি করে?'

'তাহলে হেডমাস্টারমশাইকে বলব এখানে তোমায় ভর্তি করে নেবে'

'তার কাছে থাকবো?' বেনু দাদুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'জেঠিমার কাছে।'

'আর মা?'

'মা তো কোলকাতায় থাকবে। ছোট-দিকে নিয়ে। নইলে কলকাতার বাড়িটা দেখবে কে?'

'তাহলে থাকবো না আমি।' জেঠি-দিকে বেনু খুবই পছন্দ করে কিন্তু মাকে ছেড়ে শুধু জেঠিমার কাছে থাকা যায়? অসম্ভব ব্যাপার তার কাছে।

কুসুমেশ্বরী হাকা খুলে হাতপা ধুয়ে। হেডমাস্টার গোবিন্দ উঁচু দাওয়ার মাদুরে বসে আছে। পা দুটো সামনে ছড়ানো। খুবই খুশি আছে।

গোবিন্দ এসে বসেই অভ্যর্থনা করল, 'আসুন আসুন। ভাগ্যিস অসুখ হয়েছিল তাই দুজন অতিথির পদার্পণ ঘটলো আমার বাড়িতে।'

ভোলানাথ কুসুমেশ্বরীর এগিয়ে দেওয়া মোড়াটায় বসতে বসতে বললেন, 'তা তো ঘটলো। কিন্তু তোমার পায়া যে ভীষণ ভারি হয়েছে দেখছি।'

কুসুমেশ্বরী হাতপাখাটিকে হাতে পাখার বাতাস করতে শুরু করেছে। গোবিন্দ বলল, 'কতদিন পরে আজই প্রথম বাইরে এসে বসেছি। অভ্যেসও নেই। কদিন যা গ্যালো।'

খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। বাড়ির ঝি কুসুমকে বলল, 'যা ছিকি নিতাই ঘোষের দোকান থেকে খোকা আর দিদি মিলিয়ে দুটোঙার নিয়ে আয় আবার যাব করে। আমার মনে হচ্ছে বললি যেন হলের দুধ দিতে যায় এখুনি আর কেউকে বলবি মধুকে বলতে যেন কাল সকালে কাল ভোরে একটা বড় দেখে মাছ ধরে দিয়ে যায়।'

কুসুম চলে গেল।

ভোলানাথ বললেন, 'তুমি আবার ব্যস্ত হচ্ছো কেন? আমরা তোমার অসুখ শুনে দেখতে এসেছি। কুটুম্বিতে করতে আসি নি। এটা কি কুটুম্বিতে করার সময়?'

গোবিন্দ হেসে বললে, 'আপনি একা এলে কথা ছিল না। এনেছেন যে নতুন কুটুম-টিকে সঙ্গে করে। কুটুম্বিতে না করলে শালা কলকাতায় গিয়ে বলবে গোবিন্দ ব্যাটা হাড়কঞ্জুস! তাই না নতুন কুটুম।'

গোবিন্দর নতুন কুটুম তখন তার জেঠিমার পিছনে লুকিয়েছে।

বেনু জেঠিমার বাড়ি দেখে অবাক। উঁচু পাঁচিল ঘেরা বাড়ি। পরিষ্কার ঝকঝক তকতক করছে। সামনে চারটে বড় বড় ঘর। ডানদিকে দুটো ঘর। বারান্দা। একটা উঠোন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বাঁদিকে খানিকটা দূরে আর একটা সিঁড়ি এবং খুপরি ঘর। ছোট ছোট। তার পাশে ছোট একটা পাঁচিলে ঘর ঘর করে ঘেরা পাইখানা। একটা খুব উঁচু পাড় বাঁধানো কুয়ো। তার পাশে কপিকল বাঁধানো। দড়ি বালতি ঝুলছে। আরও পাশে টিনের চাল দেওয়া ঘর। সেখানে গোরু গো-য়ালের। এতগুলো ঘর কি হয়! ভাবতে থাকে বেনু।

সন্ধ্যে হবে না হবে চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে এল। বাড়ির সামনে বড় ঝাঁকড়া শিরীষ গাছের পাতায় অসংখ্য কি যেন আলোর মত চিক চিক করে জ্বলছে।

বেনু দাদামশাইকে জিজ্ঞাসা করল, 'ও কি দাদু! ওই যে চিকচিক করে জ্বলছে।'

দাদুর বলার আগে হেডমাস্টারমশাই বলল, 'তুমিই বলো কি।'

বেনু বলল, 'জানিনা।'

'শহরের গলিতে আটকে কি জানা যায়,' গোবিন্দ রসিকতা করে বলল, 'ওগুলো সব হীরের কুচি। আমাদের গাছে ছড়িয়ে রেখেছি।'

'সব হীরে?' বেনুর চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে 'সে তো অনেক দাম!'

ভোলানাথ বললেন, 'তোমার হেড-মাস্টারের সব বাজেকথা যে!'

দাদুর মুখে হাসি দেখে বেনু বুঝল সব ঠাট্টা।

এবার গোবিন্দ বলল, 'ওকে বলে জোনাকি। এক রকমের পোকা।'

'আগুনের পোকা নাকি? ধরলে হাত পুড়ে যায়?'

গোবিন্দ বলল, 'না সেরকমের পোকা নয়। এগুলো ছোট ছোট একরকমের পোকা যাদের পেটে ভগবান আলোর এক-রকম জিনিস রেখে দিয়েছেন হাওয়া লাগলেই জ্বলে ওঠে।'

গোবিন্দ যে কথা বলার তা খুব ভালো করে বলার অভ্যেস তোতাবোল আছেন। বাবলার ডালে সে প্রায়ই ছোট ছোট ঝাঁক পড়ত। বড় গাছ ছেড়ে নাকি সে গাছ বলি-ছেড়ে। গোবিন্দ হেসে বলল, 'তাকো বাবুই পাখিরা ওই পোকা নিয়ে গিয়ে তাদের বাসায় আলো জ্বালে।'

বাবুই পাখি কি রকম তা জানে না বেনু। জীবনে দ্যাখেনি তবে বাবুই পাখি যে সুন্দর বাসা তৈরি করতে পারে তা দাদুর কাছে শুনেছে। তাছাড়া একটা কবিতাও পড়েছে ছোটদের বইয়ে, বাবুই পাখিরে ডাকি কহিল চড়াই / কুঁড়েঘরে থাকি কর শিল্পের বড়াই।

সে বলল, 'বাবুই পাখি? যারা খুব সুন্দর বাসা তৈরি করে?'

'হ্যা রেখেছ তুমি?'

'না রাঁধতে পড়েছি।'

চারিদিক ধবধবে বিকেল আর অন্ধকার। বারান্দায় হারিকেনের আলোতে বেঁটে আলো হয়েছে তাতে বাড়িটা যেন বেশি অন্ধকার লাগছে। ভোলানাথবাবু আর দাদামশাই গল্প করতে লাগলেন। বেণু রান্নাঘরে কৃষ্ণবেণীর কাছে গেল।

কৃষ্ণবেণী একমনেই রান্না করছে। ঝি খাবার এনে দিয়ে সন্ধ্যার আগেই চলে গেছে। উনুনের আগুনের আঁচে কৃষ্ণবেণীর গাল দুটো লাল দেখাচ্ছে। বেণুদি কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কৃষ্ণবেণী মুখ ফিরিয়ে হাসিতে ভেসে বলল, 'কিরে চলে এলি যে!'

বেণু বলল, 'ভালো লাগছে না বাইরে। বড্ড অন্ধকার।'

তারপর বেণুদি খুব কাছে বসে পড়ে বলল, 'বেণুদি এখানে তোমার ভয় করে না একা একা?'

কৃষ্ণবেণী বলে 'করে।'

'তাহলে থাকো কি করে?'

'কি করব বল? এটা আমার শ্বশুর-বাড়ি। এখানেই তো থাকতে হবে আমায়।' কৃষ্ণবেণী একটা ছোট নিঃশ্বাস চাপল। তারপর বলল, 'তবে তোর দাদাবাবু যখন থাকে তখন ভয় করে না। তাছাড়া তোর দাদাবাবুর একটা বন্দুক আছে তো।'

'বন্দুক! শিকারের বন্দুক?' চোখ বড় বড় করে বলল বেণু।

'শিকারের মতো শিকারের?' একটু হাসল কৃষ্ণবেণী। তারপর বলল, 'আমিও বন্দুক ছুঁড়তে পারি।'

'যেৎ!' বেণুর বিশ্বাস হোল না।

'যেৎ বল যে। সত্যি। আচ্ছা কাল সকালে ছুঁড়ে দেখাবো তোকে তাহলে বিশ্বাস হবে তোর? তোর দাদাবাবু শিখিয়েছে আমায় ছুঁড়তে।' বেণুর কিছুতেই বিশ্বাস হোল না। কৃষ্ণবেণীর হাতে বন্দুক যেমন অদ্ভুত তার বেণুদির হাতে বন্দুক যেমনি অদ্ভুত বলেই মনে হোল তার।

রাতে তারা তিনজন খেতে বসে গল্প করতে লাগল। একসময় গোবিন্দ বেণুকে বিপ্লবীদের গল্প শোনাল। ক্ষুদিরামের ফাঁসির গল্প। বেণুর খুব ভাল লাগল। বিশেষ সে সেই গানটা শুনেছে যেটা তাদের পাড়ার বাউল নিধিরাম বুড়ো বাবা প্রায়ই গায়। শুনতে শুনতে বেণুর কান্না পায়—'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি / অভিরামের দ্বীপচালান মা ক্ষুদিরামের ফাঁসি।'

বলাবাবার গলায় কি মিষ্টি সুর। গাইতে গাইতে কেঁদে ফেলে মাঝে মাঝে। বেণুদের বাড়িতে যখন ভিক্ষে নিতে আসে বেণু বাড়ি থাকলে সেই গানটা তাকে গাইতেই হয়। বেণু ছাড়ে না।

একটু বাদে বেণু গল্পের মধ্যে থেকে ঘুমিয়ে পড়ে গেল। গোবিন্দ ভোলানাথ দুজনেই কথায় অন্তরঙ্গ হয়ে পড়ল।

গোবিন্দ বলল, 'দাদামশাই, আপনি তো জানেন আমি জেলখেটে এসেছি। এক লড়াই করে গেছি।'

ভোলানাথ বললেন, 'তা তো জানি ভাই। তোমার বন্ধু বিমলকৃষ্ণর মুখে আমি সব শুনেছি।'

'হ্যাঁ। খুব খারাপ অবস্থা থেকে এই বাড়ি ব্যবসা সব গড়ে তুলেছি একা হাতে।'

ভোলানাথ একটু অবাক হলেন। গোবিন্দর একথার উদ্দেশ্য তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। গোবিন্দ বলে চলল, 'একা এখানে এই নির্বান্ধবপুরে থাকি। হাটবার ছাড়া এখানে লোকের মুখ দেখা যায় না। আশপাশে কোন বেরোবার পথও নেই। দু দুবার ডাকাতির চেষ্টা হয়ে গেছে।'

ভোলানাথ এটা জানতেন না। কৃষ্ণবেণীর কথা মনে পড়ল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা কখনো কখনো সারাদিন একা থাকে বাড়িতে। বললেন, 'এটা তো ভালো না। কবে হোল?'

'সে বিশেষ কিছুদিন আগে। তাই বন্দুকের লাইসেন্স করিয়েছি।'

আস্তে আস্তে বললেন ভোলানাথ, 'তোমার সাহস আছে ভাই। একা একা এইখানে থাকা!'

গোবিন্দ বলল, 'ছিল একদিন। কিন্তু এবারের এই অসুখে ভয় পেয়েছি।'

ভোলানাথ শান্ত বললেন, 'না না, এতে ভয় পাবার কি আছে! ও সব আর না হয়!'

একটু চুপ করে থেকে গোবিন্দ বলল, 'এটা আমার বাঁচার সময় নয় দাদামশাই। কোলকাতায় বিখ্যাত ডাক্তার এন আর সেনগুপ্ত মশাইকে কল দিয়েছিলুম, তিনি বলে গেছেন এ পালাজ্বর ভাল হবে, অন্তত খারাপ থাকবে খুব। থাইসিস। এ অসুখ আর সারবে না। ধীরে ধীরে আমি শেষ হয়ে যাবো কয়েকবছরের মধ্যেই।'

সব চুপচাপ। শুধু বেণু ঘুমে ঢলছে। ভোলানাথের বুকে ধাক্কাটা বিষম লাগছে এখন। গোবিন্দ একবার রান্নাঘরের দিকে চেয়ে নিল। কৃষ্ণবেণী সেখানেই আছে। আবার বলতে লাগল খুব আস্তে আস্তে, 'মৃত্যু হোলে কি হবে দাদামশাই! কেউ তো নেই আমার! এই ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে। কি ভাবনা নেই। ব্যাংকে জমা আছে এই বাড়িখানা আর আপনার নাতনির গয়নাগুলো।'

ভোলানাথ শান্ত চুপ করে শুনছিলেন। ভাবছিলেন চন্দ্রনাথের রূপসী মেয়েগুলোর ভাগ্যের কথা। কৃষ্ণবেণীর বয়স জোটে পনের। এতে তো জামাইয়ের সঙ্গে খুবই বেমানান কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এমন হবে। নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হচ্ছে তাঁর।

এ সময় ভোলানাথ কথার সুরে ছিলেন। যোগনীর তো এখন যা বয়স সাজেন সবই খাবার। বেশির ভাগ দিন ওর খাবার বাকি ফেলে না রাখে। যোগনী কিছু বলতে গেলে তাকে গালাগাল যাচ্ছেতাই করে। মেয়েটা না খেয়ে খেয়ে ভেবে ভেবে শুকিয়ে যাচ্ছে।

পাত থেকে উঠে পড়লেন তিনি। আর খেতে ভাল লাগছে না। আঁচাতে যেতে যেতে বললেন, 'এখন থেকে অত ভাবছো কেন গোবিন্দ? ভগবানে ভরসা রাখো সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ভগবান ও'!' ভোলানাথ একটু থমকে গিয়ে গোবিন্দর দিকে চেয়ে দেখলেন। তারপর আঁচাতে গেলেন।

ফিরে এসে সুরধ্বনীর এগিয়ে দেওয়া গামছায় মুখ মুছতে মুছতে বললেন, 'ভগবান মানো না তুমি?'

গোবিন্দ খেতে খেতেই বলল, 'যা নেই তাকে মানা না মানা দুই সমান।'

'ভগবান নেই? তুমি ঠিক জানো?'

গোবিন্দ এবার উত্তর দিল না। ভোলানাথ পানমশলা মুখে দিয়ে বললেন, 'শুনেছি তুমি নাকি বেদ পুরাণ সব পড়েছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সে তো শূদ্রের পড়তে নেই শুনেছি।'

'সেইজন্যেই তো জেদ করে পড়েছি এবং ব্রাহ্মণ বন্ধুর সঙ্গে।'

'তা পড়েও তোমার ধারণা হয়েছে ভগবান নেই।'

'ওগুলো পড়ে আরো বেশি করে হয়েছে।'

ভোলানাথ চুপ করে বাইরের গভীর অন্ধকারের দিকে চেয়ে জোনাকি জ্বলা দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'ভগবান শব্দটাই মানুষের সব বড় আশা। ওটা মানলে আর কিছু না হোক মানুষ মনের জোর পেলেও খানিকটা বাঁচে। ওটাকে উড়িয়ে দিলে মানুষ অনেক আগেই যে মরে যাবে। বাঁচতে গেলে যত কিছু একটা তো চাই। না, তুমি ঠিক করছো না গোবিন্দবাবু।'

বেনু খেতে খেতে একবার বাবামশাই আর একবার দাদাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। গল্প করতে করতে ওরা দুজন কি সব ভগবানের আলোচনা যে শুরু করে দিলে বেনু বেচারা কিছুই বুঝছে না। তবে এটুকু বুঝেছে যে দাদাবাবুর ভয় করছে। ভয় তো করবেই। যা রাত্তির। জোনাকি জ্বলা আর অন্ধকার। আর চাঁদ গেলটা? অন্ধকার খুব খুব করছে! ভয় তো পাবেই। বেনুর তো সন্ধ্যে থেকেই ভয় পাচ্ছে। বেঙ্গমিটা কি করে যে থাকে!

মাঝে মেজদির কোলের কাছে শুয়ে শুয়ে শুনছে হঠাৎ হু হু করে কি যেন সব একসঙ্গে চিৎকার করে ডেকে উঠল।

'ও কি ও মেজদি—' বলে মুখ লুকোল বেনু মেজদির বুকে।

মেজদি ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'ভয় নেই। ও শিয়াল ডাকছে। প্রহরে প্রহরে ডেকে ওরা জানায় ভাই।'

বেনু ভাবল এর চেয়ে শহরেই ভাল তাদের কলকাতা। সেখানে তাদের পাড়ায় এখন কত লোক কত গাড়িঘোড়া। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো। এখন হয়ত সেই লোকটা চিৎকার করতে করতে যাচ্ছে বেলফুল চা-ই বে-ল-ফুল।

এগারো

পাড়ায় যাত্রা হচ্ছে শুনলে বেনুকে ধরে রাখা দায়। সকাল থেকেই বিভাবতীর পিছন পিছন ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকে, 'মা যাবো। মা যাবো, চল না মা, যাত্রা শুনতে।'

বিভাবতী বলে, 'না। আমি যাবো না তুমিও যাবে না বাপু।' তখন বাবামশাই।

'দাদু, মাকে বল না, আমি যাবো যাত্রা শুনতে।'

ভোলানাথ হেসে বলেন, 'কার সঙ্গে যাবে তুমি দাদু?'

'কেন? পাড়ার কত লোক তো যাচ্ছে। কাছেই তো গৌর নিতাই মন্দির।'

ভোলানাথ বেনুর মাথায় গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'অনেক রাত্তির অবধি হবে, তুমি ঘুমিয়ে পড়বে যে দাদু। তখন কে আনবে তোমাকে?'

'না, কক্ষনো ঘুমিয়ে পড়বো না তুমি দেখো।'

ভোলানাথ এবার অন্য রাস্তা ধরেন। 'রাত জাগলে তোমার শরীর খারাপ হবে। এই সেদিন টাইফয়েড থেকে উঠলে।'

'এখন তো সেরে গেছে আর তো পোলের কাছেও যাই না।'

মধুপুর থেকে ফিরে এসেই টাইফয়েড ধরিয়ে বসেছিল বেনু। বৈশাখ জৈষ্ঠ দুটি মাস জীবন নিয়ে টানাটানি গেছে। শরীর সারা জেরে যেতে এমন হয়েছিল যে উঠে দাঁড়াতেই পারত না। অসুখ সারার পরে আজও তিন মাস পুরোনো হাকিমি চালের ভাত শুধু খুঁটিয়ে আলোর ডিম খাঁচে রাখা করে বাড়ন্ত হয়েছে। সঙ্গে ঝিঙ্গে মাছের ঝোল মশলা ছাড়া।

এখন অবশ্য শরীরটা একটু সেরেছে।

ভোলানাথ শেষে বিভাবতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করবে বৌমা, যাবে নাকি খানিকক্ষণের জন্য নিয়ে? না নিয়ে গেলে রাত ভোর কান্নাকাটি করবে শেষে আবার অসুখ বাধিয়ে বসবে।'

বিভাবতী ঘোমটার ভিতর থেকে বলল, 'এখন আমার যাত্রা শুনতে গেলে চলবে না।'

ভোলানাথ বললেন, 'তাতো বুঝি। খানিকক্ষণের ব্যাপার। কিন্তু রাত্তির করে

একবার না হয় নিয়ে যেও।'

'সে হবে না। যেতে হলে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। নইলে ওখানে তোমাকে যাবে না। কেউই ব্যাপারটা বোঝে না।' তারপর চাপা হেসে ছেলের দিকে চেয়ে বলল, বিভাবতী 'বড় অবৈধ বায়না, আপনার কাছে সব পেয়ে পেয়ে এ্যাতো আবদারে হয়েছে।'

ভোলানাথ যেমনি ভাবেই বেণুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'আমার কাছে কতটুকু পায় বোকা? আরো দিদি আর এক ঠাকুমা মার মতন থাকলে তারা কি করতো একে নিয়ে। কত প্রার্থনার ফল এই ছেলে।'

ভোলানাথের গলাটা ভারি হয়ে যায় কথাগুলো বলতে বলতে। বিভাবতী চোখ মুছে নেয়।

যাত্রাবাড়ির খুব ভিড়। বিভাবতী ভেবেছিল বটে সকাল সকাল আসবে কিন্তু তা হয়ে উঠে নি। হাতের কাজ শেষই হতে চায় না। সেই যাত্রা তখন মুখোমুখি এক ছোটো আর বেণুকে নিয়ে। কোনমতে ঠেলে-ঠুলে মেয়েদের জন্য চিকঘেরা জায়গায় ঢুকতে যাচ্ছে বেণু বেঁকে বসল, 'আমি মেয়ে-ছেলে বসার জায়গায় বসবো না বাইরে বসবো', বিভাবতী বলল, 'এ্যাকা বাইরে বসবে তুমি? চল ভেতরে আমাদের সঙ্গে।'

বেণুও যাবে না বিভাবতীও ছাড়বে না। অবশেষে বিরক্ত হয়ে বিভাবতী বেণুর পিঠে দুটো চড় কষিয়ে দিল। বেণু ডুকরে কেঁদে উঠল।

পাশ দিয়ে যেতে যেতে বাবরি চুলওয়ালা একজন লোক বলল, 'আহা ওইটুকু বাচ্চা-টাকে অত মারছেন ক্যানো?'

গলার আওয়াজ শুনে লোকটার মুখের দিকে দেখল বিভাবতী। চেনা চেনা লাগছে। লোকটাও বিভাবতীর মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু। তারপর বলল, 'বৌদি আমায় চিনতে পারছেন না। আমি সুবর্ণ।' বলে হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিল।

বিভাবতী অপ্রতিভ হোল। সুবর্ণদা ডাকল। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'দাদা ভালো আছো?'

'হ্যাঁ বৌদি। এইটি বুঝি ছেলে। দাদার কত সাধনার ধন আহা—'

সুবর্ণও খুব ছোট থেকে যাত্রা করছে। চক্রনাথের দলে কতবার নাচিয়ে এসেছে সেকেলে থেকে গ্যাছে। তখন ওর বয়স ছিল বছর কুড়ি বাইশ। সে বেণুকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি নাম তোমার?' বেণু নাম বলল। তাকে কোলে তুলে নিল সুবর্ণ। বলল, 'বাঃ খুব ভালো নাম। গুরুর নাম। তা বা তোমার বাবাকে ভালো কাকাবাবু?'

বিভাবতীই বেণুর হয়ে বলল, 'ও আমাদের সঙ্গে চিকের ভেতর বসবে না। এ্যাকা এ্যাকা বাইরে বসবে।'

'তাই নাকি কাকাবাবু! তা পুরুষ বটে তো। মেয়েছেলেদের সঙ্গে বসতে ভালো লাগবে ক্যানো বৌদি? চল আমি তোমায় আসরে নিয়ে বসাচ্ছি। তাহলে হবে তো? বৌদি আপনারা ভিতরে যান। আমি ওকে আসরে নিয়ে যাচ্ছি। কোন চিন্তা নেই।' ছোটোকে দেখে সুবর্ণ বলল 'এটা সেই মা ছোটো মা? বাবাঃ কত বড় হয়েছে আর কি চমৎকার দেখতে হয়েছে গো!' ছোটো সুবর্ণকে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করল।

বিভাবতী বলল, 'এটা তোমাদের দল?'

'হ্যাঁ। পালা ভাঙলে আমি ওকে বরং বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবো।'

'কিন্তু ও যদি ঘুমিয়ে ঢুলিয়ে পড়ে?'

বেণু বলে উঠল, 'না না কক্ষনো ঘুমোব না।'

সুবর্ণ হাসল। বলল, 'বৌদি যাত্রা-ওলার রক্ত আছে। ও কখনো যাত্রার আসরে ঘুমিয়ে পড়তে পারে।'

সুবর্ণ বেণুকে নিয়ে একেবারে প্রম্প-টারের পাশে বসাল।

প্রৌঢ় প্রম্পটার জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটি কে হে?'

'চক্রনাথদার ছেলে।'

'কোন চক্রনাথ? ভূষণ অধিকারির আশ্রিত?'

'হ্যাঁ।'

'আহা, উঠতি মুখে মরে গ্যালো ছোকরা ওই আশ্রিত করতে গিয়েই। কি এ্যাকটো যে করতো ও।'

বেণুর মনে খুব আনন্দ। যাত্রা শুনতে একেবারে আসরের মাঝখানে এসে বসা। চারপাশে বাজনদারেরা বসেছে। কারো হাতে বাঁশি কারো হাতে ঝাঁঝর, হার-মোনিয়াম, তবলা মস্ত বড় ঢোলকী আরো কতকি। এখন বাজনা চলছে।

সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করল, 'কাকাবাবু ভালো লাগছে?'

বেণু ঘনঘন ঝাঁকিয়ে মাথা নেড়ে জানাল লাগছে। তারপর বলল,

'আপনি পার্ট করবেন না?'

'হুঁ।'

'তবে এখনো সাজেন নি যে?'

'আমার অনেক দেরি।'

একটা লোক কাগজ বিলি করছে। কাড়াকাড়ি পড়েছে। যে পড়তে জানে সেও হাত বাড়াচ্ছে যে না জানে সেও।

বেণু সুবর্ণকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমা-কেও দেবে না?'

'তোমায় দেবে তুমি? পড়তে পারো?'

বেণু ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

'বটে, কি, বই পড়ো? প্রথম ভাগ?'

'না—'

'দ্বিতীয় ভাগ ?'

'শেষ হয়ে গেছে।'

'তাই নাকি ? পুস্তিকা বানান করতে পারো ?'

বেনু অবাক। বেনু জানে দ্বিতীয় ভাগের সঙ্গে পুস্তিকার অতি নিকট সম্পর্ক। কাউকে বলেনি যে দ্বিতীয় ভাগ পড়েছে। বাস বল দেখি পুস্তিকা বানান।

বেনু বলে দিল।

এবার সুধময় বলল, 'বাঃ ইস্কুলে পড়ো তুমি ?'

'মা বাড়িতে পড়ি।'

'কি কি বই পড়ো ?'

'শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ, বাংলার [illegible] রামায়ণ কাশীদাসী মহাভারত।'

'বাবাঃ বাবাঃ। আমি জানি ! কত বয়েস তোমার ?'

'ছ বছর'

'এই বয়েসে এতো পড়ো ! এতো পড়াশোনা কে শেখান ?'

'বাবা।'

একটা প্রোগ্রাম চেয়ে নিয়ে বেনুকে দিল সুধময়। বেনু দেখতে লাগল প্রোগ্রামটা।

বড় বড় অক্ষরে পালার নাম। পালা লেখকের নাম ছোট অক্ষরে। যাত্রাদলের অধিকারী মশায়ের নাম। তারপর অঙ্ক। দৃশ্য। পালাটার নাম পৌণ্ড্রক বাসুদেব। সুধময়কে জিজ্ঞাসা করল বেনু 'পৌণ্ড্রক বাসুদেব কার নাম ? শ্রীকৃষ্ণের নাম তো বাসুদেব।'

প্রশ্নটাও কানে গেল অনাদার। সে বলল, 'ছেলেটি তো অনেক কিছু জানে দেখছি।'

সুধময় বলল, 'হবেনা ? যাত্রার মহাভারত পড়ে যে !' তারপর বেনুকে বলল, 'শ্রীকৃষ্ণ যে সময় দ্বারকার রাজা ছিলেন তখন সবাই তাঁর বশ হয়েছিল। একজন রাজাকে কিছুতে বশ করতে পারেন নি তিনি। তাঁর নাম পৌণ্ড্রক। তিনি বলতেন শ্রীকৃষ্ণ যদি বাসুদেব তো আমিও বাসুদেব, পৌণ্ড্রক বাসুদেব।

বেনু জিজ্ঞাসা করল, পৌণ্ড্রক কোথাকার রাজা ?

'পৌণ্ড্র ? এই বাংলাদেশেরই একজন রাজা।'

কনসার্ট কিছুক্ষণের জন্যে থেমেছিল আবার শুরু হোল। কনসার্ট শেষে যাত্রাদলের অধিকারী এসে নাচ আরম্ভ করল। বেনু জানে এইবার যাত্রাও আরম্ভ হয়ে গেল। প্রথমে দুবার কনসার্ট তারপরে নাচ গান। আসরের দৃশ্য সব চেহারা : যেমন শ্রীকৃষ্ণ তেমনি রাজা পৌণ্ড্রক। বড় বড় চোখে তাদের দেখছে বেনু। প্রতিটি কথা যেন গিলছে। সুধময় দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে তাকে বলল, 'আমি এবার যাই। সাজতে হবে।'

বেনু বলল, 'আমি সাজঘর দেখব।'

'বেশ চল।'

সাজঘরে ঢুকে বেনু অবাক। রাজা পৌণ্ড্রক আসরে শ্রীকৃষ্ণকে অত গালাগালি করছিল এখন শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রকের থেকে সিগারেটটা টেনে নিয়ে খেতে লাগল। ওদের ঝগড়া কি মিটে গ্যাছে ? খুব হবে না ? আরো অবাক সত্যভামাকে বিড়ি খেতে দেখে। সত্যভামার মাথার অতচুল কোথায় গেল ? এ তো বাবরি টাক ! অথচ রানী সেজে বসে আছে ? যারা যারা দেবতা সাজবে তাদের [illegible] আবার কষ্ট একটু। দেবতা হলেও যদি [illegible] এখন আবার শ্রীকৃষ্ণ তার মাথাটা টিপে দিল।

সুধময় একজনের সঙ্গে তাকে আবার আসরে পাঠিয়ে দিল। তৃতীয় অঙ্ক শুরু হোল। কখনো হাসি কখনো কান্না। কখনো উত্তেজনা ! চরম উত্তেজনা ঘটলো শেষ দৃশ্যে শ্রীকৃষ্ণ আর পৌণ্ড্রক বাসুদেবের লড়াই। শ্রীকৃষ্ণের হাতে চক্র। পৌণ্ড্রকের হাতে তলোয়ার। দুজনে বাজনা বাজতে বেনুর মনে হোল সে নিজেই যেন লড়াই করছে। পৌণ্ড্রক বাসুদেব হেরে গেল। মরতে মরতে সে শ্রীকৃষ্ণের পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, হে বাসুদেব হে শ্রীকৃষ্ণ তুমিই শ্রেষ্ঠ তুমিই ভগবান। তোমার পা আমার বুকে রাখ প্রভু। আমার মুক্তি হোক'। সবাই কাঁদছে। কাঁদছে বেনুও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। শেষদিকে রাজা পৌণ্ড্রক যে ভগবানের কাছে হেরেছে।

সুধময়কে আর বেনুকে বাড়িতে দিয়ে আসতে হোল না।

বিভাবতী আর চণ্ডী মাসবের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। সুধময় তাদের হাতে বেনুকে দিয়ে বলল, 'নিন বৌদি [illegible] দিলুম। ছেলেটি বড় ভালো। এইটুকু বয়েসে এতো জ্ঞান। [illegible] মহাভারত পড়ে [illegible] এ কি কম ! [illegible]'

বিভাবতী বলল, 'শেষে উঠবো কি ভাই ! তোমাদের যাত্রাতেই ভুল ! এতটুকু ভুল ধরতে পারিনি। এইটুকু ছেলে [illegible] শুধু [illegible] বলতে পারবো না। এইতো [illegible] উঠলো শুধু মুখে—'

বেনু সেদিন থেকে আপন মনে যখন তখন চৌকির ওপর হাত পা ছোড়ে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে। চণ্ডী বলে, 'ঐ দ্যাখো মা বেনুটা কি করছে কি কচ্ছিস এই পাগলা—'

'যুদ্ধ কচ্ছি'।

বিভাবতী বলল, আর যুদ্ধ করতে হবে না। হাত মুখ ধুয়ে বসে তাড়াতাড়ি পড়তে বসো গে যাও। [illegible]

কাঁদিয়েছে।'

বেনু এবার পুতুল হাতে পাতা কাটিল। যদিও তেমন বাঁকা বা বিহি কাজ পারে না।

দু তিন দিন পরে সকালের দিকে তোমাদাদের বারান্দায় গিয়ে সে হাজির হোল। দাদির দাদুর সাথে কথা যেমন কাগিমাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা বই। খুলে দিয়ে দেখল বর্ণাঙ্কুর। ভিতরে অনেক ছবি। একটা ছবি মনে গেঁথে গেল। দুগাছের মত ঝরিতে একজন দাঁড়িয়ে আছে তলায় লেখা বিদ্যাসাগর ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। চেহারাটা ভাল লাগল বেনুর।

'কি বই দাদু এটা?'

তোমাদাদু পাশ বসে বলে একটা চাঁপাখীর দুধ বাঁশের চোঙাটি দিয়ে চোখ ভিজিয়ে বললেন, 'নাটক।'

'সত্যিকারের পালা?'

'না, থিয়েটারের।'

বেনু থিয়েটারও দেখেছে। একবার মহসোহদের বাড়িতে হয়েছিল। মা যায় নি দেখতে। বাবার সঙ্গে সে আর ওরা গিয়েছিল। থিয়েটার যাত্রার মত নয়। সবদিকে আসর ঘিরে লোক বসে না। সামনে বসে। থিয়েটার হয় উঁচু মাচার মত জায়গায়। তিন দিক ঢাকা, রঙিন সব ছবি সব আঁকা। আলো কত। যাত্রার চেয়ে অনেক ভালো লাগে দেখতে।

বেনু বলল, 'বইটা একটু পড়বো দাদু।'

'পড়ো। ঐ টুলটায় বসে পড়ো।'

একটা পুরু মাটিমাখা টুলের উপরই বসে পড়ল বেনু। বাড়ির কারো আড়-বারান্দায় আসবার বা আসার সময়েই মাটি মাখানো। তার অন্য কোনো নেই। বোকা চোখা পড়তে অত বোধ নেই। বইটা খুলে যেমন যেমনি আগেই পড়া।

তবে যাত্রার মহাভারতের মত মিল নেই। বাঁদিকে এক একটা নাম লেখা আছে, তার পাশে বাকিগুলো লেখা। আবার বাঁদিকে আর একটা নাম, তার পাশে বাকিক লেখা।

বেনু ভাবে এ কারবারটা। একে বলে কথোপকথন। শিশুশিক্ষায় আছে এমন ধারা। তবে সেখানে নামের পাশে পড় লেখা নেই। ওবস্থ করে পড়তে লাগল বেনু। তোমাদাদু বললেন, 'জোরে পড়ো তুমি।'

আমলে তার লজ্জা করছিল। এ তো বাড়ির পরিবেশ নয়। এখানে চারপাশে অন্য লোকজন। তোমাদাদের কাগিমারা রয়েছে। আশপাশে অন্যলোকদের কার-খানা রয়েছে।

পড়তে পড়তে কখন যে সে যাত্রার ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করতে শুরু করেছে নিজেও জানে না। হঠাৎ কে একজন জোরে বলে উঠল, 'সাবাস রে বাপকো ব্যাটা।'

বেনু চেয়ে দেখল দাদের বারান্দায় দাদির মাথায় পাল বসেছে। চারপাশে ভিড় করে গিয়েছে। দাদুর কাগিমা অন্যান্য কারখানার লোকজন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। খুব লজ্জা পেল এবার। বইটা মুখে তুলে বসে পড়ল মাথা হেঁট করে।

তোমাদাদের পাকা গোঁফজোড়া কাঁপছে। গর্বের হাসিতে তাঁর সাদা মুখ উদ্ভাসিত।

মাথাপ পাল বলল, 'একে যাত্রার দলে দিয়ে দাও তোমাদা, ভালো মস্ত অ্যাক্টার হবে।'

তোমাদাদু বেনুর দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। মাথাপ পালের কথার জবাব দিলেন না। পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বেনুর হাত ধরে বললেন, 'চল দাদু, বাড়ি যাই। বাড়িতে যেতে হবে তো!'

বাড়িতে এসে কাপড়চোপড় ছেড়ে তেল মাখতে মাখতে তোমাদাদু বিভাবতীর উদ্দেশে বললেন, 'জানো বৌমা, দাদু আজ মাৎ করে দিয়েছে।'

তারপর সমস্ত ঘটনাটা বলে শেষে বললেন, 'অনেকে বলছে দাদুকে যাত্রা-দলে দিতে'

বিভাবতী ভয়ে শিউরে উঠল। যাত্রা! রাতের পর রাত জাগবে। খাওয়ার ঠিক নেই শোওয়ার ঠিক নেই। নেশা, ভাং, চিৎকার সবার ব্যাপার—বাপ! না না!

বিভাবতী কখনো যাত্রাদলে যেতে দেবে না ছেলেকে। মরে গেলেও না। কারণ ছবির আগে চরমাদের সে দেখা কি সে ভুলতে পারে? ছেলেকে যাত্রায় যেতে দিও না।

সে বেনুর দেখে বলল, 'ওর বাপের যে মানা আছে।'

তোমাদাদু পরেও বেনুর গায়ে সরষের তেল ডলতে ডলতে বললেন, 'সে কি আমি ভুলে গেছি বৌমা। দাদুকে আমি যাত্রায় দেব? কক্ষনো না। দাদু লেখাপড়া শিখবে। পণ্ডিত হবে। মাস্টার হবে নয় বড় আপিসে চাকরি করবে। চল দাদু দড়া মানটা সেরে আসি।'

এই রকম ছবিতে এ বাড়ির লোকদের। প্রায় সবাই গঙ্গা স্নান করে।

বারো

'আমাদের বাড়ি আয়, আমরাতে বেনু।' বেনুর ঠাকুমার গাইতো বেজে গেই মা। তার মেয়ে পুঁটি বেনুকে নিতে যেতে চায় তাদের বাড়ি।

বেনুদের বাড়ি থেকে আর দূরেই কালী-তলা। সেখানে মাটির বেড়ায় ঘর খোলার চালের নিচে মস্ত বড় এক কালীমূর্তি। সেই সেই কালী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত সেবাইত; সে সেখানে দিনরাত থাকে।

কালীর বড় ঘোর নাক-ডুবনো করে। পুজোর জোগাড় করে। পাড়ার ছেলের দোকানের সেখানে দিনরাত আড্ডা। কালী মন্দিরের দিকেই বাঁধানো রোয়াকে বসে তারা চালা উঁচীর মাঠে আর গাঁজা খায়। গাঁজার আসরের পাণ্ডা ভেঁটুর কাছে। যত গাঁজাখোর, বাউল ভিখিরি সব ভেঁটুর কাছে এসে জোটে দু দুখান খেতে। মাঝে মাঝে বাউলের আসর বসে যায়। গাঁজার ধোঁয়ায় কালীতলা অন্ধকার হয়ে ওঠে।

ভেঁটুর চেহারাও বাউল সন্ন্যাসীর মত। কালো লম্বা চেহারা লম্বা লম্বা চুল। খোলা থাকলে পিঠের ওপর নামে। লম্বা লম্বা দাড়ি। চোখ দুটো সর্বদাই টকটকে লাল। পাড়ার ছোট ছেলে মেয়েরা ভেঁটুকে খুব ভয় করে। বাচ্চারা বিরক্ত করলে মায়েরা বলে ডাকবো ভেঁটুকে? ছেলেরা শান্ত হয়ে যায় ভেঁটুর নামে।

কালীতলা আর বেণুদের গলির মাঝা-মাঝি বিরাট বটগাছ একটা। তার নিচে পাড়ার যত কুচোকাচা এসে জড় হয়। তিন থেকে দশ বারো বছরের ছেলে মেয়েরা। আট বছরের বেশি বয়সের মেয়েদের অবশ্য খুবই কম দেখা যায়। মেয়েদের তখন থেকেই মায়েদের সঙ্গে ঘরের কাজে লেগে পড়তে হয়। বটতলায় সারাদিন দেখা যায় একটা না একটা দল খেলছেই। চোর চোর, বাগদা, বউবসন্ত, ডু-কপাটি, ডাং-গুলি, গাদা লুকো এইসব খেলা। এ খেলার খেলুড়েরা সব বাড়ি থেকেই এসে জোটে। সেরকম হাঙ্গামার খেলা সব বাড়িতেই ছোট ছেলে মেয়েরা এখানে একাত্ম।

বেণুরাও খেলতে যায় এখন ওখানে। তার খেলার সঙ্গী কম। সঙ্গিনী বেশি। দুর্গা, পুঁটি, আরতি, বৈশি এরা। বেণু ছুটোছুটি খেলায় খুব একটা দড় নয়। দৌড়-ঝাঁপ তেমন পারে না। রোগা ছেলে একটুতেই কাহিল হয়ে পড়ে।

পুঁটির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ভাব বেণুর। পুঁটি সব সময় তাকে নিয়ে খেলা করে।

'বেণু চ'আমাদের বাড়ি।' পুঁটি কেবলই তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চায়।

'ক্যানো, কি আছে তোদের বাড়ি?'

'আমার অনেক বড় বড় মাটির পুতুল আছে। খেলবো। আসবি?'

বেণু ওদের বাড়ি যেতে লজ্জা পায়। ভয়ও পায়। পুঁটির বাড়ি মানে ভেঁটু মামারও বাড়ি।

পুঁটি জোর করে নিয়ে যায়। পুঁটি বেণুর সমবয়সীই কিন্তু মাথা তার বলে বেণুর থেকে বড় বলে মনে হয়। হয়ত দু একমাসের বড় হতেও পারে। পুঁটির সঙ্গে খেলতে বেণুর ভাল লাগে। কিন্তু তার মা দুচোখে দেখতে পারেনা ছোটলোক মেয়েদের সঙ্গে খেলা।

বাড়ি মানে একটাই ঘর, এক চিলতে দাওয়া। পাঁচ ছ ঘর ভাড়াটেদের মধ্যে ওরা একঘর ভাড়াটে।

পুঁটির মা বাড়িতেই ছিল। বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা। কপালে কালো দাগ। হাতেও ঐ সব দাগ। বেণু তাকে ওই দাগগুলোকে বসে উঁকি। পুঁটির মায়ের মুখেও বিড়ি! বেণু অবাক হয়ে গেল। যেমন বিড়ি খায় পুঁটির মাও বিড়ি খায়!

পুঁটির সঙ্গে বেণুকে দেখে বলল, 'কাকে আবার লোকাল খেলায় নিয়ে এসে জোটা-চ্ছিস?'

পুঁটি বলল, 'এ তো বেণু।'

পুঁটির মা বলল, 'তুই তো নিজে তোদের কাজকাম করবি না। খেলিয়ে বেড়াবি। ওটা আবার লেখাপড়া শিখবে। উটার বাবা থাকেন কোথা? এ্যাঁ।'

'যাঃ, পুতুল খেলবো দুজনে একটু থাকে কি হয়েছে! আয় রে বেণু।' পুঁটি হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বেণুকে। পুতুলের ঝুড়িটা টেনে বার করল।

একটু পরে পুঁটির মা বলল, 'এ্যাই পুঁটিয়া, হাঁড়ি ঘাটে যাচ্ছি। চাল ধরে সবজি নিয়ে আসবো। তুই খানিক পরে চুলহাটা ধরিয়ে দিবি। যদি দেখিস আগ ধরে নিয়েছে তাহলে তিন মুঠি চাল বসিয়ে দিবি। আর অ্যাখন বাবা এলে বলবি মশলা ফুরিয়ে গেছে।' পুঁটির মা ডাক নাকতে নাকতে কাঁধে গামছা ফেলে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

বেণু বলল, 'পুঁটি তোর মা আমন করে কথা বলে রে?'

পুঁটি বলল, 'আমার মা যে খোট্টা।'

খোট্টা! বেণু আশ্চর্য হয়ে গেল। পুঁটি তো বাঙালী! তবে? তার মা খোট্টা! সে জিজ্ঞেস করল, 'তাই বুঝি তোর মা বিড়ি খায়?'

'হুঁ।'

'তুই বিড়ি খাবি?'

'তোর বাপ তো বাঙালী।'

বেণুর সব গুলিয়ে যায়। পুঁটি বাঙালী। পুঁটির বাবা ভেঁটু মামাও বাঙালী। মা খোট্টা।

লম্বা লম্বা পা ফেলে ভেঁটু ঢোকে, 'এ্যাই পুঁটিয়া, তোর মা কই রে?'

ভেঁটুকে দেখে বেণু সিঁটিয়ে গেছে।

পুঁটি বলল, 'মা তো ঘাটে গ্যাছে।'

ভেঁটু বলল, 'তাহলে তুই দে। সিগগির ওঠ। চাটে মশলার পুরিয়া দে। জলদি কর।'

পুঁটি ভয়ে ভয়ে বলল, 'মা বলে গ্যাছে বাবা এলে বলিস মশলা ফুরিয়ে গ্যাছে।'

'ফুরিয়ে গ্যাছে! শালী হারামি মাগী, ফুরোবার পর বলবে, আগে থাকতে কিছু-তেই বলবে না। সংসারটা বসে আছে কি বলি শালার? আইজ শালী ফিরে

কাঁদাচ্ছি বলে।'

যেমন হুড়মুড় করে ঢুকেছিল তেমনি হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল বেন্টু। বেণুও উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল, 'আমি যাচ্ছি—'

পুঁটি বাধা দিল। 'বাঃ, বোস না। এখনো তো কিছু খেলাই হোল না'।

বেণু দরজার দিকে চেয়ে বলল, 'তোর বাবা—'

'বাবা আর আসবে না। আয়।'

বেণু এসে বসল আবার পুঁটির কাছে। পুঁটি বড় আদুরে পুতুলটা তার হাতে দিয়ে বলল, 'নে এটাকে কাপড় পরা। পারবি না?'

বেণু পুতুলটার গায়ে কাপড় জড়াতে জড়াতে বলল, 'তোর মাকে তোর বাবা গালাগাল দিচ্ছিল ক্যানো রে?'

পুঁটি ঠোঁট উল্টে বলল, 'ওরা ওইরকম। ওদের বাবা আর মায়ে ঝগড়া গালাগাল করে। মাও খুব গালাগাল করে তখন বাবা চুপচুপ পালিয়ে যায়।'

বেণু হেসে উঠল। বোধহয় বেন্টু বাবার গালাগালি খেয়ে পালাবার দৃশ্যটা দেখে। বলল, 'কি মণ্ডা বিক্রি করে রে তোর বাবা? লজ্জা করে?'

পুঁটি বলল, 'দূর! লজ্জা করবে নাকি! প্যাঁড়ার মণ্ডা। বাবা বিক্রি করে।'

'ও।' বেণু এবার বলল, 'তোর বাবাকে ভয় লাগে না তোর?'

'না। বাবা আমাকে খুব ভাল-বাসে। ভয় কি আর।'

'তোর মা?'

'মা খালি খ্যাচ খ্যাচ করে।'

'আমার মাও খুব বকে। তোর বেশ বাবা আছে তোকে ভালবাসে। আমার বাবা নেই'।

পুঁটি বেণুর মুখের দিকে তাকায়। তারপর বলে, 'আমার বাবা আমার নিজের বাবা নয়। মাও নিজের মা নয়।'

নিজের বাবা নিজের মা নয়। এ আবার হয় নাকি! বেণু অবাক হয়ে বলে, 'সে আবার ক্যামন করে হয়?'

পুঁটি বলল, 'এরা আমায় ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছে।' তারপর হাতের পুতুলটা রেখে বলল, 'আমার বাবা আমায় কালীতলায় কুড়িয়ে পেয়েছে।'

'কুড়িয়ে পেয়েছে? সে কি।'

'হাঁ। বাবা একদিন ভোরবেলায় কালী মন্দিরের সামনে থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিল। খুব ছোট্ট আমি তখন। কাঁথা মেলে দিয়ে গেছল।'

পুঁটি উঠে পড়ল, বলল, 'যাই, মা আবার উঠনে ঝাঁট দিতে বলে গ্যাছে। এসে যদি দ্যাখে যে দিইনি তাহলে মেরে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে দেবে।' তারপর উঠনের কাছে গিয়ে পাশে রাখা ঝাঁটাটা ঝুঁটির ঝুঁটি নাচাতে নাচাতে বলল, তুই এখন বাড়ি যা বেণু। ধোঁয়া লাগবে চোখে।'

বেণুও তার কাছে গেল। বলল 'তুই উঠনে ঝাঁট দিতে পারিস?'

'হুঁ। দেখার তো কি' উঠনে ঝুঁটি নাচাতে নাচাতে পুঁটি বলল।

বেণু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুঁটির কাজ দেখতে লাগল, তারপর ধোঁয়া উঠতেই পালিয়ে এল সেখান থেকে।

বাড়িতে এসে দেখল বিভাবতী রান্না করছে। চন্তী কুটনো কুটছে।

চন্তীর পাশে বসে বলল, 'ছোটদি জানিস—'

'কি?'

'পুঁটির বাবা মা নিজের বাবা নয়, মাও নিজের নয়।'

'তাতে কি হোল?'

'পুঁটিকে ওরা নাকি কালীতলায় কুড়িয়ে পেয়েছে?'

'হুঁ।'

'সত্যি ছোটদি?'

বিভাবতী রান্না করতে করতে জিজ্ঞেস করল, 'কি সত্যি রে?'

চন্তী বলল, 'ও জিগ্যেস করছে যে পুঁটির বাবা মা পুঁটিকে কালীতলায় কুড়িয়ে পেয়েছে সত্যি কিনা?'

বিভাবতী গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এসব কথা তোকে কে বলল রে বেণু?'

'পুঁটি।'

'খবরদার। যতসব ছোটলোকের ছেলেপুলেদের সঙ্গে খেলা। ওদের সঙ্গে খেলবে না মোটে।'

বেণু বলল, 'মা মা পুঁটি খুব ভালো মেয়ে। আমাকে খুব ভালোবাসে।'

'থাক'। ধমক দিয়ে উঠল বিভাবতী, 'আর ভালোবাসার দরকার নেই।' তোমার বাবা কত চাচ্ছে তুমি লেখাপড়া শিখবে মানুষ হবে ভদ্রলোকের সঙ্গে। ক্যানো? আর আমার কথা নেই? ব্যাটাছেলের খ্যালা বড় ছেলেদের সঙ্গে। কোথায় পুঁটি, কোথায় বুঁচি কোথায় নেদি—'

গজ গজ করতে লাগল বিভাবতী কড়ায় খুন্তি নাড়ার তালে তালে।

এবার বেণু মায়ের পিঠের কাছে দাঁড়ায়।

'কি হোল আবার, এখেনে ক্যানো? মুখে মধু দিচ্ছে নাকি?'

'মাগো কালকে আমাদের পিঠে হবে?' পিছন থেকে মায়ের গলাটা জড়িয়ে বলল বেণু।

মা রাগ করলে এটা তাকে ঠান্ডা করার একটা কায়দা। কায়দাটা বেশ কিছুদিন আগে বেণু শিখেছে।

'না।' বিভাবতী তবুও গম্ভীর।

'ক্যানো? কাল তো পিঠে পার্বণ?'

'ওই ক'দিন ভাত করতে হয় আর। চিঁড়েগুলো আগে তুলে রেখে দোব। তুমি

পড়ো। গলা ধরে দুললে দাঁড়াবো কি করে! উল্টে দুলে এখনি পেটে পুড়ে যাবো।'

'আগে মন কান দিয়ে করবে। দুধপুলি চসবলা আর পাটিশাপটা—'

'শয়লা পাচে বলছে কিনা, দুধপুলি পাটিশাপটা! কম খাচ্ছ নাকো? কি করে যে দুবেলা দুমুঠো জোটাচ্ছি তোমাদের তা আমিই জানি। এ্যাতো লোভ যদি তাহোলে সব খেয়ে বসে আছো ক্যানো? তারা থাকলে তো সবই হোত। সাত দিন আগে থাকতে চাল গুঁড়োবার ধুম পড়ে যেতো।'

বেবু মায়ের গলা ছেড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে চলে আসে পুতুলের ঘরে। মায়ের কাছে কিছু খাবার কথা বলার জো নেই। তাহলেই বলবে 'সব খেয়ে বসে আছো ক্যানো?' কি খেয়েছে, কি খেয়ে বসে আছে তাতো বুঝতেই পারে না। ঠাকুমাকে খেয়ে ফাকি দিয়েছে আর তারপরই বাবাকে খেয়েছে। কি করে খেল সে? মানুষ কি মানুষের মাংস খায় নাকি? মায়ের যত সব উদ্ভুট্টি কথা!

খানিকটা এঁটেল মাটি দিয়ে পুতুল তৈরির ঘরে বসে বসে একটা পুতুলের রূপ দেবার চেষ্টা করতে থাকে বেবু। এবার একটা নায়কী তৈরি করবে সে। মাথা-ধরাইকে দিয়ে চোখমুখ আঁকিয়ে নেবে, কাপড় চোপড় পরিয়ে নেবে। তারপর মাথাধরাইয়ের কারখানায় দিয়ে দিলে বেচে দেবে। যদি দু'আনায় বেচতে পারে তাহলে কত কি খাবে ইচ্ছেমত। পাটের পুলি, আলুকাবলি, ঝালমোলা, কেক···আর সেই হাওয়ার মিঠাই। জিনিসগুলো মনে করতে করতে জিভের অগ্রাতে লাল ঝরে চোঁয়া গিলতে থাকে বেবু।

তেরো

ভোরের দিকে একটু চোখ লেগেছিল বিভাবতীর। ভোলানাথের প্রচণ্ড হাঁপানীর টান বেড়েছে। গত রাত প্রায় বসে কাটিয়েছেন। কত কি কবিরাজী ওষুধ দিয়ে থাচ্ছেন কিছু হচ্ছে না। মায়ের দিকে প্রায় থাকে। দাওয়াতে শুতে পারেন না। বসে বসে হাঁপাতে থাকেন। বুকটা কামারশালের হাপরের মত ওঠানামা করে। বিভাবতী তখন সারা রাত একঠায় দাঁড়িয়ে বাতাস করতে থাকে হাতপাখা টেনে টেনে।

শহরের সময় হাঁপের টান একটু কম থাকে। এবার বৈশাখেও কমেনি।

কাল সারারাত বিভাবতী স্বামীকে বাতাস করেছে। শেষে জোর করে স্বামীই শেষ রাত্রিতে শুতে পাঠিয়েছিলেন তাকে। ঘরের দরজা একপাল্লা খোলাই থাকে। যদি স্বামীর কিছু দরকার হয়। বিভাবতী তখনই মাত্র একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আর সেই সময়ই সদরের কড়াটা জোরে খট খট করে বেজে উঠল। বিভাবতী চোখ খুলে জানলার দিকে দেখল দুটো চালের ফাঁক দিয়ে একটু আকাশ দেখা যায়। সে আকাশে তখনও তারা দেখতে পেল যদিও পাতলা হয়ে এসেছে অন্ধকার।

এখন এত ভোরে কে আবার কড়া নাড়ছে! উঠতে মোটে ইচ্ছে করছিল না, তবু উঠতে হোল। কারণ ভোলানাথ এই অসুস্থতার মধ্যে চতীকে ডাকছেন।

বিভাবতী ঘরের বাইরে আসতে ভোলানাথ বললেন, 'কে দরজা খটর খটর করছে—'

বিভাবতী বলল, 'দেখছি।'

সদর দরজার কাছে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল 'কে?'

'আমি মা। রামচরণ। বড়োমাবাটী দুলেন—'

রামচরণ। ষোড়শীদের চাকর। বিভাবতীর বুকটা ধক করে উঠল।

দরজা খুলে সে জিজ্ঞাসা করল, 'এত ভোরে এখন কি ব্যাপার?'

'বড়দিদি কি কাল রাত্রে ইখানে এসেছেন?'

বিভাবতী আশ্চর্য হয়ে বলল, 'বড়দিদি? মানে ষোড়শী? রাত্তিরে? এখানে? কই না?'

ভিতর থেকে ভোলানাথ বললেন, 'কে এসেছে? কি বলছে? ওকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

বিভাবতী রামচরণকে বলল, 'এসো তুমি ভেতরে—'

রামচরণ গুটি গুটি ভেতরে এল। উঠোনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে নিচু হয়ে ভোলানাথকে প্রণাম করল।

হাঁপাতে হাঁপাতেই ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বলছিলে তুমি?'

'বড়দিদি কাল রাত্রে ইখানে চলিয়ে এসেছেন কিনা জানতে এসেছি।'

'এখানে? কার সঙ্গে?'

'কারো সাথে না। একা একা।'

'একা একা? রাত্তিরে একা একা? তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছিনে রামচরণ। ষোড়শীদিদি একা একা দিনে কোথাও বেরোয় না আর রাতে একা একা—'

রামচরণ যেন থতমত খেয়ে গেল। থমকে থমকে বলল, 'না, কাল রাত্রে বড়দিদি আর বাবাবাবুর সাথে ইকটু ঝোগড়া হোল চিচামিচি হোল তা বড়দিদি বললেন কি হামি চোলে যাচ্ছে—বলে চোলে আসলেন'।

বিভাবতী আর চুপ করে থাকতে পারল না। তার বুকের ভিতর ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে। বলল, 'একা একা চলে এলো? কত রাত্তির তখন?'

'সে বারোটা সাড়ে বারোটা হবে'

ভোলানাথ আর বসতে পারছিলেন না দু হাতে বুকটা ধরে তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে

পড়ে গড়লেন।

বিভাবতী চিৎকার করে বলল, 'অত রাত্তিরে মেয়েটা এ্যাকা বেরিয়ে গ্যাছে। কেউ দিকে তাকে এ্যাকা এ্যাকা? আটকালে না?'

'হাসি খাচ্ছি খাচ্ছি ভাবছিলম ও। হারাবাবু ওদাকে মাকে বললেন কি খেতে হবে না। অতি আমি এখন খোঁজ করতে এলাম।'

বিভাবতীর কথা আর শেষ হলো না। ডুকরে কেঁদে উঠল সে। 'ওগো আমার কি সর্বনাশ ঘটলো। ও লতিরে তুই—'

ব্রজবালাও ঘুম ভেঙে বাইরে এসেছিলেন, বললেন বড় বিরক্তি—'চুপ কর বউ। চারুচন্দ্র, তোমার হারাধন এখন কি করছে?'

'ঘুমোচ্ছেন।'

'ঘুমোচ্ছেন? রাত দুপুরে বাড়ি থেকে বাড়ির বউ বেরিয়ে যায় সে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। ঠিক করে বলতো তাড়িয়ে দাওনি তো বাড়ি থেকে?'

'হায় হায় ই কি বলছেন আপনি মা? না, মা। হাসি যাচ্ছে না।' বলেই হারাধন খুব জোর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

বিভাবতী ব্রজবালার কাছে ছুটে এসে বলল, 'ওগো দিদিমা, আমি এখন কি করব। এ আমার কি সর্বনাশ হোল গো।'

ব্রজবালা বললেন, 'বউ এমনি কান্নাকাটি কোর না, লোকজন ছুটে আসবে। এ্যাকেবারে ছি ছি পড়ে যাবে। এখনি খোকনীর ওখানে কাউকে পাঠানো দরকার। ব্যাপারটা কি তা জানতে হবে। কিন্তু কে যাবে? কত্তার যা শরীরের অবস্থা উনি তো হাঁটতেই পারছেন না এ্যাকেবারে। এ্যাকবার তোমার দাদার কাছে যাও। তাকে দিয়ে খোঁজটা করাও।'

বিভাবতী একথায় খোকন দাদা হরিণের কাছে। হরিণ তখনো ঘুম থেকে ওঠে নি। গিয়ে তাহাকে চিৎকার করে ডাকতে লাগল সে।

বিভাবতীর বউ কথা শুনে দিল। জিজ্ঞাসা করল, 'ও দিদা, কি হয়েছে কি, ও দিদা—কাঁদছিস ক্যানো?'

তাহার কথার উত্তর না দিয়ে তাহার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বিভাবতী বলতে লাগল, 'হারা দাদা, শিগগির ওঠো, আমার সর্বনাশ হয়েছে গো—হারা ও হারাদা—'

হরিণ ধড়মড় করে চোখ কচলাতে কচলাতে বেরিয়ে এল। 'কি হয়েছে কি!'

'হারা লতিকে কাল রাত্তি থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

কান্না আর চিৎকারের মধ্যে থেকে বিভাবতীর কাছ থেকে যেটুকু কথা উদ্ধার করতে পারল হরিণ তা থেকে ভয় পেয়ে গেল। বলল, 'দিদা চুপ কর। ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস। চ্যাঁচামেচি নি।'

বিভাবতী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিসের—কিসের সিরিয়াস হারা?'

'বুঝতে পারছিস কি? যুবতী মেয়ে। লোকের ঘরের বউ। অতবড় মেয়ে রাত দুপুরে বেরিয়ে গ্যাছে—'

বিভাবতী বাধা দিয়ে বলল, 'হারা তুমি কিসের কথা বলছ? লতি কত বড় মেয়ে এ্যাকা এ্যাকা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গ্যাছে এ কখনো হোতে পারে না হারা। ওই বাগহরিন মাতাল বদমাশটাই তাকে নিশ্চয় বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। জামাইটা বেশ খাবে, মাতাল, জুয়ো খেলে। সে আবার বড় অভিমানী। নিশ্চয় সে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে, না রেললাইনে মাথা দিয়েছে—হারাদা তুমি একবার চল।'

হরিণের মুখ দিয়ে কিছু বেরোল না। তাদের প্রকৃত তথ্য জানার চেয়ে আগেই বেরিয়ে যাবার আগ্রহ তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে এখন। অতি সহজে এমনি না তা বলতে শুরু করবে। শুধু বোনের মুখ চেয়ে বলল, 'কোথায় যেতে বলছিস?'

'লতির শ্বশুরবাড়ি। চল এ্যাকবার খবর নিয়ে আসি। হারা তোমার পায়ে পড়ি চল'।

হরিণ আর না বলতে পারল না। বলল, 'দাঁড়া মুখটা ধুয়ে নি।' মুখ ধুয়ে জামা গায়ে দিয়ে বড়ছেলে পচাকে সঙ্গে নিয়ে যখন বাড়ির উদ্যোগ করল বিভাবতীও সাথে চলতে লাগল। হরিণ বলল, 'তুই বাড়ি যা আমরা দেখে আসছি।'

'না দাদা, আমিও যাব। আমায় নিয়ে চল। মন বড় কু গাইছে।'

পচা খোকনীর শ্বশুরবাড়ির সদর দরজার কড়া নাড়ল।

অনেকক্ষণ ধাক্কাধাক্কির পর দরজা খুলল খোকনীর দিদি শাশুড়ী। তাকে সবাই দিদিমণি বলে ডাকে সে বিভাবতীর চেয়েও বড়।

বিভাবতীকে দেখে গম্ভীরভাবে বলল, 'ও আপনি!'

বিভাবতী ভিতরে ঢুকল। সদর থেকে একটা গলিতে খানিকটা পথ গিয়ে বাঁদিকে বেঁকলে খোকনীদের ঘর। সম্পূর্ণ একতলা। দিদিমণি কিন্তু ধীরেন মুখে দাঁড়িয়ে পথ আগলে রইল যাতে আর বেশিদূর কেউ যেতে না পারে। বলল, 'শুনেছেন তো সব হারাধনের মুখে?'

হরিণ বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু মেয়ে আমাদের বাড়ি যায়নি।'

ঠোঁট উল্টে দিদিমণি বলল, 'তাহলে অন্য কোথাও গ্যাছে।'

এবার বিভাবতী বলল, 'কোথায়?'

'সে আমি কি করে বলবো? সোয়ামী কি বলেছে না বলেছে অমনি সে মেয়ে ঠ্যাং ঠ্যাং করে দুপুররাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়—'

বিভাবতী বাধা দিয়ে বলল, 'মিছে কথা। আপনারা মিছে কথা বলছেন। আমার মেয়ে কখনো অমন করতে পারে না।'

দিদিমণি প্রায় কেঁদে বলল, 'না পারে না। অমন কথা সবাই বলে দিচ্ছে মেয়ের সম্বন্ধে। চ্যাঁচাবেন না। আমার ভাইয়ের শরীর খুব খারাপ। ঘুমোচ্ছে। খুব কষ্টে মেয়ে আপনার। সোয়ামীই গায়ে হাত তোলে, তাকে বাধা দেয়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তাই পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছল, ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে গেছে।'

হরিশ বলল, 'একবার জামাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারি তো।'

দিদিমণি বলল, 'ওবেলা এসে বলবেন। এখন তাকে জাগাতে নিষেধ আছে। এখন আপনারা যান।'

হরিশ বিভাবতীকে বলল, 'বিভা চ—'

বিভাবতী চিৎকার করে উঠে বলল, 'হায় গো, এরা মিছে কথা বলছে। এরা আমার নলিকে বাড়ি থেকে বিদেয় তাড়িয়ে দিয়েছে আর নয়তো মেরে ফেলেছে।'

দিদিমণি খুব কড়া গলায় বলল, 'কি সব বাজে কথা বলছেন ভদ্র মানুষের বাড়ি বয়ে এসে। যান চলে যান বলছি—'

'বিভা চলে আয়—' হরিশ দরজার কাছ থেকে ডাকল।

'দিদি, চল আর এখানে দাঁড়িও না—চল।'

পদ্ম দিদিকে একরকম ঠেলেই বার করে দিয়ে এল মোক্তারের শ্বশুরবাড়ির ভিতর থেকে। বিভাবতী তখন ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করেছে। পাশের বাড়ির দোতলায় একটা জানালা এবং দুয়োর খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল।

শহরতলি। অথচ আশ্চর্য, আশপাশের কোন বাড়িরই জানালা খোলা নেই। এত কান্নাকাটি, এত চেঁচামেচি, কেউ একবারও উঁকি মারল না। সব চুপচাপ সব নিঝুম। অথচ গলির মধ্যে গায়ে গায়ে লাগা সব বাড়ি। এক পাড়ায় পড়ে যে এ বাড়ির নিঃশ্বাস ও বাড়ির লোকের গায়ে লাগার কথা! বস্তি হলে এতক্ষণ ভিড় করে যেত। বড়ো ভদ্রলোকের পাড়া বলে—

বিভাবতীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েই হরিশ ছেলেকে বলল, 'পচা চ রে। আপিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে—'

বিভাবতী কান্নার মধ্যেই বলল, 'দাদা আপিস যাচ্ছো? একবার মেয়েটার খোঁজ করবে না?'

'কোথায় খোঁজ করবো?'

এবার ভোলানাথ বললেন, 'একবার পুলিশে—'

'খেপেছেন আপনি। দুপুরে মেয়ে বেরিয়ে গেছে এই নিয়ে এখনি পাঁচজনে পাঁচকথা বলবে। এর ওপর পুলিশ হাঙ্গামা করে মুখ দেখানো যাবে পাড়ায়?'

হরিশ চলে যেতে পারলে বাঁচে।

ভোলানাথ শান্ত বললেন, 'দেখিয়ে সত্যিই গেছে কিনা সেটাও তো জানা দরকার। পুলিশকে জানালে সে ব্যাপারে একটা কিনারা হোত—'

হরিশ বলল, 'কিনারা করে আর কি হবে জ্যাঠামশাই। মরে গেলে তো গেছেই আর যদি বেঁচে থাকে সে তো সবারই নাগালের বাইরে। ফিরে এলে আর তো বাসী মেয়েকে আর এ বাড়িতে জায়গা দিতে পারবেন তাকে?'

ভোলানাথ শুধু বললেন, 'তবু একটা চেষ্টা—'

হরিশ এবার স্পষ্টাস্পষ্টিই বললে, 'আমার দ্বারা ওসব পুলিশ টুলিশ করা সম্ভব হবে না জ্যাঠামশাই। পারেন আপনারা করুন। পচা দেরি হয়ে যাচ্ছে—'

হরিশ ছেলেকে নিয়ে চলে গেল। বিভাবতী কান্নায় ভেঙে পড়ল। বুকফাটা কান্না কাঁদছে সে। তার আওয়াজে শোক ভয় হতে শুরু হয়েছে বাড়ির মধ্যে।

ষষ্ঠী আর বেবু ঘুম ভেঙে উঠে ব্যাপার স্যাপার দেখে বোবা হয়ে গেছে। বেবু বুঝতেই পারছে না ব্যাপার কি হয়েছে। মার মার করে মা এত কাঁদছে কেন।

'কি হোল—কি হয়েছে মা?' বলতে বলতে ঢুকছে বাড়িতে পাড়াপড়শিরা। বেশির ভাগই মেয়ে, বউ, বিধবা সধবার দল। ও একবার দেখতেও আছে। কারুর কারুর মনে কেউ বিশেষ সহানুভূতি দেখাচ্ছে না। দু একজন নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে কথাবার্তা বলতে বলতে চলে যাচ্ছে।

এদিক ওদিক কিছু টুকরো মন্তব্যও কানে এল, 'অত কেঁদে কি হবে আর। মেয়ে যখন সোয়ামীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে তখন কোথাও না গেছে কি পারে? তুমির সাথে গাড়ির চেপে আসতে যাচ্ছে দেখতে—'

পাড়ার চাপা হাসি। মর্মান্তিক কানে হাতচাপা দিলেন। ষোড়শী সুন্দরী চটী এরা কেউ নিজের পেটের মেয়ের থেকে কম নয় তাঁর কাছে। এই মেয়েদের দেখবেন দিদি অন্ধ থেকেই। বিভাবতীর সেই থেকে বেরিয়ে প্রথম পড়েছে তার ঠাকুরই হাতে। তাদের চলন বলন ধরন ধারণ সব তাঁর জানা। মেয়েগুলো সব এক একটা পুজোর ফুল। ষোড়শী মরে যাবে তবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে না। নীরবে কষ্ট সইবে বাড়ির মধ্যে ছটো চোখ দিয়ে। বিভাবতীর কাছে গিয়ে তাকে ধরে থেকে থেকে তুলে বসাতে বসাতে বললেন, 'বউ কেঁদো না, তোমার কান্না দেখে লোক হাসছে। যা তা বলছে

ভাবনীর বাবে। কেঁদে কেঁদে কবে-
নি করে মেয়েটার কপালে আর বাকিও
বউ। তোমার পায়ে পড়ি তুমি চুপ
কর।'

বেনু কোনদিন ভাবে নি ব্যাপারটা এত
সহজ হবে। তাঁর দুটি চোখ থেকে অশ্রুর
ধারা বেয়ে বুকের কাছের জামাটা ভিজিয়ে
দিচ্ছে। ছোটদিও বাবার কাছে বসে
মুখে আঁচল চেপে কাঁদছে। সকলের কান্না
দেখে হাবুও খুকীটার মতো কেমন করে
উঠল। সেও কেঁদে ফেলল।

চোদ্দ

এর পর বেনু বাবার সঙ্গে অনেক
ঘুরেছে। বাগবাজারের রোয়াকবাসীদের,
শিবপুরের দর্জিপাড়ার, ভবানীপুরের
জ্যোতিষী, বালাখানার বৃন্দাবন পাণ্ডার
দর্শন বাদ চন্দননগরের গৌরহরিবাবুর
পালিত পর্যন্ত। সবখানে জ্যোতিষী গুণিন
গুণিন যেখানে যার নাম শুনেছে বিভাবতী
সেখানে ছুটেছে। যদি কেউ মেয়ের
খোঁজ বলতে পারে। সঙ্গে গেছেন মঙ্গ-
লবালা। তিনি বারবার বাধা দেবার চেষ্টা
করেছেন, বলেছেন, 'বউ কি হবে এসব
করে? খালি খরচ আর ছুটোছুটি। ওরা
বললে একটা কথাও বিশ্বাস হয় না।'

কিন্তু বিভাবতী যখনি কারো কাছে
শুনল যে অমুক জায়গায় অমুক গুণিন একে-
বারে অব্যর্থ তখনি মনে মনে মঙ্গলবালাকে
বলল, 'দিদি চল।'

মঙ্গলবালা একটা না বলেন। তারপর
বিভাবতীর অসহায় করুণ দুটো চোখের
দিকে চেয়ে বলেন, 'চল—'

বিভাবতীর অদ্ভুত চাপা বেদনা। বেনু
তো থাকেই চৌকি পাহারা। একটা বছর
পূর্ণ হয়ে গেছে তার। খাড়ি বড়েছে।
বাইরে বেরোলে সহজেই পুরুষের দৃষ্টি
আকর্ষণ করে। তাকে একা বাড়িতে রেখে
যাওয়া যায় না। এমনিতেই তো রোকনীকে
নিয়ে কিনকার আলোচনা এখন শহর জুড়ে
উঠেছে। পাড়ার বাড়ে গেলে বিভা-
বতীকে শুনিয়ে শুনিয়ে পাড়ার মহিলারা
রোকনীকে নিয়ে বেশ রসাল আলোচনা
করে থাকেন বটে মনে। যদিও রোকনীর
নামটা কেউ করে না।

কেউ বলে, 'আয়কাটি নয় রে। এর
যোগ আছে। খবর ঠিকই আছে।'

আর একজন বলেন তাকে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ,
সেয়ের সেয়ের মা মেয়ের যোগ সাজিন
আছে রে বাবা। দু একটা মাস এদিক-
ওদিক এক পা বাড়া পরে মঠেতে চেপে
এসে যাবে।'

'আমাদের সেই অমন রূপসী মেয়ে
দু একটা এলেও তো পারত। ভাবনা
থাকত না ভাই। শেষ বয়সটা মেয়ের
রোজগারে পায়ের ওপর পা দিয়ে বেড়ুম।'

কথা শেষে হেসে হেসে এ ওর গায়ে
ঢলে পড়ে। বিভাবতীর কান জ্বলে যায়।
কেউ যেন গরম সীসে গলিয়ে কেউ ঢেলে দিচ্ছে
কানে। বাড়িতে ফিরে এসে শুধু মেয়েকে
খাবার খোঁজে আর হাউ হাউ কাঁদে। বাবা
হয়ে সকালের দিকে গঙ্গাস্নানে যাওয়া বন্ধ
করে দিয়েছে সে। যার দেখা ছুটো তিন-
টের দল যখন পাড়ার জমায়েত থাকেনা।
তাদের চোখের তোলাবাজদের লোভার লোকে
অনেক কিছু। রোকনী সম্বন্ধে বাজেকি।
দিনের কথা তাঁর আত্মীয় কুটুম যারা
তাদেরাই ওপর তোড়া থেকেই বিনা
আর চন্দ্রাবলের সংসারে থাকার কষ্ট।
তোলাবাজের পাঁচ খুব খারাপ লাগছে।
দিনে বোটে খাটতে পারছিলেন না যেন
কিছুদিন হলেই। রোকনীর বোনটার পর
একেবারে ভেঙে পড়েছেন। মুখে কিছু
বলেন না বটে কিন্তু বেশ বোঝা যায় তাঁকে
দেখলে।

গৌরহরিবাবুর বাড়িতে কাছ থেকে
সেদিন বিভাবতীরা ফিরল সেদিন রাত
আর সাথে কষ্টটা বেড়ে গেছে। অতদূর
আর ফিরতে রাত হবে বলে চৌকি রেখে
গিয়েছিল তোলাবাজ পাড়ার কাছে। তিনি
আর সেদিন বিকেল বেলা কারখানায় যান
নি।

দিনটা বড়ই ভার। তারিক বড় সন্ধ্যে-
বেলা একটা বৃদ্ধপ্রায় দোঁয়ার কথা অত-
দূর গ্রাম থেকে বিভাবতীকে ডেকে বললেন,
'পাগলের মত ছুটে যাচ্ছিল কোথায়?
সে তো খুব সুখেই আছে রে।'

ওদিন, তারিকের সঙ্গে কথাবার্তা
বলেন মঙ্গলবালাই। বিভাবতী ঠিক বুঝ
করতে পারে না। তিনি বললেন, 'মুখে
আছে? বেঁচে আছে?'

তারিক এ কথার উত্তর দিলেন না।
নিমীলিত চোখে মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বাঁ
কানের ওপর রাখা তার পায়ের মেলোটা বাঁ
হাত দিয়ে অনবরত ঘষেই চললেন। মঙ্গ-
লবালা বললেন আবার, 'কোথায় আছে
বাবা? তার সঙ্গে দেখা হয় না আজ-
কাল?'

তারিক এবার বললেন তাঁর দিকে না
চেয়েই, 'সে উপায় নেই।'

'কিন্তু কোথায় আছে সে?'

'খুব ভালো জায়গায়। বেটি আমে
সুখ করে রেখেছে।'

আর পর জিজ্ঞাসারও মুখ খুললেন
না।

বিভাবতী তারিকের রহস্যময় কথা
কিছু বুঝতে পারল না। বাইরে এসে
বলল, 'হ্যাঁ দিদি, সত্যি কি বেঁচে আছে?
কোথায় আছে দিদি। আমাকে তো স্পষ্ট
করে কিছু বললে না।'

বিভাবতীকে পরে স্পষ্ট করে কিছু মঙ্গ-
লবালাও বললেন না। উনি বুঝতে পেরে-
ছেন তারিকের কথা। তারিক বলতে
চেয়েছেন রোকনী মারা গেছে। সে
জন্নাতের আরামে সুখেই আছে। এই

একমাত্র পড়বার যার কথায় মন্দাকিনীর বিষাদ হয়েছে। এতদিন সব কাগজে আবোলতাবোল কথা বলেছে। কেউ বলেছে পালিয়েছে বনানীর দিন রাত্রি দিয়েছে। কেউ বলেছে দু বছর বাদে ফিরবে। তার আগে খবর আসবে।

এই পাড়ুই পরিচয়টা বলেছে। মোহিনীর মত মেয়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে বাঁচতে পারেনা। এ ছাড়াও মন্দাকিনীর বিষাদের অন্য কারণ একটা ছিল। মন্দাকিনী বড় ছেলেকে একদিন বলেছিলেন, 'বাবু তুইতো অনেক জায়গায় ঘুরিস। অনেক খবরাখবর রাখিস। মোহিনীর ব্যাপারটা একটু খোঁজখবর করতে পারিস?'

মাস দুয়েক পরে একদিন বাবু মন্দাকিনীকে খবরটা দিল। বলল, 'মা একটা খবর যোগাড় করেছি মোহিনীদের তিন পাশের বাড়ির একটা লোকের কাছ থেকে। কিন্তু সেই বলবে না। পুলিশের ভয়ে মুখ খুলতে চায় না সে। শেষে তার কথা রাখিয়ে তবে ঘটনাটা জানলুম।'

'কি বলেছে সে?'

'বলছি। কিন্তু মা এসব সে যা বলেছে আমাকে, যদি পুলিশ হাঙ্গামা হয় সে কিন্তু পুলিশের কাছে কিছু স্বীকার যাবে না। সাক্ষী সাবুদের ঝামেলায় সে যাবে না।'

মন্দাকিনী বললে, 'তুই ক্ষেপেছিস! কে পুলিশ করতে এসেছে? তাহলে তো অনেকদিন আগেই হোত।'

এর পর বাবু ঘটনাটা মাকে বলল যেমন সে শুনেছিল সেই লোকটার কাছে।

যেদিন মোহিনী পালিয়েছে বলে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে রটনা করা হোল সেদিন মাঝরাতে ওদের বাড়ি থেকে বড় রকমের চেঁচামেচি শোনা যায়। পাড়ার লোকে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা বুঝল মোহিনীর স্বামী কিরণকে মাতাল হয়ে এসে স্ত্রীকে খানিকক্ষণ এমন চলবে বড়জোর চিৎকার। কিন্তু এ দিন চট করে থামল না। মোহিনীর গলাটা প্রথম দিকে খুব শোনা যাচ্ছিল। কিছুপরেই কান্নাকে থামাবার শব্দ হোল। সঙ্গে সঙ্গে মোহিনীর কান্না শুরু হোল। মিনিটখানেক বাদে একটা ভারী কিছু পড়ে যাবার আওয়াজ শোনা যায়। পরে একটু গোঙানী শব্দ। তারপর সব চুপচাপ। কেবল তাড়াতাড়ি চলাফেরার পায়ের শব্দ। পাশের বাড়ির লোকটা জানলা খুলে কিছু দেখবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখতে বিশেষ পায় নি। শুধু একটা লোককে সদর খুলে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। এরপরে গলিতে রিক্সা থামার আওয়াজ হয়। আবার কতকগুলো পায়ের শব্দ। তারপর বড় ভারী কোন কিছু ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে সদরের দিকে মনে হয়েছে। সদর রাস্তা এক হয়ে তারপর থেকে কিছুদিন পর পর্যন্ত মোহিনীর স্বামীকে পাড়ার কেউ দেখতে পায় নি।'

মন্দাকিনী শুনে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'মেয়েটাকে ওরা মেরেই ফেলেছে। লাশ-টাকে গুম করে দিয়েছে।'

বাবু বলল, 'মোহিনীর বরের পক্ষে সেটা মোটেই শক্ত কাজ নয় মা। সদরের ঘাট মহকুমা আর এখানকার থানার হাত। তাছাড়া বিস্তর বড় বড় লোকের মোসাহেব। এখন আবার টাকি বাসরোডে এ্যাকটো করছে।'

মন্দাকিনী বলতে লাগলেন, 'এদের যা আছে অর্থবল, যা আছে লোকবল। এমন একটা অন্যায়ের আর কিনারা হবে না। অত দেবীর মত মেয়েটার নামে কালি ছিটিয়ে দিলে—'

বাবু বলল, 'কাকীর দাদা যদি একটু চেষ্টা করে তো এ্যাখনো একটা কিনারা হতে পারে মা।'

মন্দাকিনী বললেন, 'সেই চেষ্টা করবে না রে। তারা এখন এদের সঙ্গে বিশেষ পরিচয়ই রাখতে চায় না। তারা বলেই দিয়েছে মোহিনী বেরিয়ে গেছে। কোন যে কি করে তারা খোঁজই রাখে না। বউ তো এই লোকের মাঝখানে পুতুল তুলে তুলে শরীরপাত করে ফেলল। এক্কেবারে খাবে দাবে। মাঝখান থেকে উপোস যায়।'

'এই বাড়ির একটি ছেলেটা আছে। মেয়েটা হবার পর থেকে দিন রাত্রি পুতুল নিয়ে কাটাতো। দাদা বাঁটা আছে এখানকার দিন রাত্রি ছুটোছুটি করে খেতে পায়। সেদিন রাতের খাবারটা খেতে হয় না। একটি দাবিয়ে মদ দোকান থেকে কিনে

'মকে শান্তিতে রাখা খুব ভালো সংসারে পায় না। ইচ্ছে করলে এদের মতো কুটিল মানুষ ভালোভাবেই দেখতে পারেন।'

মন্দাকিনী একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এই ইচ্ছেটাই তো লোকের থাকে না বাবা।'

দুধ ফুটে ছেলেকে বলতে পারলেন না যে তুমি আমার কোলপোঁছা ছেলে, থাকবেন আমার নতুন ছোট্ট ঠোঁটা তৈরি করে সম্পূর্ণ করিয়ে সেটা তাড় যোগাড় করতে হয় কেন? তুমি তো মাস গেলে পাঁচটা টাকা দিয়ে যাচ্ছ। সব মাসে তাও হাত না। বরঞ্চ পেটখোরাকি হাত খরচ জোগাড় বাবা এখন আমি চালাই কি করে তা জানবার ইচ্ছেটা কি কোনদিন তোমার হয়েছে?

মোহনপাড়া থেকে ওরা ফিরতে মোহন দাস মন্দাকিনীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হোল বড় বৌমা? কি বললে জ্যোতিষী?'

মন্দাকিনী আস্তে আস্তে বললেন তাড়ি-তেন কথাগুলো। শুনে মোহনবাবু পার

'বঁ'। বলে যেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ঘোষাল। বিভাবতীকে ডাকলেন, 'বউমা, শোন।'

বিভাবতী ঘোমটা টেনে এসে দরজার থেকে কিছু দূরে দাঁড়াল। এবার চোখ ফিরিয়ে নিলেন ভোলানাথ। এই বধূর ধান পাকা নিরাভরণ মূর্তিটা দেখলে বড় কষ্ট হয় তাঁর। বিভাবতী সুশ্রী দেখতে ছিল না কোনদিন কিন্তু চন্দনাথ মারা যাবার পর থেকে শোক অর্ধচিন্তা পরিশ্রম অনাহার আর অর্ধাহারে দিন দিন যেন একটা প্রেতি-নীর রূপে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। ভোলা-নাথ বললেন, 'এবার ছোটখুকিটা বড় হল বউমা। তারিকও তাই বলেছে। মন শক্ত কর। এইরকম করলে এ ছেলেমেয়ে দুটো মারা যাবে। তাদের দেখবার কেউ দাঁড়াতে পারে না না।' বলে তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

বিভাবতীর চোখ দিয়ে অশ্রু বন্যা নেমেছে। ঘোমটার মধ্যে কেঁদে যাচ্ছে সে। কোন শব্দ নেই তার কান্নায়। এ ধরনের কান্না তার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। ভোলানাথ এবার দম নিলেন একটু। তারপর বললেন, 'আমার শরীর গতিক খুব একটা ভাল ঠেকছে না। দিন দিন কাহিল হয়ে পড়ছি। এ কারবারটা হয়ত আর চালাতে পারব না। বাঁচিও যদি শেষ কটা দিন হয়ত বসে দিয়ে থাকতে হবে।'

নন্দবালা কথা না বলে পারলেন না। বললেন, 'তাহলে এদের কি হবে কর্তা-মশাই, কে দেখবে এদের। কোন অভি-ভাবকই তো নেই!'

'সে তো বুঝি বড় বৌমা। তাই তো ভেবে পাচ্ছিনে। কিন্তু আর যদি মরে যাই তাহলেও এদের তো সেই অবস্থাই হবে। আর বেঁচে থেকে পঙ্গু হয়ে এদের ঘাড়ে থাকলে এদের আরো বেশি বিপাকে পড়তে হবে।'

বিভাবতী নন্দবালা এর জবাবে কিছুই কেউ বলতে পারল না। অত্যন্ত নিষ্ঠুর সত্যি কথাটাই বলেছেন ভোলানাথ। ভোলানাথ আবার বললেন, 'চণ্ডীর বিয়েটা আমি তাই তাড়াতাড়ি দিয়ে যেতে চাই। যোগনীর ব্যাপারে যে খোঁট পাকিয়েছে তাতে আর দেরি করলে চণ্ডীর বিয়ে হওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়াবে।'

এটাও অত্যন্ত ঠিক কথা।

'আমি চাই মাসের মধ্যে চুকিয়ে ফেলতে। একটা পাত্র পেয়েছি। কৌ-দল বাড়ি। ছেলের বয়স কম, এখন হবে বড় জোর। চণ্ডীর পক্ষে ভাল মানাবে। ছেলের বাবা মানুষ ভালো। মাটির কারবার করে ভালো কামিয়ে উঠেছে এই বয়সেই। সংসারের মধ্যে শুধু বিধবা মা। মায়ের ঐ একটিই সন্তান। ছেলে পক্ষে দাবি দাওয়া কিছু নেই শুধু একটি সুন্দরী মেয়ে। তুমি দেবে বউমা?'

বিভাবতী বসুতে চুপ। কি জবাব দি- বলবে ভেবে পায় না। বিয়ের যে খরচ বড় সামান্যই হোক জোটাবে কোথা থেকে? নন্দবালাই তার হয়ে বললেন, 'ও আর কি বলবে কর্তামশাই। আপনি যদি ভালো মনে করেন দিয়ে দিন। কি বলিস বউ!'

বউ ঘোমটার মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

পনের

অঘ্রানের ঐ ধনুতেই চণ্ডীর বিয়ে হয়ে গেল। মোটা মোটা করে। বিয়ের কি উৎসব করবে বিভাবতী। অর্থ নেই লোকবলও নেই। যোগনীর ব্যাপারে মতি সবাই মুখর। কিভাবে তা পারেও সে পারছিলে এবং তার মাকে রাখি কমালেন ভোলানাথ সেটা তিনি ছাড়া কেউ জানে না। তিনিও কাউকে বলেন নি এ সম্বন্ধে কোন কথা।

বাবা বা অগ্নীশের কাছে আর যেতে ইচ্ছে করে না বিভাবতীর কখনো তাদের সামনে দাঁড়াবার মেয়েই হয়। আমার বলতে তো তারাই। এবং যাকে হাতের কাছেই।

বিয়েতে তবু হলেও সোনা লাগল। বাবা দিলেন কানাইয়ের গলে আংটি সোনার আংটি। অগ্নীশ দিলেন এই কানের একজোড়া একটা বেভাত্ সেট। গোবিন্দ বোষের কুবেরপতীর গয়না জেলেই অভি ফিরেছেন হাতে আর চুড়িতে মিলিয়ে দিলে। চণ্ডীর দিদের কানের দুল আর মাকড়ি ছিলই। দুলের সঙ্গে আবার চারের সোনা মিলিয়ে পাতলা পাতলা একজোড়া কানপাশা হোল। আর গড়ে বালা শেষ সময় বিভাবতীর একটা তামা ভেঙে ওপর হাতের দুটো আড়াই-পেচি হোল। ভোলানাথ দিলেন বাওয়া-বোর খরচ। নির্ধারিত বলতে ওই দশ বরযাত্রী, আপনাদের বাড়ির সব পরের লোক আর বিভাবতীর বাপের বাড়ির জন।

গোবিন্দ এল না বিয়েতে। কুবেরপতীকে দিয়ে নিয়ে এল বিভাবতীর বড় ভাইপো পচা। গোবিন্দ বাড়ি আগলাচ্ছে বটে আর পারের ব্যথা চলাফেরাও বিশেষ করে উঠতে পারে না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে লাঠির ওপর ভর দিয়ে কষ্ট হাঁটা চলা করা যায়।

যখন বর এল বরের বাজা আর বাবরি চুল দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল বেবু। আর যারা সঙ্গে এসেছে তাদেরই বা কি বাহা! প্রত্যেকের চওড়া চওড়া বুকের ছাতি। বরের চওড়া বুকের ছাতিটা সিল্কের পাঞ্জাবির মধ্যে যেন আঁটছে না। ঠেলে বেরোতে চাইছে। একজন বরযাত্রী তাকে টেনে বরের পাশে বসিয়ে বলল, 'তুমি কে বলতো? তখন থেকে বরের কাছে ঘুরছো। কি নাম?'

বেবু নাম বলল।

'বলোর কে হও।'

বেণু বলল, 'জাই।'

বরযাত্রীটি বলল, 'তাই বল, আমাদের জামাইবাবু।' বেণুর দুটো কান ধরে টান করিয়ে দিল। বেণু খাড় নিচু করে আছে। লজ্জায় চাইতে পারছে না কারো দিকে।

'আ জামাইবাবু এমন রোগা কালো কেন? আমাদের দলে যারা আমাদের দেখে? একমাসের মধ্যে বোনাইবাবুর সব চেহারা বাগিয়ে দোব।' বলে বরযাত্রীটি বরের হাতের গুলো টিপে টিপে দেখাতে লাগল।

'দেখেছ বোনাইয়ের হাতের মাসল। টিপে দ্যাখো।' বলে বরের বাহুর ওপর তার হাতটা দিয়ে রাখল। আমার ওপর দিয়েই বেণুর মনে হল যেন লোহার পাটি একটা। ওপর হাতটা চওড়া। আর বুকের মধ্যে ব্যথা।

অতএব বেণু মুগ্ধ হয়ে গেল ছোট জামাইবাবুর চেহারা দেখে। এর কাছাকাছি থাকলে তুমি নিরাপদ। যত গুণ্ডাই তাড়া করুক যত মাস্তানই ছোরার বোতল কাটার এর হাতের একটি চড়ে সে ঠাণ্ডা। একেবারে সেই মহাভারতের ছবি। ভীমের মত। জামাইবাবুর পায়ের মতো কালো বলেই বোধহয় বেণুর চট করে ভীমভীমের কথাটাই মনে পড়েছিল। নইলে শুধু ভীমের কথা মনে পড়ল না কেন?

আর একজন বরযাত্রী বলল, 'জানো শালাবাবাই, তোমার দিদির বরের গায়ের জোর? গরুর গাড়িতে বসবার জোর চাপিয়ে সেই গাড়িটা চুলের সঙ্গে বেঁধে এক মাইল রাস্তা টেনে নিয়ে যেতে পারে।'

বেণু আর ছোট জামাইবাবুর পাশ ছাড়ল না। ছাঁদনাতলায়, বিয়ের আসরে, তত্ত্বতত্ত্বির সময়, শেষ অবধি বাসরে ছোট জামাইবাবুর পাশে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

বিয়ের দিন নন্দবালা ব্যাপারটা দেখে একটু আশ্চর্যই হলেন। একটু রাগও হতে লাগল বিভাবতীর ওপর। বউয়ের কি মনে পড়েও বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না। ব্যাপারটা দেখ নীলা। সকাল থেকে এসে উদের সঙ্গে নানা কাজে লেগে পড়েছে। কখনো বাসনপত্র মাজাঘষি করছে কখনো কুটনো কুটছে কখনো মশলা বেটে দিচ্ছে।

একসময় বিভাবতীকে আড়ালে পেয়ে নন্দবালা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বউ নীলাকে নেমন্তন্ন করেছ নাকি?'

বিভাবতী বলল 'না তো—'

'তবে ও যে এত খাটাখাটুনি করছে!'

'কি জানি আমিও তো অবাক হয়ে যাচ্ছি।'

নন্দবালা বললেন, 'পাড়াশুদ্ধ কাছে ওকে দেখে আমার লজ্জা উঠবে না তো?'

'তাতো বলতে পারছি নি। কিন্তু মুখ ফুটে ওকে বলতেও তো পারবো না যে নীলা তুমি চলে যাও।'

'না তাকি আর বলা যায়।' নন্দবালা স্বীকার করলেন।

বিভাবতী বলল, 'যা হবার হোক সে দিদি। আমাদের নিজের কপাল। আমার মেয়ের ছেলেপুলে গোটা দশ আমাদের বিয়ের ছেড়ে গ্যালো। অথচ আমাদের কিছু দোষ নেই। ওকে আমি তাড়াতে পারব না। বড্ড ভালোবাসে আমার ছেলেমেয়ে দুটোকে।'

সারাদিন খেটে সন্ধ্যের দিকে নীলা যখন বাড়ি যাচ্ছে বিভাবতী বলল, 'নীলা রাত্তিরে আসছো তো খেতে?'

নীলা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'এলতে হবে বৌদি? আমি বলি কি আমি এখনই খানি লুচি খেয়ে যাবো না হয়।'

বিভাবতী বলল, 'সে কাজ যা করে থাকে আর রাত্তিরেও তুমি আসবে, খেয়ে যাবে।'

নীলা অগত্যা বলল, 'বেশ, এলবো খন।'

সন্ধ্যের খানিক পরে এসে নীলা আড়ালে বিভাবতীকে ডেকে একটা কাগজের মোড়ক দিয়ে বলল, 'এটা চটো-মাকে দিও বৌদি।'

'কি এটা'?

'কিছু নয়, একটা কাপড়।'

বিভাবতী খুলে দেখল বেশ ভালো শাড়ি একটা। কম করে চার পাঁচ টাকা দাম। বলল, 'না না নীলা, এসব ক্যানো আবার পয়সা খরচ করে তুমি শাড়ি কিনি আনতে গেলে? এসব দেবার দরকার নেই—'

নীলা করুণ মুখে বলল, 'আমাকেই তো বৌদি! আহারা এদের জাইবোন দুটোকে দেখলে আমার ছেলেমেয়ে দুটোকে বড় মনে পড়ে'

নীলাকে নিয়ে কোন কথা ওঠে কি না তাকে নিয়ে এরা কেউ ভাবে কি বিয়ের সাতকাণ্ডে সে ছিলই না। সে শুধু সবার সাথে মিশে নিমন্ত্রিতদের এঁটো-পাতা ফেলা আর খাওয়ার জায়গা সাফ করার কাজে।

পরে চুকলে নীলাকে ধরে এনে খাওয়ার বসিয়ে বিভাবতী নিজে পরিবেশন করে নীলাকে খাওয়ালেন। তখন রাত বারোটা বেজে গেছে।

বেণুর নিমন্ত্রিত বান্ধবী ছিল। পুঁটি। বিয়ের দু'দিন আগে বেণু মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—'মা, পুঁটি, বেবি, ঝুমা আর মিতাইকে নেমন্তন্ন করব তো?'

বিভাবতী বলেছিল, 'সব পরের কাজ কিনা আমার তাই ঠিকঠাক নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে হবে।'

বেণুর মুখটা ম্লান হয়ে গেল। দেখে বিভাবতী তাকে ডেকে বলল, 'অতজনকে বলিস নি। একা পুঁটিকেই বলিস। দেখছিস তো অবস্থা। কি করে পারব বাবা।'

বেণু শুধু পুঁটিকে বলেছিল। ভেবেছিল

কাউকেই বলতে না। কিন্তু পুঁচকে কেমন না বলতে পারে নি। আকাশের খুঁটি না পায় বেবু কাছে থাকলে তাকে না দিয়ে খায় না তো। সে পাটার ঘুগনিই হোক আর ঝিলিপি আমড়াই হোক।

বিয়ের পরদিন ছোটদির সঙ্গে ছোটদির শ্বশুরবাড়ি গেল বেবু। কোলকাতা থেকে অনেক দূরের পথ। ট্রেনে প্রায় তিনঘণ্টা হবে তা। কোলকাতা থেকে পৌঁছেই তবে আশ্চর্য হয়ে গেল সে। কলকাতা থেকে একদম অন্য রকম একেবারে। কলকাতার মত নয়। পাশে পাশে দালান কোঠাবাড়ি। রাস্তা বড় রুক্ষ নেই বললেই হয়। একটাও বোতাম বাড়ি নেই। শহরের বাইরে দুচারটে খোলো চালের বাড়ি আছে, যেমন গাঁগাঁয়ে আছে। চওড়া পিচ বাঁধানো রাস্তা। রাস্তায় ইলেকট্রিক লাইট। বড় রাস্তা থেকে অনেক গলি খুঁজি সব পাড়ার মধ্যে চলে গেছে। একটা হাইস্কুল হল। আর ঘোড়ার গাড়ি। শহরে গাড়ি ঘোড়ার গাড়িই চোখে পড়ল। কলকাতার মত এখানেও অভাব। ট্রাম নেই বাসও নেই। ঘোড়ার গাড়ি চেপেই বেবু দিদি জামাই-বাবুর সঙ্গে গোয়াড়িতে ছোটদিদির বাড়িতে এসে নামল।

দুই ছোট বাড়ি। একখানা ছোট্ট ঘর। সামনে একচিলতে দাওয়া। ঘরের ভিতরটা অন্ধকার। ঘরে জানলাগুলো বন্ধ থাকে। বাড়ির পাঁচিলটা খুব নিচু। এত নিচু যে পথ চলতি লোকেরা বাড়ির ভিতর সব কিছু দেখতে পায়। ঘরে ঢুকতেই একটা বিশ্রী গন্ধ পেল। ঘরে যেমন যে খাটে পায়খানাটা জায়গায় ঠিক কাছেই। ঘরে খাটখানা দিয়েছে কোনমতে দুইখানা। কিন্তু ছোটদিদির শ্বশুরবাড়িটা দেখে মনটা বিকল হয়ে গেল বেবুর।

পরদিন ভোরে উঠে খোলে নদীর ধারে যেতেই মন যেন জুড়ে গেল। বাড়ির ঠিক পিছনেই বয়ে চলে ছোট নদীটা। কি সুন্দর ঝকঝকে জল! নদীর জল যে এমন পরিষ্কার হয় তা জানত না বেবু। গঙ্গানদীর জল দেখে দেখে তার ধারণা হয়েছিল যে সব নদীর জলই বোধহয় ঘোলা মাটিবর্ণ। উঁচু বালিয়াড়ির পাড় থেকে নেমে সিঁড়ি করেছে আছে পৌঁছে জলে হাত দিয়ে দেখল হাতটা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট দেখেই। হাতের রেখা পর্যন্ত। নদীর এ পারে গাছ, বাড়ি কিন্তু ওপারে ধূধূ চাষ ধুধু করে ছড়িয়ে আছে অনেক দূরে দেখানো যাচ্ছে ক্ষেত। বেবু অবাক সেই মাঠক্ষেতের দিকে চেয়ে থাকে। চোখ আর ফেরাতে পারে না। তারপর সূর্য উঠল। পূর্বদিক লাল আলোয় ভরে গেল। সেই লালরঙের ছিটে লাগল নদীর সারা জলের বুকে, যেন সাদা দু'একটা মেঘে ছিটিয়ে পাচ্ছে। এমন করে সূর্য ওঠা আগে বেবু জীবনে এই প্রথম দেখল। গাছে গাছে পাখির ডাক। আরামের মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া। সাদা ঝকঝকে নদী জলে সূর্যের আলোর ছোট ছোট ঢেউগুলি। ওপারে দিগন্ত ছড়ানো মাঠের ক্ষেত।

দেখতে দেখতে ভাবতে ভাবতে বেবুর মনে যে অনুভূতি জাগল সেটা ঠিক কি বোঝে না সে, বোঝাতেও পারে না কাউকে। তবে হঠাৎ যেন তার খুব আনন্দ হতে লাগল। বালির উপর দিয়ে একটা ছোট্ট দুটি মানুষ শেষ সাদা বালির উপর বসে পড়ে দু হাত দিয়ে বালি খুঁড়ে খুঁড়ে খেলা করতে লাগল।

ছোটদাদাবাবুকে খালিয়া পরে তার বৈঠক দিয়ে দেখল। ছোট বাড়ি তবু খরে সাজানো তব সাজানো বৈঠক ঘর। আর প্রায় সম্পূর্ণ বাড়ি না হবার-কাছুকে দেখে অবাক হয়ে গেল বেবু। দাদাবাবুর অনেক বই ছিল। বড়দের ছবির সব বই। গল্প দেশের চোখ ধাঁধান ছবি। সেই ছবিগুলোর মত লাগল ছোটদাদাবাবুকে।

সারাদিন ধরে ছোটদাদাবাবু তাকে নিয়ে ঘুরল। একদিন সব যে অচিন ছিল। কোনটা কাদের কোথায় জান পর্যন্ত বেবু নবী। যখন কলকাতার দিকে আসার সময় হোল তখন ছোটদাদাবাবু তার কাছে চৌকিকেও দিলো। তাকে কুমোরপাড়া বাড়ি দেখিয়েছে, চার্চ, রেলস্টেশন, পুলিশ মাঠের পুকুরের সুন্দর দোকান সব দেখিয়েছে ছোটদাদাবাবু। টকি বাইস্কোপ দেখিয়েছে। খাইয়েছে চাঁপা চপ কাটলেট, চৌচি, সন্দেশ রসগোল্লা। ট্রেনে আসতে আসতেও রানাঘাটের বিখ্যাত পান্তুয়া আর ভাজাভুজি। ছোটদিটা কিছু খায় নি। শুধু ঘোমটা দিয়ে এককোণে জড়সড় হয়ে বসে থেকেছে। বাড়ির দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

বেবুর মনে হয় ছোটদিদিটা বড্ড বোকা। সাধ্যমত খাবার কেউ ছেড়ে যায় নাকি।

বোকো

ভোলানাথ পাল নিজের পত্নীটির ঘড়া দুহাতে পেয়েছিলেন। বিভাবতীকে বলেই দিয়েছেন যে এই সময়টা কাটলেই তিনি বেগে চলে যাবেন তিন-চারেক যত। আর পারবেন না। বাড়ি থেকে আবদার মাত্র একপো পথ দূর। সেটুকুও একটানা হাটতে পারেন না তিনি। দুতিন বার বসতে হয়।

বিভাবতী ভাবতেও পারেন না বেশ বেশ কি হবে তাদের অবস্থা, কে দেখবে? তাছাড়া অফিস যাওয়ার খরচ সে কথা তো ভোলানাথ পালই সংসারের সব বাচ জান্। তবে?

ইতিমিত নতুন করে সমস্তই ভোলানাথ

বলেন, 'এবার হাবুকে ইস্কুলে ভর্তি করার কথা ভাবো বউমা। সাত বছর পেরিয়ে গেছে আর দেরি করা উচিত নয়।'

বিন্দুবতী বলল, 'কাকে দিয়ে ভর্তি কোথায় পাঠাব?'

'কেনো, তোমার ভাইপো মহেন্দ্রকে দিয়ে।'

'কোন ইস্কুলে?'

'হ্যাঁ, ওটাই ভালো নাম করা ইস্কুল এ অঞ্চলে। আচ্ছা হাবু যাও তো একবার বস্তিতে বড় ছেলেটাকে ডেকে আন তো। ওতো পড়ে একই ইস্কুলে।'

বস্তিটা ঠিক পাশের মুখেই থাকে। তাদের চায়ের দোকান আছে। চায় বৃষ্টি পড়ে চালে। তাদের বাড়ির বড় ছেলের ডাক নাম হাবু। সারা বস্তির মধ্যে লেখাপড়ায় সে যা বললেই হয়। হাইস্কুলে পড়ে প্রতিবছর ভালভাবে পাশ করে।

হাবুকে ডেকে আনল বেনু।

তোতারাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে, তোমার নামটা ভালো কি? 'আজ্ঞে হাবু,' শান্ত ছেলেটি মাথা নিচু করেই জবাব দিল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ হাবু হাবু। তা হাবু ভাই, এখন কোন ক্লাসে পড়ছো তুমি?'

'আমি? ফোর্থ ক্লাসে।'

'বাঃ বাঃ, তার মানে চার-বছর পরেই এন্ট্রান্স?'

'আজ্ঞে এখন বলে ম্যাট্রিকুলেশন'।

তোতারাম হেসে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ এখন আধুনিক নাম।' আর বিনয় হাসি হাসল হাবুও।

'তোমার এখানে মাইনে কত?'

'মাসে চার টাকা। অবশ্য আমি ফ্রিতে পড়ি।'

'চার টাকা। আর কিছু লাগে?'

'কোন ক্লাস?'

'এই যে সেভেন্থ এইট্থ ক্লাস।'

'সেভেন্থ দু'টাকা।'

তোতারাম একটু চুপ করে রইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন 'প্রথম কিছু ক্লাসে ভর্তি হতে গেলে কত লাগবে আর?'

মনে মনে হিসেব করল হাবু, তারপর বলল, 'এডমিশনের মাইনে' এডমিশনের মাইনের সমান এ্যাডমিশন ফি, পাখা ফি একটাকা, স্পোর্টস ফি একটাকা, বিল্ডিং ফি একটাকা, ম্যাগাজিন একটাকা। এই টাকা লাগবেই মনে।'

'তুমি কাল নিজে করে বেনুকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিতে পারবে?'

'তা পারবো না কেনো? কোন ক্লাস?'

'এই সেভেন্থ এইট্থ যেটা মাষ্টার-মশাইরা ভালো বুঝবেন তাই কি!'

'বেশ নটার সময় কাল তৈরি থাকিস বেনু, নিয়ে যাবো।'

হাবু চলে যেতে তোতারাম পরম বেনুর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'দাদুভাই, কাল তোমায় ইস্কুলে ভর্তি হতে হবে যে।'

বেনু দাদুর বুকে মুখ গুঁজল।

বিন্দুবতী ঘোমটার আড়াল থেকে বলল, 'অতটাকা আসবে তো কোথায়'—

তোতারাম বললেন, 'তার জন্যে তোমার ভাবতে হবেনা বউমা।'

'কিন্তু এ্যাখন আপনার শরীরের অবস্থা। টাকার যে অনেক দরকার'—

একটু বিরক্ত হয়েই বললেন তোতারাম, 'যা বলে ভাবনা ভাবো তুমি বউমা। কাল নটার মধ্যে হাবুকে পাঠিয়ে দিতে দেখি মনে রেখে দ্যাখ।'

পরদিন গায়ে কাচা ইস্তিরিহীন জীর্ণ-শার্ট হাফপ্যান্ট, ইলাস্টিক দেওয়া কালো রঙের আগাগোড়া ইজের আর পাড়ার ফেরিওয়ালাদের কাছে পুরোনো দামে কেনা জাপানী চটি পায় লোকের ভেতর থেকে চুকলো পিতামহ ভেতর থেকে—ভবিষ্যৎ পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করে বেনু হাবু-দাদার সঙ্গে হাইস্কুলে ভর্তি হতে গেল।

মাষ্টার মশাই পরীক্ষা করে বললেন, 'একে সেভেন্থ ক্লাসে ভর্তি করা যায় তবে অঙ্কটায় একটু কাঁচা হয়ে পড়ছে—'

হাবু বলল, 'আপনি স্যার এইট্থ ক্লাসেই ভর্তি করে দিন।'

'কত বয়স?'

বেনু দাদুর কাছে যেমন শুনে এসেছিল অর্থাৎ তারিখ ও চুকলো সনটা দিন মাষ্টার মশাইকে।

মাষ্টার মশাই বললেন, 'আর একটু ছোট হলে [illegible] তাহলে ঐ ক্লাস কেন? এইট্থ ক্লাস নাই কি? কি বল?'

হাবু মাথা নেড়ে দিল।

হাবুকে ক্লাসের ঘন্টা পড়ে যেতেই সে তার ক্লাসে চলে গেল। বেনুকে ভর্তি করে দিয়ে [illegible] ক্লাসে পাঠিয়ে দিলেন। [illegible] বেনুকে [illegible]।

এখানে [illegible] মাটিতে বসে [illegible]। 'এই [illegible]' [illegible] বলছেন তাকেই বলছেন বুঝতে পারে কি বেনু। পাশের বসা মোটা ছেলেটা কনুইয়ের খোঁচা মেরে বলল, 'এই ইংরেজ, তোমায় বলছেন।'

থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

'কি নাম তোমার?'

নাম বলল।

'ঠিকানা?'

বেনু ঠিকানা বলল।

'কি জাত? কায়স্থ?'

'না ব্রাহ্মণ'।

'ও।'

একটা হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'কুমোরের আগুনে কি জাত যায়?'

'কুমোর। বাবা হাঁড়ি কলসী গড়ে।'

'আর বাবা ঠাকুর গড়ে?'

'তাও। আচ্ছা রেণুও আমাদের এই ক্লাসটা কিনেছে নাকি?'

রেণু ঘাড় নাড়ল। জানে না সে।

'জানবেনই জেনো।'

রেণুর আছে ছবিখানা। ইংরিজি অক্ষর শক্ত শব্দের মানে জানে না সে। সে পড়েছে ক্যাট মানে বেড়াল আর ব্যাট মানে যেটা দিয়ে খেলে অর্থাৎ খেলার মার।

'বুঝলে কিছু?'

'না'।

'শুধু না হাঁ বলে না। মাস্টারমশাই কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলতে হয় না স্যার, হাঁ স্যার। বুঝলে?'

'হাঁ—' তার অনেকক্ষণ পরে বলল, 'স্যার।'

এটা হোল বড় পরিচয়ের ক্লাস। কিছুদিন থেকে তার নাম বলতে হবে ইংরিজিতে।' মাস্টারমশাইয়ের টেবিলে কতকগুলো খেলনা ছিল। তার মধ্যে একটাকে তুলে ধরে বললেন, 'এটা কি বলত?'

'রেলগাড়ি', রেণু বলল।

'হাঁ তবে ইংরিজিতে বলতে হবে ট্রেন এ ট্রেন। বুঝলে?'

রেণু এবারে হাঁ সূচক ঘাড় নাড়লে।

'সিট ডাউন বোস। বোস।'

বেলা একটার সময় টিফিন হল। রেণু দেখল ইস্কুলে বোর্ডিং আর ছেলেরাই বেশ জামা কাপড়, বেল্ট দিয়ে বাঁধা হাফ প্যান্ট, পায়ে মোজা, চামড়ার বুটজুতো পরে স্কুলে আসে। আর প্যান্টগুলো বাদিকটা কাটানো। তার বাবার মত কালো খাটো নয়! রেণির তার ছেলের বাবা আর, অনেক ফর্সা ফর্সা ছেলে। যে মোটা ছেলেটার পাশে সে বসেছিল তার গায়ের চামড়া কি জেল্লা কি চকচকে। টিফিনের হাত-ভরা তার পাশে ভরলো ভরলো খাটি খাটি। সরতে সরতে লজ্জা পেয়েছিল রেণু। হাত দুটো আর রেখে রাখে নি।

টিফিনে অনেক ছেলে বাড়ি থেকে টাকায় খাবার এনেছে। বড় বড় লাঞ্চ বক্স ভর্তি ভুর ভাজাভাজির পাউরুটি। যাদের বাড়ি থেকে টাকা এল না তারা বাড়ি থেকে স্কুলে আসার সময় টিফিন খাবার আরে ব্যবস্থা এনেছে। সে সব থেকেও আধার তারা আলুকাবলি, বাদাম ভাজা কিনে খাচ্ছে।

রেণুকে মা একটা পয়সা দিয়েছিল। গুটি গুটি নিচে গেল সে। খুবই পেট বড়। ট্যাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে আর পয়সায় বাদাম ভাজা কিনে খেতে লাগল।

জল খেয়ে যখন ক্লাসে জায়গায় এসে বসল ফর্সা মোটা ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কোথায় থাকিস রে?'

রেণু ঠিকানাটা বলল।

ছেলেটা বলল, 'বস্তিতে?'

রেণু কোনমতে 'হাঁ' বলল। কিন্তু সুখন ছেলেটা যেন ঠিকানা শুনে তার কাছ থেকে একটু দূরে সরে বসার চেষ্টা করল।

সারা সময়টা তার অস্বস্তিতে কাটল। মনে হতে লাগল এই ঘরে এই ছেলেদের পাশে সে বড় বেমানান। সে ছোট। এদের থেকে সব বিষয়ে ছোট। এরা বস্তিতে থাকে না। এরা উঁচু জাত এরা বাড়িতে জামা, বেল্ট বাঁধা প্যান্ট পরে। চাকরে এদের খাবার এনে দেয়। বড় বড় বাড়ির খুব বড় বড় লোক।

বাবা কিছু বলেই চলে গেল রেণু আধা সময়টা।

বাবুর সঙ্গেই ফিরল বাড়িতে।

বিন্ধ্যবাসী জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে ভর্তি হ'লি?'

সে বলল, 'হাঁ, জানো মা, ওটা খুব বড়লোকদের ইস্কুল।'

'কি করে বুঝলি?'

'সব বাদি জামা আর প্যান্ট পরে আসে। সব ছেলে বেল্টবাঁধা প্যান্ট পরে আসে। পায়ে বুট জুতো। আমার এই ইজের পরে ওদের পাশে বসতে লজ্জা করছিল। আর টিফিনের সময় ছেলে কেউ কেউ আসে, কি সুন্দর দেখতে ছেলেগুলো—'

'ভালো হবেই। জ্যাঠো যে তোর দাদামশাই তোকে ওই ইস্কুলে ভর্তি করেছেন। দু টাকা করে মাইনে আমি কি করে টানবো মাসে মাসে?'

রেণু স্কুলের জামা ইজের ছেড়ে বাড়ির জামা ইজের পরে বাবার আনা বুকলিস্টটা দেখিয়ে বলল, 'এই লিস্ট দিয়েছে মা। বই কিনতে হবে। সাতখানা বই।'

'সাতখানা? কত দাম?'

'তা জানি না। বাবুকে জানাবো।'

'দেখিস, কিছু আর ভাবিস! এবার থেকে সবই তোমার একা একা যেতে হবে বাবা!' বলে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল বিন্ধ্যবাসী।

'জানো মা

'তোমার দাদামশাই দেশে যাচ্ছে।'

'তা গেলেই বা, দেশ থেকে তো ফিরে আসবে।'

বিন্ধ্যবাসী বলল, 'আর ফিরে আসবে না রে রেণু। সেখানেই থাকবে। পায়ীটা ওরার যে বড্ড বেড়ে পড়ছে। কাজখানা উঠিয়ে দিচ্ছেন।'

এ আশার কি কথা মা তাকে বলতে? রেণুর মাথায় ঢুকছিল না। প্রতিবার বছরের শেষে এক সপ্তাহ দশ দিনের জন্য দাদামশাই দেশে যায় আবার ফিরে আসে। দাদু যদি আর না ফিরে আসে তাহলে কার কাছে থাকবে রেণু? কে তাকে রোজ পাঠাতে যাবে স্কুলে? কে তার বই

নিয়ে আসবে রিক্তা কড়ি? কে তার রামায়ণ মহাভারত পাঠ শুনবে রোজ সন্ধের সময়?

বেনু এবার মায়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলে, 'ধ্যেৎ, সব বাজে কথা, তাই না মাগো?'

বিভাবতী একটা সরস্বতীর হাতের আঙুল খুলছিল। কিন্তু চোখের জলে সব ঝাপসা। কোথায় কি খুলছে দেখতে পাচ্ছিল না সে। বিভাবতীর কাছে উত্তর না পেয়ে তার চোখে জল দেখে বেনু বুঝল এটা বাজে কথাও নয় ঠাট্টাও নয়। বলল, 'আমরা তবে একলা থাকবো?'

বিভাবতী ঢোঁক গিলে ধরা গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

এবার বেনু মায়ের গলাটা দু হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে বলল, 'আমি দাদুকে যেতে দোব না, কিছুতেই দোব না মাগো— কিছুতেই না—আমি জোর করে ধরে রেখে দোব। তুমিও দিও না মাগো, তুমিও রেখে দাও বল।'

বিভাবতী আর চাপতে পারল না কান্না। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'আর ওসব জোর দেখাবি বেনু। উনি কি তোর নিজের দাদু যে জোর দেখাবি! কালকেই না থাকবেন হয়তো।'

বেনু ভাবে দাদামশাইয়ের বেশ আছে কৃষ্ণনগরে। দাদামশাই সেখানে যায় মাঝে মাঝে। সেখানে ঠাকুমা আছে, কাকা আছে যাকে দু একবার দেখেছে সে। কিন্তু এ সময়ে বেনু বিশেষ কিছু ভাবে নি এতদিন। কিন্তু তারাই যে তাঁর নিজের আর বেনুর দাদু তার নিজের নয় একথা এমন স্পষ্ট করে কারো কাছে এর আগে সে শোনে নি। কেমন যেন সব গুলিয়ে গেল তার কাছে। ও দিকে বিভাবতী উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

বিভাবতী দেখল ছেলের দিকে। দাদা-মশা হাত তোলে ধরে ধুয়ে ছেলের কাছে গেল। বেনুর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল 'কাঁদিস নি বেনু। উনি কি আর ইচ্ছে করে যাচ্ছেন রে—আর যে পারছেন না। শরীরটা যে ধসে ভেঙে পড়ছে। পাছে আমাদের ওপর বোঝা হয়ে যান তাই চলে যাচ্ছেন। শেষ সময়টা কাটাবেন গিয়ে নিজের ছেলে মেয়ে আত্মজনের কাছে। তাদেরও তো ইচ্ছে করে দুটো দিন সেবা করে যাবার।'

বেনু এসব শুনতে পেল বটে কিন্তু মাথায় গেল কিনা বোঝা গেল না। ও যেমন ছিল তেমনিই রইল। বিভাবতী আবার সংসারের কাজে মন দিল।

সন্ধেবেলা চারিদিকে শাঁখ বেজে উঠল। সন্ধ্যাও নেমে এল বস্তিতে। বেনু তখন চুপ করে জানলার সামনে দাঁড়িয়েছিল। রোজ দুটো বেই হাতের মত সামনেই একটা সরু কাঁচা গলি দু বাড়ির ফাঁক দিয়ে গিয়ে কর্পোরেশনের পোতা বাঁধানো রাস্তায় পড়েছে। রাস্তার ওপারে একটা উঁচুতে ল্যাম্পপোস্টের কিছুটা দেখা যায়। একটা গ্যাস বাতি। কর্পোরেশনের লোক এসে সেটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।

ভোলানাথ হাঁপাতে হাঁপাতে খবি করে কাপড়খানা রেখে ফিরলেন। চৌকিতে বসার সঙ্গে সঙ্গে বিভাবতী হাতপাখার বাতাস করতে লাগল।

অন্যদিন ভোলানাথ আসার সঙ্গে সঙ্গে বেনু এসে দাদুর কোলে মাথা দিয়ে চৌকিতে শুয়ে নানা কথা বলে। বিভাবতী ভোলানাথের কষ্ট হবে ভেবে সরে যেতে বলে তাকে কিন্তু সে গ্রাহ্যই করে না দাদুর নিষেধ।

হাঁপের টানটা একটু কমলে ভোলানাথ বিভাবতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদুভাই কই, নেই বাড়িতে?'

বিভাবতী বলল, 'ঘরে আছে।'

ঘরে? বিস্মিত হলেন ভোলানাথ। বললেন, 'তোর হাত দেখি।'

বিভাবতী ঘরে ঢোকার মুখে ভোলানাথ বললেন, 'বইয়া পাঁজিগুলো ঠিক আছে তো? আশ্বিনে যা শেষ করেছে আজ। বোধহয় কাজে জল হবে। একটু খুলে দেখো। পোষ মাস, এখনো শীত পড়েনি তেমন। আর যদি বিষ্টি হয় তাহলে পড়বে।'

বিভাবতী প্রায় জোর করেই বেনুকে দাদুর কাছে পাঠাল।

ভোলানাথ তাকে দেখে আরো অবাক। একেবারে চুপচাপ। মাথা নিচু। মুখখানা চিবুক ধরে তুলে দেখলেন, কান্না কান্না।

'কি হোল দাদু? ইস্কুলে কারো সঙ্গে আড়ি হোয়েছে তো? মাস্টার বকেছে? কি পড়া বলেনি মাস্টার মশাই? কি হোল বল; বলবে না কথা বলবে না? ও মা বকেছে বুঝি? না মেরেছে বুঝি? দাদু, ও দাদু, বল উত্তর কি হোল, আমার পড়বে—'

হঠাৎ কান্না চেপে ধরে বেনু চিৎকার করে উঠল। ছিটকে এল দাদুর কাছ থেকে।

'না, বলবো না, কিছু বলবো না তোমায়। আবার বলবো? তুমি কি আমার নিজের দাদু যে তোমায় বলবো, তুমি তো থাকবে না, দেশে চলে যাবে, আর ফিরে আসবে না, তবে আবার বলবো আমার পড়া হোক না হোক তাতে তোমার কি—বলবো না, কিছু বলবো না। যে নিজের লোক নয় তাকে আবার বলবো!' ছুটে গিয়ে ঘরের খাটে আবার উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে লাগল বেনু।

ভোলানাথ বুকটা বাঁ হাতে চেপে বসলেন। একটা তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে সেখানে। হাঁপটা আবার বেড়ে গেল।

বিভাবতী তাড়াতাড়ি হাতপাখার

খাওয়ান করতে লাগল। তোমানাথকে বাচ্চাটা নামলে খেয়ে খেয়ে বললেন। তোমানাথ, 'আমি যে এক দিনের বাচ্চু নই একথা আজ হঠাৎ ও বলল ক্যানো? তুমি কি কিছু বলেছ বউমা?'

বিভাবতী ছেলের আড়ালে লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেছে। অস্ফুটস্বরে বলল, 'আমি কিছু তো বলি নি, কথায় কথায়—

'আমি জানি। তুমি লাজ মাহুর খুঁটি-নাটি একটু বল। যাক্, ভালোই হয়েছে। কালকেই তো পারতো দু দিন আগে আর নয়'।

তোমানাথ সে রাতে কিছুই খেতে পারলেন না। বড় হাসি পাচ্ছে লাগল, রামাবীর টাক ছুঁয়ে বয়স থেকেই খেতে থাকল। বিভাবতী বলল ডাক্তার ডাকার কথা। উনি মানা করলেন। ছটফট করতে করতে একসময় একটু ঝিমিয়ে পড়লেন, আর সেই সময় অবচেতনে দুটি নয়ন আকাশ ছোঁয়। বিভাবতী হাওয়ার পাখাগুলো টেনে নাড়িয়ে দিল।

সারা বাড়ির ছাদ সারানো হয় নি এখনও। আর্দ্ধেক খোলা ছাদে আছে আর বাকিটা টালি করে করে খোলা লাগিয়ে বড় বড় ফাঁক করে রেখেছে চালে। তৃতীয় পক্ষে লাগে না বোধ ভেঙে যাচ্ছে। হাতিছুটি বাঁকড়ি ঘেঁষে কাঁথা মাদুর যখন পেরেছে সামলে নেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল বিভাবতীর পক্ষে।

মুখের রেণুর গায়ে জল পড়ছে। তাকে সরিয়ে দিল অন্য জায়গায়। কিন্তু সেখানেও জল পড়ছে।

বাইরে এসে তোমানাথকে বিভাবতী দেখল, না এ বিছানায় অন্তত জলটা পড়ছে না। রেণুকে ডেকে বলল, 'রেণু ওঠ, উঠে দাদুর বিছানায় শুগে যা—রেণু—'

রেণু উঠে ঘুমচোখেই দাদুর বিছানায় গেল। দাদুকে ধাক্কা দিয়ে ডাকল 'দাদু ও দাদু, একটু সরো আমি শোব যে। দাদু ও দাদু—'

তোমানাথ হঠাৎ 'এ্যা' বলে ধড়মড় করে উঠে বসতে গেলেন, রেণু বলল, 'উঠতে হবে না সর একটু সরে শোও—'

তোমানাথ জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, 'হবে পারে—আবার হবে—' বলতে বলতে বিছানায় পড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগলেন তিনি। রেণু ভয় পেয়ে মাকে ডাকল, 'মা। মা শিগগির এসো শিগগির। দাদু গোঁ গোঁ করছে ক্যানো, দাদু ও দাদু—'

হারিকেন নিয়ে ছুটে এল বিভাবতী। তোমানাথের চোখ দুটো খোলা কিন্তু বাইরে দেখছেন বলে মনে হোলনা। অদ্ভুত রকম আওয়াজ হচ্ছে গলা দিয়ে। ঠোঁট দুটো একবার খুলছে আবার বন্ধ হচ্ছে।

বিভাবতী খুব জোরে খাবান করতে করতে বলল, 'রেণু শিগগির ঝাউতলায় ডাক, ছুটে যা—' কথাটা বলতেই উঠোন পার হয়ে মধ্যবালার দাওয়ায় গেল রেণু।

মধ্যবালা তোমানাথের অবস্থা দেখে বললেন, 'বউ, শিগগির গঙ্গাজলের ঘটিটা নাও কম শিগগির।'

বিভাবতী তাড়াতাড়ি খুঁজে পেতে গিয়ে ঘটিটা নিয়ে এল।

মধ্যবালা রেণুকে বললেন, 'রেণু, দাদুর মুখে জল দাও।'

রেণু দাদুর মুখে জল ঢালতে লাগল। মধ্যবালা বললেন, 'বল গঙ্গা নারায়ণ হরি।'

রেণু কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'গঙ্গা নারায়ণ হরি।'

পুরো দুটো চোঁক অনেক গলায় গেল না। রেণু যেমন দাদুর জল দেয়ে সব জলটা গড়িয়ে গেল। মুখটা হাঁ হয়ে স্থির হয়ে গেল। চোখদুটো খোলা। যেন বড় বড় চোখে তোমানাথ আকাশই দেখছেন।

রেণুও বিস্ফারিত চোখে দেখিয়ে চেয়ে রইল। আর হয়ে চোখের ওপর এই প্রথম মৃত্যু দেখল রেণু।

সতের

রেণু ঘুম থেকে উঠেই চলে যায় বাবার বাড়ি। সকালে সার পড়া না পারিয়ে যায়। ওখানে রেণুর বড়মামার ছেলেমেয়ে অনেক রেণুকে ধুলে উঁচু ক্লাসে পড়ে। রেণুর পড়াশোনা সে একটু দেখিয়ে দেবে এই ভরসা। রেণু নিজে কিন্তু সে ভরসায় যায় না। তার ভরসা সকালের এক কাপ চা। তোমানাথ গান রেণুর এই অভ্যাস-টিকে নেশায় পরিণত করে দিয়ে গেছেন। চন্দ্রনাথ বাড়িতে থাকলে চায়ের পাট থাকতোই হোত। চন্দ্রনাথ মারা যাবার পর তোমানাথ যেতেন দোকানে। রেণু হাঁটতে শেখা ইস্তক সে দাদুর সকালে চায়ের দোকান যাওয়ার সঙ্গী। ইদানীং যখন ও একা একা দোকান যাতায়াত করতে শিখেছিল তখন রোজ দু কাপ চা সকালে রেণুই কিনে নিয়ে আসত। এককাপ দাদুর এককাপ নাতির। যদিও এক পয়সা দাম হয় কিন্তু প্রত্যহ রোজের নেশায় এ পয়সা খরচ করার ক্ষমতা নেই বিভাবতীর। তোমানাথ মারা যাবার তিন চার মাসের মধ্যে প্রথম বন্ধ হয়েছে গৃহদেবতার নিত্য-পূজা। দ্বিতীয় রেণুর আবদারমতো ভরে ভূত খাওয়া।

বড়মামার বাড়িতে সকালে বেলায় চা। ভোর পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটা আগে উঠে রেণুর বিছিয়া দুটো উনুনে আঁচ দিয়ে দায়। একটা বেশ বড় উনুন, অন্যটা একটু ছোট। বড়টায় সারা দুপুর ছোটটায় আমি গরম জল ফোটে। চায়ের জল। বাড়ীর হাঁড়ি চড়ানোই থাকে। যে যখন খুশি আসে বিছিয়া চা করে দিচ্ছে তাকে।

বড়মামা ভোরবেলা উঠে বিছানায়

বসে কাপের পর কাপ চা আর একটার পর একটা বিড়ি কিংবা সিগারেট টেনে যায় বেলা আটটা পর্যন্ত। তারপর তাকে যেন ভূতে তাড়া করে। আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে প্রাতঃকৃত্য স্নান আর দুকাপ চা খেতে খেতে মুড়ির ভিতর গুঁজে পকেটে শার্ট পরে। পায়ে পাম্প জোড়া গলিয়ে কোনরকমে গলায়। তারপর হাতে ছাতা নিয়ে যত রকম ঠাকুরদেবতার নাম মনে আসে উচ্চারণ করতে করতে দৌড়তে থাকে। কেন যে বড়মামা আড়াই ঘণ্টা বিছানার ওপর বসে থাকে চুপ করে আর কেন যে আটটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত এত হুড়োহুড়ি করে অফিস যায় তা দেবুর বুদ্ধির অগম্য।

দেবু বড়মামার বাড়ি থেকে পড়াশোনা করে। প্রথমে শুরু করতে হয় পড়াশোনার আর মনপুত জোর দিয়ে। চোখ বুঁজে হাত জড় করে একটা সূর্যস্তব বলতে হয়। এটা স্কুলের পড়া নয়। বড়মামার বিশেষ ফরমান। বাংলা পড়াটা বড়মামা শোনায়, মানে বলে দ্যায়। ইংরিজিটা তার যেন ছেলে। মহেশ্বর মাস্টারমশাই আসেন সাড়ে-চার সময় তারপর আর তাকে বিরক্ত করা যায় না।

মামার বাড়িতেই স্নান খাওয়া সেরে নিয়ে ওখান থেকে স্কুলে চলে যায় দেবু। মামার ভায়েরা সকালের দিকে বিছানাছাড়া হয় না। দিদিমার রান্না কিন্তু অদ্ভুত। রোজ একরকম রান্না। এক হাঁড়ি ভাত, এক হাঁড়ি মুসুর ডাল আর এক কড়াই পোস্ত চচ্চড়ি। ব্যাস! যত পারো খাও। সবাই তাই খেয়ে আপিস স্কুল করে।

অথচ তাও। দিদিমা কি মাছ রান্না কিছু জানে না। তবে কখনো বন্ধ থাকে না। রোববার। কারণ প্রত্যেকদিন সকালে মামাবাড়ি ঢোকার মুখে দেবু দ্যাখে ভাত মুসুর ডাল আলুপোস্তচচ্চড়ি ডেকচির ওপর কাঁট করে ঢাকা আছে।

ক্লাসে গিয়ে একটা কোণ বেছে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে দেবু। মাস্টারমশাই-দের বিশেষ নজরে পড়েনা সে। পড়তেও চায় না। স্কুলে ঢুকলেই একটা অদ্ভুত ভীমভয়তায় পেয়ে বসে তাকে আর সেই-জন্যে কেউ তার সঙ্গে প্রথমে কথা না বললে সে কোন ছেলের সঙ্গে যেচে কোন কথা বলে না।

একদিন বাংলা ক্লাসে মাস্টারমশাই তাকে পড়া ধরলেন। দেবু কিছুই বলতে পারল না। খুব নিচু ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

'কি হোল, পড়েছো না পড়নি?'

ও তেমনি ভাবেই বলল, 'পড়িনি স্যার'

'ক্যানো পড়নি ক্যানো শুনি—'

কোন কথাই বলল না দেবু। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। জবাব না পেয়ে মাস্টারমশাই খুব রেগে গেলেন। দেবুকে বললেন, 'দাঁড়াও—দাঁড়িয়ে থাক। ক্লাস আর অন্য দিকে। বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে থাক। পড়া করবে না চালাকি পেয়েছ।'

সারা ক্লাসের সামনে বেঞ্চির ওপর দাঁড়াতে তার লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল সেদিন। খুব ভুলতেই পারে নি।

ঘণ্টা শেষ হলে মাস্টারমশাই চলে গেলেন। যাবার আগে অবশ্য তাকে বসিয়ে দিয়ে গেলেন।

'বসে পড়। পরের দিন পড়া না করলে আরো কঠিন শাস্তি পাবে মনে থাকে যেন ব্যাস।'

দেবু যখন হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছছে তখন পাশের ছেলেটা বলল 'কাঁদছিস ক্যানো? এই দেবু।'

দেবু কথা বলল না।

ছেলেটা বলল, 'আরে তাই তো বলছি কি হোলো তবে কাঁদছিস ক্যানো? লেগেছে তোর যে কাঁদছিস?'

দেবু চুপ।

ছেলেটা বলল, 'পড়া করিস নি ক্যানো তাহলে?'

'আমার বইয়ে ও গল্পটা নেই,' এবার কথা বলল দেবু।

ছেলেটা বলল, 'নেই কিরে? তা আবার হয় নাকি? সকলের তো আছে বই। কই দেখি তোর বই।'

দেবুর কোন বইয়ের বাঁধাই নেই না কাগজে মোড়ানো মলাট নেই। হাতে করেই বই খাতা নিয়ে আসে।

ছেলেটা বইগুলো দেখে বলল 'এই তো পুরোনো বইয়ে তোর।'

'হাঁ।'

'নতুন বই কিনিস নি?'

'দু একখানা। এখনো সব অন্য ছেলের থেকে পাওয়া।'

বাংলা বইটা খুলে দেখল পাশের ছেলেটা। অবাক ঠেকল। বলাই প্রথম পাতা মলাটের কিছু নেই। অনেক খুঁজে খুঁজেও সে গল্পটা পেল না। যে জায়গায় গল্পটা থাকার কথা সেখানে কতগুলো পাতাই নেই। একদম গ্রামের পর একেবারে চারটিন পৃষ্ঠা। ছেলেটা বলল, 'এই যদি বইটা পড়িস ক্যানো। এর তো সব পাতা ছেঁড়া।'

দেবু আস্তে আস্তে বলল, 'মা কদিন পরে কিনে দেবে বলেছে—'

ছেলেটা বলল, 'তোর মা বুঝি বই কিনে দায়? বাবা বুঝি না?'

'বাবা মরে গ্যাছে।'

'ও'

টিফিনের ঘণ্টা পড়তে ছেলেটা বলল, 'দেবু আয়।'

সে বলল 'কোথায়'

'আয় না খাবার খাবো।'

বেনু ভাবেনা। বলল, 'পয়সা নেই আমার কাছে।'

'আমার কাছে আছে—'

'তুমি খাওয়ালে আমি খাবো না—'

ছেলেটা ওর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বলল, 'তুই না একেবারে ইয়ে চ চ।' অগত্যা সঙ্গে গেল সে। বাহার কিনে খাওয়ার মিঠাই একটা সামনে চাতালে বসে খাবার খেতে খেতে ছেলেটা বলল, 'তুই আমার নাম জানিস তো?'

'হুঁ।'

'কি বলত?'

'প্রহ্লাদ ভট্টচার্য।'

'হ্যাঁ। আচ্ছা বেনু তোরা খুব গরীব না?'

বেনু বলল 'হুঁ।'

'তুই একটা কাজ কর। আমার বাংলা বইটা নে।'

বেনু বলল, 'যাঃ, তা কি করে হয়। তুমি তাহলে কি পড়বে? পড়বে কি করে?'

'আমার আরো বই আছে।'

'আর বই দুখানা?'

'না, আমার দুখানা নয়, দিদির। দিদি আমার থেকে দোটো ক্লাস বড়। সেও তো হাল ছেড়ে পড়ে আছে টেবিলে।'

বেনু কিছুতেই নেবে না প্রহ্লাদও ছাড়বে না। জোর করে দিয়ে দিল তার বইটা। বলল, 'বেশ, এখন নে তো। তোর বই কেনা হলে ফেরৎ দিয়ে দিবি।'

'কিন্তু তোমার বাবা যদি বকে।'

'বাবা আমায় বকবে? বাবা কখনো আমাদের ভাইবোনকে বকতে জানে না। দেখ তুই।'

সেই বই বেনুর কাছেই রইল। বেনুকে ফেরৎ দিতে হোল না। দুদিন পরে প্রহ্লাদ বেনুকে একটা নতুন বাংলা বই দেখিয়ে বলল, 'এই দ্যাখ।' বলে হাসল।

'তোমার দিদির বইটা?'

'দূর বোকা, এটা তো নতুন বই। এই দ্যাখ কোন নাম লেখা আছে? বাবা কালকে কিনে দিয়েছে।'

বেনুর মুখে কিছু কথা যোগাল না। চেয়ে রইল প্রহ্লাদের দিকে। প্রহ্লাদ হাসল, বলল, 'আমার বইটা তোকে ফেরৎ দিতে হবে না। ওটা তোকে দিয়ে দিলুম।'

এবার বেনু বলল, 'তোর বাবা তোকে আবার নতুন করে বই কিনে দিল। কিছু বললে না?'

প্রহ্লাদ বলল, 'কি বলবে? পরশু রাত্তিরে বাবাকে বললুম আমার বাংলা বইটা হারিয়ে গেছে কি হবে, বাবা বললে, হারিয়ে গেছে তাতে কি হয়েছে। মন খারাপ কোর না। কাল সকালে মনে করিয়ে দিও আপিস যাবার সময়। ফেরার পথে কিনে আনব। তারপর তো ও আনা হল।'

বেনু ভাবতেই পারে না একখানা বই কেউ হারিয়ে ফেললে কিনে দেয়। আর যদি সত্যিই কোন বই হারিয়ে যায় পারবে কি মাকে মুখ ফুটে বলতে বইটা আবার কিনে দেবার কথা। বাপরে! মায়ের যা মূর্তি হবে তাহলে! হয়ত বাবা থাকলে বেনুকেও কিনে দিত।

প্রহ্লাদকে সে বলল, 'তুই বাবাকে মিছে কথা বললি?'

প্রহ্লাদ ঠোঁট উল্টে বলল, 'দূর ওতে কিছু হয় না। কিছু আদায় করতে হোলে আমি আর দিদি বাবাকে কত মিথ্যে কথা বলি। দিদি তো আরো বেশি বেশি বলে। বাবা সব বিশ্বাস করে।'

'তোরা খুব বড়লোক নারে?'

প্রহ্লাদ বললে, 'বড়লোক না ছাই।' বাবা তো রেল কোম্পানীতে কেরাণির চাকরি করে।'

এর পর বেনু আর প্রহ্লাদে বেশ ভাব হয়ে গেল। স্কুলে এখন আর একা মনে হতে লাগল না। প্রহ্লাদ বাড়ি থেকে কৌটোয় করে খাবার আনে। লুচি তরকারি কোনদিন ডালা কোনদিন চিঁড়ে-ভিজোনো দই কলা চিনি দিয়ে মাখা। অনেক দিন তার থেকে কিছুটা বেনুর মুখে গুঁজে দায়। বেনু অভ্যাসমত প্রথম না না করে। প্রহ্লাদ বলে, 'মাইরি তুই বড্ড ইয়ে। খালি সব তাতে না না করিস।' বেনু যেদিন একটা পয়সা আনে খাবারওয়ালা ঘুগনি খায় সে প্রহ্লাদের সঙ্গে ভাগ করে।

খেতে খেতে সে জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁরে প্রহ্লাদ, তুই অত মাইরি বলিস কেন?'

'কি বল বলতো?'

'মাইরি তো মায়ের দিব্যি।'

'কার মা বলত?' প্রহ্লাদ জিজ্ঞাসা করল।

বেনু এবার গোলমালে পড়ল। বলল, 'মা আবার কার মা? সকলের মা, তোর আমার।'

প্রহ্লাদ বলল, 'কচু জানিস। মাইরি হোল যীশুকেষ্টর মায়ের দিব্যি। বাবা বলেছে ওটা হোল মাই মেরি। তা যীশু-কেষ্টর মায়ের দিব্যি গাললে কি হয়েছে। ওতো আর আমাদের ঠাকুর নয়, খৃষ্টানদের ঠাকুর। খৃষ্টানদের ঠাকুরের মায়ের দিব্যি গাললে আমাদের কিছু পাপ হবে না বুঝলি?'

বেনুর মনে হোল বাবা আছে বলে প্রহ্লাদ কত কিছু জানে। বাবা শিখিয়ে তার তাকে বুঝিয়ে দায়। কিন্তু বাবা নেই বলে বেনু কিছু শেখেনি, কিছু জানে না।

বিকেলে বটতলাতে খেলতে যায়। এ সময়টা লুকোচুরি খেলা হয়। চোরকে ছুঁতে পারে না বলে বেশির ভাগ হাতেই ধরা পড়ে যায়, চোর হয়।

বুঁচি অনেক সময় ধরা দিলে বেনুর বদলে চোর হয়। বেনুকে বলে, 'তুই

শুধুসে না, আমি চোর।'

পুঁটি চোর হোলে সে যাবে যে পুঁটি তাকে ছোঁবে না এ বিষয়ে সে নিশ্চিত।

একদিন পুঁটি বলল, 'তুই লুডো খেলতে জানিস বেনু?'

'লুডো, হ্যাঁ—'

'তোর আছে লুডো—?'

'আমার নেই। ছোটদার আছে।'

ছোটদা হল বেনুর বড়মামার ছোট ছেলে। তার হরেক রকমের খেলনা। পাড়ার সবাই জানে। তার সাইকেল পর্যন্ত আছে।

পুঁটি বলল, আমার বাবা এ্যাকটা লুডো দিয়েছে। আমি খেলতে জানি না। তুই শিখিয়ে দিবি?'

'হুঁ।'

'তাহলে আমাদের বাড়ি আয়।'

বেনু পুঁটির সঙ্গে তাদের বাড়ি গেল। পুঁটির মা নেই। একমাত্র সে তাকে বেরোয়। চাল খোলা তাল গোলায় যায় কুলো ধারা দিয়ে। গোলাকাড়ুনির কাজ করে অর্থাৎ ভাল চাল কুলোয় ঝেড়ে রাখে, ধুলো ময়লা পরিষ্কার করে।

কয়েকদিন লুডো খেলা চলল। একদিন খেলতে খেলতে পুঁটি বলল, 'বেনু তোর অ আ বই আছে?'

'প্রথম ভাগ? আছে এ্যাকখানা। খুব ছেঁড়া।'

পুঁটি বলল, 'আমায় দিবি?'

'তুই কি করবি? পড়বি?'

'হুঁ'

'পড়তে জানিস তুই?'

ঘাড় নাড়ল পুঁটি।

'তোর কাছে শিখব, শেখাবি?'

পরের দিন অনেক খোঁজাখুঁজির পর ছেঁড়া প্রথমভাগ খানা নিয়ে গেল বেনু পুঁটিকে দিতে। পুঁটি বইখানা উল্টে পাল্টে দেখল তারপর বেনুর কাছে উৎসাহভরে অ আ শিখতে লাগল। বেনু তার মাষ্টার। ধৈর্য আছে। পড়াশোনার উৎসাহ আছে। কিন্তু ছাত্রীর মত ধৈর্য বা উৎসাহ নেই। মিনিট দশ পরে বলল, 'বইটা থাকুক আমার কাছে। চল এ্যাখন লুডো খেলি'।

সন্ধ্যের পর জোলাদাদের পাশের চৌকিতে বসে বই পড়তে পড়তে মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়। এ সময়টা খালি মনে পড়ে বাবুর কথা। রামায়ণ মহাভারত পড়ার কথা। সন্ধ্যেবেলা বাবু ফিরে এসে তাঁর কোলে মাথা দিয়ে শোওয়ার কথা।

পড়া ভাল লাগে না। ভাল লাগে না বসে বসে অঙ্ক কষতে। মাকে বলে, 'মা চল না একটু বড়মামাদের বাড়ি।'

বিভাবতী বলে, 'হঠাৎ বড়দের বাড়ি যাবো? পড়াশুনো নেই?'

'হয়ে গ্যাছে চল না।'

বিভাবতী বলে 'না। দেখছো না বাক্সয় পুতুলগুলো নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি। মাস্টি কালই শেষ করে উঠতে পারিনি। কবে যে শাড়ি বানাবো আবার তুমি পরবে।'

বিভাবতীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে বেনু। মা একমনে পুতুলের কাজ করে চলেছে। আশ্চর্য, মায়ের কাজ ছাড়া কি কিছু নেই। বড়মামা চলে গ্যাছেন বড়দের বাড়ি অধকর্তা হয়েছে। মায়ের এখন দিন রাত শুধু পুতুলের কাজ। বিভাবতী বামুনের বিধবার মত নিষ্ঠার সঙ্গে বৈধব্য পালন করে চলেছে। মাছ মাংস পিঁয়াজ কিছু খায় না। একাদশী অমাবস্যা পূর্ণিমা আরও কত কি যে উপবাস পঞ্জিকায় লেখা আছে সবগুলো মানে। তার উপর বেনুর জন্য একাহারী। এখন রান্নাবান্নার হাঙ্গামা কম। দুপুরে গরম ভাত থেকে শাক সব্জী কিনে নিয়ে এসে রান্না করে। বেনুর জন্যে মাঝের রুটি একটু আলুর তরকারী বা কুমড়োর তরকারি করে রাখে। যেদিন কাউকে দিয়ে বাজার থেকে এক পয়সার মুড়ো চিংড়ি বা চুনো মাছ আনাতে পারে সেদিন তো মহাভোজ বেনুর।

রাতে রুটী তরকারি খেতে খেতে বেনু মাকে জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা মাগো, তুমি যে রাত্তিরে খাওনা খিদে পায়না তোমার?'

বিভাবতী ছেলের দিকে তাকায়, বলে, 'না, অনেক কালের অভ্যেস।'

তা সত্যি। বিভাবতী আজাইটে বিয়ের আগে কখনো রাতে খায় না আর খায় যেমন চারটে খেয়ে পাখিটার মতো।

বেনু বলে, 'আমার জন্যেই তোমাকে এত কষ্ট না মা!'

'কষ্ট তো কমবে। পাকা বুড়ো!'

'আমি একটু বড় হোলেই ঠিক আসামীঠি দিয়ে মানসিক শোধ করে হাতে ধরা ছাড়িয়ে আনবো মা, দেখো—নিশ্চয় পারবো।'

বিভাবতী ছেলের দিকে চাইল। বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস। সেটাকে চেপে মুখে করুণ একটা হাসি ফুটিয়ে সে ছেলেকে বলল, 'বেশ তো এসো। আগে বড়ই হও তো।'

আঠার

কিছুদিন স্কুল যাতায়াত করার পর বেনুদের জগৎ দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। একদিকে বস্তি ও তার পরিবেশ। পুঁটি, আরতি, দুর্গা, নিতাই, দুলো, বদ্যিনাথ অন্যদিকে প্রস্থান ডিগ্রীর আনন্দ বাড়ীর ইত্যাদিকে নিয়ে স্কুলের জগত। ঐ আট-দশ বছরের মধ্যে দুটো জগতের তফাৎ পরিষ্কার বুঝতে পারে সে। একেবারে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা দিক। তাই এ জগতের লোকের কাছে ও জগত সম্বন্ধে কোন কথা বলে না। আবার ও জগতের কারো কাছে এ জগতের সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করেনা। স্কুল থেকে ফিরে পড়ার থেকে সরে আলাদা থাকার চেষ্টা করে কিন্তু তা পারে

না। সহপাঠীরা কেউ কেউ তার সঙ্গে যেচে মেশে। তাকে তাদের সমগোত্রীয় বলে ভাবে। বেণুর দ্বিধা সংকোচ ধীরে ধীরে কাটিয়ে দেয় তারা। বস্তিতে যখন বস্তির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতে যায় তারাই কেমন যেন দূরে দূরে থাকে। কথায় কথায় বলে, 'তুই বাবা ভালো ছেলে, বড় ইস্কুলে পড়িস। তুই আমাদের সঙ্গে খেলবি কি?'

কিন্তু সেখানেও খুঁটির মত থেকে নিতাইয়ের মত ছেলেরা তাকে তাদের খেলার সাথী হিসেবে গ্রহণ করে। দূরে সরিয়ে দেয় না। তাই স্কুলেও যেমন দু' একজন ছাড়া বন্ধু কেউ নেই বস্তিতেও তাই।

শীলা এখন তাকে আগের মত খোলা মন নিয়ে 'কই আমার বেণু বাবা কই' বলে ডাকতে আসেনা। বরং পথে ঘাটে তাকে দেখে সঙ্কুচিত হয়, নিজেকে যেন সরিয়ে নিতে চায় তার চোখের সামনে থেকে। হঠাৎ সামনা সামনি পড়ে গেলে মলিন হাসি হেসে বলে, 'ভালো আছো বাবা?'

বেণুরও বোধ হয়েছে। বুঝতে শিখেছে বেশ্যা আর গৃহবধূর সামাজিক মর্যাদা। বুঝতে পারে শীলার বাড়ি যাওয়া তো ঠিকই নয়, এমন কি তার সঙ্গে পরিচয় রাখাও বিশেষ লজ্জার। তার হাতে কোন জিনিস খাওয়াটাও উচিত নয়।

শীলা বাড়ি নিয়ে গিয়ে তাকে খাওয়ায় না বটে কিন্তু মাঝে মাঝে কিছু না কিছু বিদ্যাবতীকে দিয়ে যায় বেণুর জন্য। স্কুল থেকে ফিরে এলে মা খুশির খবরে যেদিন এসব দেয় বেণু তাড়াতাড়ি খাবারটা মুখে পুরে দিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করে, 'পুজো ছিল বুঝি কিছু?'

বিদ্যাবতী বলে 'না তো।'

'তবে এসব? তুমি কিনে আনলে?'

'আমি কোত্থেকে কিনবো বাবা। পয়সা আছে এসব কেনবার? এ্যাকটা সন্দেশ এ্যাক আধ করে খায়।'

বেণুর চিবোনো থামল একটু ক্ষণ। বলল, 'কেউ দিয়েছে বুঝি?'

'হ্যাঁ, ঐ শীলার মাও।'

বেণু খাবার মুখে বলে, 'ওদের দেওয়া জিনিস খাও ক্যানো তুমি? বারণ করতে পারো না?'

'করি তো। ও শোনে না। তোকে যে বড্ড ভালোবাসে। তোকে কিছু খাওয়াতে না পারলে ওর মনটায় শান্তি হয় না।'

বেণু চুপ করে আছে দেখে বিদ্যাবতী এবার বলল, 'তা এ্যাক, সত্যি তো এই সব খাবার কত খুঁটে খুঁটে খেতিস ওর ঘরে।'

বেণু বলল, 'আগে তখন কি বুঝতুম।'

বিদ্যাবতী জিজ্ঞাসা করল না এমন এই আটবছর বয়সেই বা কি বুঝে শীলার দেওয়া খাবার সে খেতে চাইছে না। বিদ্যাবতী অন্য কথায় গেল।

'হ্যাঁরে বেণু, তোর নতুন ক্লাসে কত মাইনে লাগবে রে'?

বেণু গত ডিসেম্বর মাসে নতুন ক্লাসে উঠেছে। মোটামুটি ভালভাবেই পাশ করেছে। 'এ' সেকশনে প্রমোশন পেয়েছে। এই স্কুলে 'এ' সেকশনে প্রমোশন যারা পায় তারা নাকি ভাল ছেলে।

বেণু বলল, 'এ ক্লাসে মাইনে ঐ দু টাকাই। পরের ক্লাসে তিন টাকা হবে।'

বিদ্যাবতী বলল, 'কোত্থেকে যে দোব। তোর বাবা এ্যাকটা করে টাকা দিচ্ছিল এ বছর থেকে দেবে না।'

'দেবে না?' বেণু খেতে খেতে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল। 'না। বলেছে সে আর পারবে না। তার সংসারে বড্ড খরচ। কুলিয়ে উঠতে পারছে না।'

এসব ব্যাপারে বেণু কি বোঝে যে জবাব দেবে? ওর বয়স সবে আট বছর পাঁচ মাস চলছে। কিন্তু বিদ্যাবতীই বা কার সঙ্গে পরামর্শ করবে? কোথা কই! [illegible] সবাই [illegible] করছে আর এ সংসারে সে বটবৃক্ষও তো নেই। সম্বল বলতে ঐ একরত্তি ছেলে।

বিদ্যাবতী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'জানতুম বলে কোন লাভ নেই তবু তোর জেঠিমাদেরও বললুম—'

বেণু বিজ্ঞের মতই গম্ভীরভাবে বলল, 'তা কি বলল?'

'বললুম তো, ছেলেটার পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। বাবা মাসে এ্যাকটা করে টাকা দিচ্ছিল। তাও এখন থেকে দেবে না বলেছে। তুই কি দিবি? তা সে শুনেই বললে তোর অতবড় চাকরে বাবাই যখন দিতে পারছে না আমি কোত্থেকে দোব?'

বিদ্যাবতী এবার বিছানার চাদরটা ঠিক করতে করতে বলল, 'আমায় পরামর্শ দিলে, পড়িয়ে আর কি হবে। কোনো পানবিড়ির কারখানায় ঢুকিয়ে দে। ভালো কারিগর হয়ে উঠবে আখেরে। ছেলেটার [illegible]।'

বেণুর বুক ভয়ে ধুকপুক করে উঠল, মাকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, 'ছাড়িয়ে দেবে মা আমার ইস্কুল থেকে?'

বিদ্যাবতী ছেলের ভয় বুঝতে পারল। কাছে এগিয়ে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'না পারে সে পারবে না যা হয় হবে। এ বছর তো পড়। তারপর ঈশ্বর যা হোক করে চালিয়ে দেবে।'

ছেলেকে বিদ্যাবতী অবশ্য আরো এক বছর পড়াশোনার যোগাড় [illegible] কথা বলল বটে কিন্তু পড়াশোনা করায় আর একটা বড় অসুবিধে হতে লাগল বেণুর। পড়া বলে দেবার কোন লোক পায় না। মাস্টার এসে বাড়িতে তাকে পড়িয়ে যাবে এ বিলাসিতার কথা বেণু স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। গত বছর [illegible] কাছে সকালের দিকে পড়তে যেতো। কিন্তু সকালের দিকে

বড়োদের জিনিস পড়ার চাপ থাকে বলেই বাবার সে পড়তেই পারে না। তার ফুটবল খেলা। পাড়া বিকেল বেলা নিজের মাঠের ফুটবল তো খেলেই এ ছাড়াও অনেক মাঠে খেলতে নিয়ে যায় তাদের বড়ো হয়ে খেলবার জন্য। সন্ধ্যে নাগাদ আটটার আগে সে বাড়ি ফেরে না। তারপর বই নিয়ে বসাও যা না বসাও তা। ক্লান্তিতে চোখ তার বুজেই থাকে। এক একদিন খেলে ফুলে খাওয়াদাওয়া কষ্ট হয়। পড়ার পর পড়া তার পক্ষে অসম্ভব। অতএব যেটুকু পড়া তার সকালের দিকেই। তার ওপর তাকে পড়াবার জন্যে বাড়ীর সবাই আছেন সকাল সাতটায়। বেনুকে কখন সে পড়াবে?

বেনু তাই সন্ধ্যার দিকে হাবু মল্লিকের কাছে যায়। 'দিদি বেনু' বেনুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এক সময় পড়া থেকে মুখ তুলে হাবু বলে।

'হাবুদা একটা অঙ্ক দেখিয়ে দেবে?'

'কই দেখি।'

হাবু ভাল ছাত্র। বড়োদের চেয়ে অনেক ভাল। যদিও বড়োদের চেয়ে এক ক্লাশ নিচে পড়ে সে। সে চটপট কষে দেয় অঙ্ক।

'হাবুদা এই ইংরিজিটুকুর মানে বলে দেবে?'

হাবু তাও বলে দেয়। কিন্তু হাবুর বাবা বিরক্ত হন। তার ছেলেকে কেউ পড়ার সময় জ্বালাতন করুক তা মোটে পছন্দ করেন না। অবশ্য মুখের ওপর বেনুকে কিছু বলেন না। হাবুকে বলেন, 'তাড়াতাড়ি ওকে পড়াটা বলে দিয়ে আগে নিজের পড়াটা তৈরি কর। মোটে সময় নষ্ট করবে না। বুঝলে? সময় অমূল্য ধন।'

বড়দা আর হাবুর কাছে যেহেতুই বিশেষ জোর নাথের অর্থ বলে দেওয়া বা দুটো একটা অঙ্ক কষিয়ে নেওয়া। কিন্তু আরো কত জিনিস যে দুর্বোধ্য থেকে যায় বেনুর। তার কাছে জিজ্ঞাসা করবে, কে বসে দেবে তাকে। তবু বুঝে পড়ার চেষ্টা করে সে। না বুঝে শুধু মুখস্থ করা। তাই বহু জিনিসই পড়তে ভাল লাগে না আর ভাল না লাগলে সে অংশটা বাদ যায়।

পাড়ার দু'একটি ছেলের সঙ্গে কখনো বেনু পার্কে যায়।' দৌড়োদৌড়ি করে ফুটবল খেলা দেখে। ফিরে এলে মা জিজ্ঞাসা করে, 'হাতে পায়ে ধুলো কাদা হয়ে গেছে এখন বাড়ি ঢুকলি। ছিলি কোথায়? তিন তিনবার বউবাজার থেকে এলুম সেখানে তো ছিলি না'।

বেনু ভয়ে ভয়ে বলে, 'পার্কের মাঠে ফুটবল খেলা দেখছিলুম'। বিজয়বতী সঙ্গে সঙ্গে তার পিঠে দুটো চড় কষিয়ে দেন। বলে, 'খুব পা হয়েছে না? অত ফুটবল খেলা দেখতে গেছলে? তারপর গাড়ি চাপা পড়ে মরবে ছেলেরা বলে দিয়ে যাক! কতবার বলছি তুমি যাবে না পার্কে কোথাও।'

একটি মাত্র নিরবচ্ছিন্ন সময়ের জন্য বিজয়বতী সর্বদা সজাগ থাকে এই বৃত্তি নিতে যায়।

উনিশ

নতুন ক্লাসে নতুন বই প্রায় সকলেরই কেনা হয়ে গেছে। বেনু এর ওর কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে দু তিনখানা বই জোগাড় করেছে। সব হয়নি। বাকি বইগুলো কিনতে অন্তত চার টাকার মত দরকার। মা কেবল বলছে আর মাস কাবার, তার পর পাবে। একদিন হাবুকে বলল বেনু, 'হাবুদা তোমার ক্লাসের বন্ধুদের থেকে আমার বইগুলো একটু জোগাড় করে দাও না।'

হাবু চেষ্টা করল। কিন্তু একখানার বেশি জোগাড় করতে পারল না। তখন সে-ই তাকে পরামর্শ দিল, 'এক কাজ কর বেনু। নতুন বই কিনতে না পারিস পুরোনো বই কেন না।'

বেনু বলল, 'পুরোনো বই কেনা যায় নাকি আবার?'

হাবু বলল, 'কেন জান? কলেজ স্ট্রিটে পুরোনো বইয়ের বাজার। পুরোনো বই নতুনের চেয়ে অনেক কম। আমি তো পুরনো বইই কিনি।'

অবশেষে কিছু পয়সা জোগাড় হতে হাবুর সঙ্গে গেল একদিন বেনু। কলেজ স্ট্রিট পুরোনো বইয়ের দোকানগুলোর চেহারা আগেই দেখেছে। গত বছর যখন ছোট কাকাবাবু পুজোর পর এসেছিল তখন তাকে পরেশনাথের মন্দির, চিড়িয়াখানা এইসব দেখিয়েছে। [illegible] একটা টুকি [illegible] দেখিয়েছে।

একটা বই ছাড়া সব বইই পেয়ে গেল বেনু। [illegible] কিভাবে পুরোনো বইয়ের দর দাম করতে হয়। বইওলা যা বলবে তার ঠিক অর্ধেক [illegible] করতে হয় [illegible] তবে ঠিক দামটিতে পেয়ে যাবে বইটা। হাবু একেবারে ওস্তাদ এ ব্যাপারে।

এই দিনই বেনু প্রথম দেখল প্রেসিডেন্সি কলেজ। চেহারা দূর থেকে [illegible] ইউনিভার্সিটি। ঠিক যেন মন্দিরের মত। কত বড় বড় থাম। কি গম্ভীর।

হাবু বলল, 'এটা হোচ্ছে ইউনিভার্সিটির সেনেট হল।'

গোলদীঘির পুকুরের চারধার ঘুরে ভারি ভাল লাগল। কি সুন্দর বাগান। গাছের কোণের দিকে পাতা দেখি। পুকুরে ছেলেরা সাঁতার কাটছে। আর ভাল লাগল প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিঙে সাজানো বই। কত যে বই। বেনুর ইচ্ছে সবগুলোর, বিশেষ বাংলাগুলোর টেনে টেনে পাতা উল্টে দেখে কিন্তু বইওয়ালা তাকে বইয়ে হাত দিতে

দেখলেই বলে, 'আই বৌদ, চাঁদ দিবে না।'

হাবু বলে, 'রেনু, হাত দিসনি। ওরা মারবে। দেখছিস না ওরা মুসলমান।'

মুসলমানের সম্বন্ধে একটা ভীতি আছে রেনুর। মায়ের কাছে শুনেছে যে বছর তার বাবা মারা যান সে বছর নাকি ভীষণ দাঙ্গা হয়েছিল কলকাতা শহরে হিন্দু মুসলমানে। মুসলমানরা অনেক হিন্দুকে খুন করেছে। তাদের গায়ে খুব জোর, তারা নাকি গরু খায়। অতএব মুসলমান পাড়াটা পেরোবার সময় আর হাত বাড়িয়ে দিতে চায়নি না রেনু। যদি খুন করে ফেলে তাই!

স্কুলে গিয়ে একটা সুবিধে হয়েছে। প্রচুর ডিটেকটিভ বইয়ের কাছে নানা বই থাকে। পড়ার বই নয়, গল্পের। একবার একটা বই পেল 'পথের দাবী'। এমন বই রেনু এর আগে পড়েনি। পড়তে পড়তে সে কি উত্তেজনা! মনে হচ্ছে সুমিত্রার সঙ্গে সেও বুঝি চলেছে পথের দাবীর সন্ধানে।

বই পড়ায় কোন বাধা নেই। যে কোন বই সে পড়তে পারে। বিভাবতী ভাবে ছেলে বই নিয়ে একমনে পড়ছে কিন্তু সে যে কি বই পড়ছে, পড়ায় না থাকলে, তাতো বিভাবতী বোঝে না। একদিন প্রচুর হাতে দিল একটা ছড়ার মত বই। পড়। আবোল তাবোল। রবিবার দিন খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে সেগুলো পড়ছে আর আপন মনে হাসছে এমন সময় নীলার গলা শুনল, 'বৌদি, রেনুদা আছে?'

বিভাবতী খেতে বসেছিল তখন। একটু আগে অফিস থেকে এসে পড়েছে। সে তাড়াতাড়ি খেয়ে শোবার চেষ্টা করছে। নইলে ফের অফিস যেতে হবে। নইলে ফিরে যেতে পারবে।

বিভাবতী বলল, 'হ্যাঁ আছে। ওরে রেনু, নীলা দিদি ডাকছে।'

রেনু দাওয়ায় এল, 'কি বলছো?'

নীলা দিদি কথাটা খুব দিয়ে এমন বেরোল না। আজকাল দীনাকে প্রকাশ্যে দিদি বলতে লজ্জা হয়।

'বাবা আজ ইস্কুলে যাওনি গো?'

'না। আজ তো রোববার।'

'ও। এই চিঠিটা একটু পড়ে দেবে গো বাবা?' চিঠিটা হাত বাড়িয়ে দিল নীলা। দীনার দেহটা খুব জোরে ভাবে আপত্ত দিয়ে বোঝা যায় রেনুর মনের গড়ন চিঠিটা নিতে গিয়ে। নীলার পেটটা ভীষণ উঁচু।

ছেলে হবে নীলাদিদির? রেনু ভাবল। কিন্তু নীলাদিদি তো বেশ্যা। ছেলে তো সেরকম বউদেরই হয়। অই কোন বেশ্যার যে ছেলে হতে তো ভাবেনি সে। যাই হোক নিজের ভাবনা নিজের মনে রেখে রেনু হাত বাড়িয়ে নীলার হাত থেকে চিঠিটা নিল। তারপর পড়তে শুরু করে দিল।

কল্যাণীয়াসু আমার আশীর্বাদ জানিবা তাহার পরে লিখি যে শ্রীমান বাঁটুলের আজ দশ দিন হইল টাইফিয়ার হইয়াছে তাহার পরে লিখি যে ডাক্তারি খরচ লাগিতেছে তুমি সত্বর তিরিশ টাকা পাঠাইবা তাহার পরে লিখি যে আর আর সংবাদ ভাল ইতি শ্রীনিরুপমা দাস

রেনুর খুব হাসি পেয়ে গেল। কি বাজে বানান! নিরুপমা দাস। আর চিঠি লেখার কি ছিরি। বানানে ভুল। কোথাও দাঁড়ি কমা নেই। আর খালি তাহার পরে লিখি যে তাহার পরে লিখি যে। চিঠিটা হাসি চেপে কোনও রকমে পড়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। নীলা কাঁদছে। বিভাবতীও খাওয়া শেষ করে আসছিল মুখ মুছতে। দেখল নীলা কাঁদছে। বলল, 'কি হোল কাঁদছো ক্যানো নীলা?'

রেনু গলায় ভেতর দিয়ে আবোল তাবোলে মন দিল।

'ছেলেটার বড় অসুখ বৌদি। চিঠি এসেছে।'

'কি অসুখ?'

'টাইফিয়ার।'

'ও বাবা সাংঘাতিক অসুখ। আমারই তো দেওর রেনুর হয়েছিল। উঃ। কি কষ্ট! শুধু জল পটি করে করে মাথা আমার খারাপ হয়েছিল। আড়াইটি মাস বিছানায় শয্যাশায়ী। নেহাৎ কপাল ছিল ডাক্তারের বদ্যি খুব পটি করে বাঁচিয়েছিল এখন হোলে—'

এখন হোলে কি হবে সে কথাটা উচ্চারণ করতে পারল না বিভাবতী। মনে মনে শিউরে উঠল।

নীলা চোখটা আঁচলে মুছে নিয়ে বলল, 'কি করি যে বৌদি, আমার কাছে অত টাকা নেই। আমার হাতে একটা পয়সা নেই। কখন শুধু ধার দেনা করে চালাচ্ছি'।

মন্দাদা দুপুরে একটু গড়িয়ে নেন। তিনি হাই তুলতে তুলতে এসে নিজের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে নীলার কথা শুনছিলেন।

বিভাবতী বলল, 'হুঁ। বড় মুস্কিলের ব্যাপার! তুমি যে আমার একটা হাত বাড়িয়ে বললে।' তারপর দীনার দিকে আঙুল দেখিয়ে বেশ কিছু গলায় বলল, 'কবে টাইফ?'

মাথা হেঁট করে নীলাও কিছু গলায় জবাব দিল, 'মাসেকখানেকের মতোই।'

মন্দাদা এবার বললেন, 'ব্যাধি টের পেলে তখন পেটপোড়া চোরা খেয়েই পারতে। তোমাদের মতো এ দল ভাবেন তো কেউ পোয়াতে চায় না তাই কত করে ভাবনা হয়। এ্যাখন কি করে কি করবে বলতো!'

নীলা খুব কিছুক্ষণই ছিল। সেই ভাবেই কাঁদাকাঁদা গলায় বলতে লাগল, 'পারছি নি বৌদি। ব্যাধি টের পেয়ে ব্যাধি আর পারছি নি। কমাসের বোঝা এ্যাকটা পেয়াদকে পেয়াদে বলে নষ্ট হোতে পারছি নি। মনে হোল আমার

বড়োর কত পাপের ফলে এ ঘরে এই নরকে পচছি আমার এ বয়েস্ এ্যাতো বড় এ্যাকটা মহাপাতোক করব—'

বড়মামাই বললেন, 'কেঁদো না নীলা আর কেঁদো না। ভগবানের ওপর ভরসা রাখো। সব ভগবানের মালিক তিনি। সব তিনিই করাচ্ছেন। তোমাকে এ পথে তিনিই এনেছেন উদ্ধার তিনিই করবেন'। বড়মামা জলের বালতি নিয়ে জলে চলে গেলেন।

নীলা বিভাবতীকে বলল, 'বৌদি এক-বার হাবু পাল মশাইয়ের কাছে যেতে হবে।'

'ক্যানো গা?'

'আমার একতোলা কলি আছে। সোনার চার ভরির ওপর। সেটা বাঁধা দিয়ে চালিশটা টাকা এনে দিতে হবে। উনি তো আমাদের গয়না বাঁধা রাখবেন কি।'

হাবুচন্দ্র পাল মশাই পাড়ার প্রবীণ লোক। পুকুরের ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে গয়না বাঁধা রাখেন। কন্যাও বকশী কারবার তাঁর। পাড়ার তিন ভাগ লোকের গয়না বাঁধা তাঁর কাছে। কিন্তু বেশ্যাদের গয়না কিছুতেই বন্ধক রাখেন না। বলেন, বড় ঝামেলা হয়। মারা গেলে বাকি হাজারটা ওয়ারিশান এসে হাজির হয়। ওরা নিয়ে আসে, গয়নার দাবী জানায়।

বিভাবতী বলল, 'দেখ দিয়ে দেও।'

বেনুর আবোল তাবোলে বিশেষ মন ছিল না। নীলা পিসির দেশের অবস্থা, তার চিঠি আসে কাকা, মা জ্যাঠাইমার কিছু গলায় হয়েছে আলোচনা, গয়না বাঁধা রাখার কথা সবই কানে এসে কিছু কিছু ঢুকছিল আর ব্যাপারটা জানতে ইচ্ছে করছিল তার।

মা বালতিটা তাড়াতাড়ি রেখে যখন ঘরে এসে জল খাচ্ছিল সে জিজ্ঞাসা করল

'বাঁটুল কে মা?'

'বাঁটুল আবার কাকে পেলি!'

'ওই যে চিঠিতে যার অসুখের কথা শুনে কাঁদছিল নীলা পিসি।'

'ও। সে তোমার তা জেনে কাজ নাই।'

'নীলা পিসির ছেলে আছে নাকি?'

বেনু কোনদিন এ কথাটা জানত না।

'এমা তা আবার নেই। ছেলে মেয়ে—হাটের কিরিপী সবাই আছে দেখে।' বাবনা কোমরে বড় শিকলের সড়াটা আর হাতে বালতিটা নিয়ে সরকারী কলের উদ্দেশে যেতে যেতে বলল, 'কপাল, কপাল, সবই কপালে করে—'

দিন আটেক পরে নীলার আর্তকান্না বিভাবতীদের ভাবনা দিয়ে ঘরে যেন আছড়ে পড়ল।

বেনু তখন স্কুল থেকে এসে মুড়ি খেতে বসেছে। 'নীলা পিসি কাঁদছে না মা?'

কান করে শুনল বিভাবতী। ছেলের নাম ধরে 'বাঁটুল রে বাঁটুল রে' বলে কাঁদছে নীলা। মানে আর একটাই। বোধহয় খবর এসেছে বাঁটুলের মারা যাবার। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল বিভাবতী, 'আহা ছেলেটা বাঁচল না।'

কদিন খুব কান্না শোনা গেল নীলার তারপর বন্ধ হয়ে গেল।

আর একদিন ভর দুপুরে বাড়ির দুজন ভাড়াটে মেয়েছেলের কাঁধে ভর দিয়ে বিভাবতীর উঠোনে এসে বসে পড়ল নীলা। বিভাবতী অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি কাছে এল। বলল, 'এ কি নীলা, কি হয়েছে?'

'বৌদি, এরা আমায় হাসপাতালে দিচ্ছে। আমার অবস্থা ভালো না।'

'ব্যাথা উঠেছে নাকি?'

'বৌদি, আমার কি যে হচ্ছে ভেতর-টার কিছু বুঝতে পারছি নি গো, বড্ড কষ্ট হচ্ছে—আইঢাই করছে—হাসপাতাল থেকে আর আমি ফিরবুনি বৌদি। পা দুটো এগিয়ে দাও। দক্ষিণেশ্বর পায়ের ধুলো এই মাথায় দি—পরকালে গতি হয়ে যাবো—'

চোখের জলে নীলার গাল ভিজে যাচ্ছে, বুকের কাপড় ভিজে যাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে পা ছোঁবার চেষ্টা করছে নীলা। বিভাবতীও চোখের জল আটকে রাখতে পারল না। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে নীলার মাথায় হাত রেখে বলল, 'ছি নীলা, অলক্ষুণে কথা বলতে নেই, মরবে কেন? ভালোভাবে খালাস হয়ে ফিরে আসবে আবার।'

নীলা বিভাবতীর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে মাথায় মাখতে বলল, 'আশীর্বাদ কর বৌদি এই নরকে আর যেন ফিরে আসতে না হয় আমাকে।' কথা বলতে বলতে দম নিয়ে থামল। তারপর বলল, 'বৌদি হাবু পালের কাছ থেকে কলি জোড়া পারো তো তুমি ছাড়িয়ে রেখো! আমি যদি মরে যাই আমার হয়ে তুমি ওটা আমার বেনু বাবার বৌয়ের হাতে পরিয়ে দিও।'

এ্যাম্বুলেন্স এসে নীলাকে নিয়ে গেল বিভাবতীর বাড়ি থেকেই। দুদিন পরে খবর এলো বেনুকে খেতে দিয়ে বিভাবতী বলল, 'জানিস বেনু, আজ নীলাটা মরে গ্যাছে।'

নীলা? মানে নীলা পিসি? মারা গ্যাছে?

'কি হয়েছিল নীলাপিসির মা?'

'হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল সেখানেই ছেলে হতে গিয়ে—'

বেনু চুপ করে রইল। মনটা খারাপ হোল একটু। যেমন হোক যাই হোক মানুষটা বড় ভাল ছিল। বড় ভালবাসত বেনুকে। কিছুদিন আগেও বেনু স্কুল থেকে ফিরে তার দেওয়া লেভিনচুষ খেয়েছে। বেনুর কানে এসে এখনও বাজছে নীলার ডাক, 'বেনু বাবা—'

বিভাবতী বলছে কিছু। কান করে শুনল বেণু।

'শেষ সময়ে মুখে আগুনটাও পেলো না হতভাগী। পাড়ার মড়া হয়ে পুড়বে।'

পাড়ার মড়া বলিতে একটা গালাগাল। যার ত্রিভুবনে কেউ নেই আত্মীয় বা স্বজন তারাই পাড়ার মড়া হয়ে পোড়ে। অর্থাৎ বেওয়ারিশ, লাশ একদমে পাড়া করে পোড়ানো হয়। আগে বেণুদের পাড়ার ঘাটের শ্মশানে মহাদেব মাঝি একদিন করে পাড়ার মড়া পুড়তো। যেদিন পুড়তো সেদিন এ অঞ্চলে লোকের নাকে বদবাস ভরা দুঃসাধ্য হয়ে উঠতো। অনেক লোকে দরখাস্ত করে সেটা বন্ধ হয়েছে। এখন ধাপা না কোথায় পোড়ানো হয়।

নীলা দিদি পাড়ার মড়া হয়ে পুড়বে? অথচ যে মা বলল মেয়ে তার হাটের ফিরিঙ্গী আছে।

'ক্যানো মা, ও পাড়ার মড়া হয়ে পুড়বে? ওর তো দেশে সবাই আছে।'

'সবই থাকুক আগুনটুকুও কেউ ওকে ছোঁবে না। ও যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল—নষ্ট হয়ে গেছল যে—'

মানুষ কি করে নষ্ট হয়ে যায় বেণু বোঝে না কিন্তু এ পাড়ায় লোকে অমুক নষ্ট হয়েছে। নষ্ট যারা হয় তারা প্রায়ই মেয়ে। কিন্তু বেণু নষ্ট হয়ে যাওয়া সে মেয়েদের দেখে বোঝেনি কি তাদের নষ্ট হয়েছে। ফল নষ্ট হলে পচে যায়, দুধ নষ্ট হলে ছানা কাটে মেয়ে নষ্ট হলে কি হয়!

মেজদা, সবাই নষ্ট মেয়েমানুষ জ্ঞান হয়ে ইস্তক জানে বেণু। নীলাদিদি কিন্তু নাচতে যাবে। মেজদা দুই লোকেরা সবাই নাচতে যায়। সাধারণ রঙ্গালয়ে পড়েছে সে। তার মধ্যে পড়ল সবার মাটি যাওয়ার পথে ছবির দোকানে কাচা সেই নাচের ছবিটা। ইন্দ বসুকুমা কিন্তু নীলাদিদিকে সেই জমকের বহাল দিয়ে চলেছে এখনও! তাদের মানো কথা দক্ষ চলে বেণু নিয়ে কিছু মাথা ঘামাত। বলত, 'নীলাদিদি বেশ্যা বটে, নষ্ট মেয়েছেলে বটে; কিন্তু সে মানবতার বড় বড় পাষাণ নয়। বেণুকে বড় ভালবাসত। কোথায় তাকে অত কষ্ট দিতুম গো!'

বেণু নীলাদিদির জন্যে হঠাৎ কেঁদে ফেলল বেণু।

কুড়ি

মাঝোবেলা বিভাবতী ফিরে এসে দেখল বেণু পড়ছে। গায়ে জড়ানো ছেঁড়া একটা চাদরটা খুলতে খুলতে বলল, 'বেণু, পাড়ার অমল আটটার সময় এ্যাকবার বুড়ো হাসের বাড়ি যাস তো।'

বুড়ো হাস পাড়ার একজন মাতব্বর করেন করী। বিধিমত কাগজ খুলিয়ে ফেল মেটে এসেছে একবার। একবার ফুল তৈরি করে। ধরা পরে। পাড়ায় টাকু খুলো দিলোর। বড় ডিডিগের মত। জীবিকা অর্জনের জন্য বিশেষ কিছু করে না। বাবার আমলের দোকান আছে। দোকানের ভার বাবার হাতে। পাড়ার বুড়োখানকে সবাই শ্রদ্ধা করে সম্মান জানায়।

বেণু বলল, 'ক্যানো মা?'

'ও তোকে নিয়ে যাবে বাবুদের বাড়ি। খুব মালদার বড়লোক। অনেক বই পড়ে আছে। বলছে তো ওদের থেকেই বই কেনার টাকা সব জোগাড় হয়ে যাবে।'

অনে বেণুর মনটা খিন্ন হয়ে গেল। আবার সেই ভিক্ষে চাইতে যাওয়া।

বেণু এবার ফোর্থ ক্লাসে পড়ছে। ফোর্থ ক্লাসে উঠে অনেক বই কিনতে হবে। বলতে গেলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পড়া এই থেকে শুরু। এখন থেকে আর তিন বছর। পৌরনীতি পাটীগণিত অ্যালজেব্রা। আজকাল ইংরিজি বাংলা ভূগোল ইতিহাস থাকবে প্রায়ই। এ বছর নতুন আবেদন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো ইংরিজি মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে কিন্তু বেণুরা যে বছর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবে সে বছর থেকে শুরু হচ্ছে বাংলা মাধ্যম। ফলে আগের বইগুলো, ইতিহাস ভূগোল এসব বেছে বাংলা বই। সবগুলো এ বছরেই নতুন বই তালিকায় নাম পেয়েছে। এর মানে হোলো বেণুর বাবার ঝামেলা। সব নতুন বই কিনতে হবে। যার মোট মূল্য প্রায় পঁচিশ টাকার মত। বেণুদের মাস তিনেকের খাইখরচ।

প্রায় ছমাস হয়ে গেছে বেণু ইংরিজি বাংলা দুটো বই পুরোনো কিনেছে। বাকি আর কেনা হয় নি। পড়া চালাচ্ছে প্রায়ই চিত্তদীপ আর বাঁধনের বই চেয়ে নিয়ে। কিন্তু বড়লোকদের বাড়িতে ভিক্ষে চাইতে যাওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। গত বছরেই হয়েছে।

একজন বড়লোকের কাছে গিয়েছিল। বস্তিরই একজনের সঙ্গে বিভাবতী পাঠিয়েছিল। বাড়িটি একজন নাম করা অ্যাটর্নীর। অ্যাটর্নী সম্প্রতি মারা গেছেন। ভোগ করছে তাঁর ছেলেরা। বড় ছেলে বাড়ির কর্তা। তাঁরই কাছে বেণুকে নিয়ে গিয়েছিল লোকটা।

বড় বাড়ি। গেট পাথরের মেঝে। বাড়ির সঙ্গে টেনিস খেলার মত মাঠ। বাড়ির ভেতর ঢুকতেই কুকুরের প্রচণ্ড গর্জন শুনতে পেল বেণু। বেণু খুব ভয় পেয়ে গেল।

লোকটা বলল, 'ভয় নেই এসো। বাঁধা আছে।'

সকাল আটটায় গিয়েছিল। বড়বাবু ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট শেষ করে নিচে নামলেন বেলা সাড়ে নটা। শ্বেত পাথরের চকচকে দালানের একপ্রান্ত থেকে হেঁটে আর একপ্রান্তের বিশাল বসবার ঘরখানায় গিয়ে ঢুকলেন। ধবধবে ফর্সা বড়বাবুর গায়ের রং। গায়ে ফিনফিনে সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী। হাতায় সিল্কে

কথা। পরনে ছুঁচোলো ঢিলে চুড়ি। পায়ে কালকরা নাগরা ধরনের চটি।

বেণু দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল বড়লোক হোলে চেহারাটাও কি সুন্দর হয়! সঙ্গের লোকটির ইশারায় উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে মাথা নুইয়ে নমস্কার করল তারা দুজনেই। বাড়ির বড়বাবু তেমন দেখলেন না। আরো বেশ কিছুক্ষণ পরে চাকরকে দিয়ে খবর পাঠাতে বৈঠকখানা ঘরে ডেকে পাঠালেন। মেহ-গনির জোড়া সোফা, মধ্যে সেগুনগাছের জোড়া দরজা। কেমন নিঝুম শান্ত ঠাণ্ডা ঘর। মাথার ওপর বড় সিলিং-পাখা ঘুরে আস্তে ঘুরছে।

বড়বাবু সোফাতেই মোটা কোঁচে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। মুখ তুলে বললেন, 'কি ব্যাপার মধু?'

বেণুর সঙ্গের লোকটি আবার নমস্কার করে বলল, 'বড়বাবু এই ছেলেটি আমাদের গাঁয়ের একটি গরিব বিধবার ছেলে। ইস্কুলে পড়ছে। কোনমতে টেনেটুনে ভালোভাবে পাশ করে কিন্তু বই কিনে পড়তে পারছে না। যদি আপনার দয়া পায় সেই আশায় এনেছি আপনার কাছে।'

বেণুকে বড়বাবু একবার দেখলেন। আবার খবরের কাগজে মন দিলেন। মিনিট খানেক পরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন ক্লাসে পড়?'

বেণু ভয়ে ভয়ে কোনমতে বলল ক্লাসের নাম।

'কোন গ্রাম?' বেণু গ্রাম বলল।

'হেডমাস্টার মশাইয়ের নাম কি?'

বেণু বলল।

'কতগুলো বই কিনতে পারনি?'

বেণু বইয়ের তালিকাটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দাগ দেওয়া আছে ক'খানা বই।'

বড়বাবু বিরক্ত হলেন মনে মনে বোধ, 'ও আমি দেখে কি করব? বইগুলোর দাম কত?'

বেণু বলল, 'আমি জানি না।'

বড়বাবু এবার একটু ধীরিয়ে উঠে বললেন, 'না জানলে আমি বুঝব কি করে?

বেণু খুব ঘাবড়ে গেল। সঙ্গের লোকটি তাড়াতাড়ি বলল, 'তুমি বরং জেনে এসে বড়বাবুকে কাল বোলো।'

বড়বাবু বললেন, 'কাল না। আমি থাকছিনা কলকাতায়। তুমি বরং দিন সাতেক পরে এসো।'

সাতদিন পরে দুরু দুরু বুকে বেণু এসে একা ওই বড় বাড়িটায় ঢুকেছিল আর কুকুর দুটো তেমনি গর্জন করে উঠেছিল। দারোয়ান এসে বলেছিল 'এাই, কাঁহা যাতা হায়?'

বেণু কোথাও যাচ্ছিল না। কুকুরের গর্জন শুনে সেখানেই মাটির সঙ্গে আটকে গিয়েছিল।

কোনমতে ঢোক গিলে বলেছিল, 'বড়বাবু...বই—'

বইয়ের লিস্টটা হাতে তুলে ধরে দেখিয়েছিল।

'যাও, বারান্দামে বেঞ্চিমে বোসো। বাবুর দেরি হোবে উপরসে নামতে।'

প্রায় ঘণ্টাটাক খানি বসে রইল। বড়বাবু নামলেন না। অগত্যা আবার পরদিন।

বেলা এগারোটা নাগাদ বড়বাবু নামলেন। ওকে দেখে বললেন, 'জেনে এসেছ কত দাম?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এসো'। সঙ্গে করে ঘরে নিয়ে গেলেন ঘরের ভেতর।

বড়বাবু সোফায় বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত দাম?'

'চার টাকা বারো আনা।' বড়বাবু বেল বাজালেন। চাকর ঢুকল।

বড়বাবু বললেন, 'চেকবইটা বড়মার কাছ থেকে নিয়ে আয়।' বড়বাবু কাগজে মন দিলেন। বেণু মেঝের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

চাকরের কাছ থেকে নিয়ে পাতলা লম্বাটে চারটে বইয়ের মত বইটাতে কি সব খস খস করে লিখে পাতাটা ছিঁড়ে বেণুর হাতে দিয়ে বড়বাবু বললেন, 'এই চেকটা নিয়ে যাও। বইগুলো চেক যে দোকানটার নামে লেখা আছে সেখান থেকে কিনবে। অন্য দোকানে পাবে না। তাদের চেকটা দিয়ে দিও।'

বেণু জীবনে এর আগে কখনো চেক দেখেনি। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'দোকানটা কোথায়?'

বড়বাবু বললেন, 'কলেজ স্ট্রিটে।'

বেণু নমস্কার করে চলে এসেছিল। বই কোনোরকমে পেয়েছিল বটে কিন্তু চারটাকা বারো আনার বই পেতে তিনদিন স্কুল কামাই আর কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি। হাঁটাহাঁটিটা কিছু নয়। পুরোনো বই কিনতে গিয়ে হাঁটা বেণুর এমন কম নয়। কিন্তু এই বই পেতে যে হীনতা যে লজ্জা যে তিক্ত হীনমন্যতা আছে সেটা বেণু কিছুতেই ভুলতে পারেনি।

তাই আবার বড়লোকের বাড়ি বিয়ে খাওয়ার কথা ভেবে বেণুর মন তিক্ত হয়ে গেল। বলল, 'আমি যাবো না মা।'

বিভাবতী চটে গেল। যাবার কথাই। বেলা তিনটে থেকে মুখোপাধ্যায়দের বাড়ি গিয়ে সে বসেছিল। তাদের বাড়ির মেয়ে-দের সঙ্গে পরিচয় ছিল। তাদের সঙ্গে বসে বসে কাটিয়েছে সন্ধ্যে পর্যন্ত, কারণ বুড়ো হাল দাবি ছিলনা। আর এই মেয়েদের মধ্যে বসে কাটানো বিভাবতীর পক্ষে যে কি

অবশিষ্ট ভালো বেনু বোঝে না। মেয়েদের সঙ্গে বসে কাটানো মানে গোপনীয় কথা ওঠা। সে সম্বন্ধে মামার মেজদি কৌতূহলের অবধি রেখো।

বিভাবতী বলল, 'ক্যানো?'

'আমার ভালো লাগে না মা। বড় লজ্জা করে। হাঁ করে ডিবিরিদের মত দাঁড়িয়ে থাকা। তাছাড়া অস্থির লাগে।'

বিভাবতী চুপ মেরে গেল। একটু পরে বলল, 'বেশ যেও না।' বিভাবতী এর উত্তরে যদি চিৎকার করত বকত বেনুকে সেটা স্বাভাবিক হোত কিন্তু শুধু 'বেশ যেও না' বলাতে বুঝল বেনু যে এ রাগ অনেক বেশি।

তখন কিছু বলল না। রাতে খেতে খেতে বেনু মায়ের দিকে চেয়ে দেখল। দুশ্চিন্তায় গম্ভীর। যেন কষ্ট পাচ্ছে। বেনু আস্তে আস্তে বলল, 'মা তুমি রাগ কোর না। আমি বুড়োবাবার কাছে যাবো পড়তে।'

বিভাবতী বলল, 'যাও না যাও সে তোমার ইচ্ছে বাছা।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ওদের সেব কড়াটা চালাতে চাই বলে আমার এ্যাতো পরিশ্রম। নইলে বস্তির আর পাঁচটা ছেলের মত তুমিও বখা হয়ে থাকতে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে, লোকের ফাইফরমাস খেটে পেট চালাতে, কি চায়ের দোকানে এঁটো গেলাস ধুতে, কি বসে খেতো আমার?'

আবার চুপচাপ। খানিক পরে আবার বলল, 'কিন্তু অত লজ্জা লজ্জা করলে চলে। অত্যেতো ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে অত লজ্জা থাকলে বাঁচবে কি করে বাছা। দুদিন পরে দুমুঠো ভাতের জন্যেই হাত পাততে হবে লোকের দুয়োরে। কি করে চলবে লোকমুখে দেখতে পাচ্ছো না? ইস্কুলের দুটো টাকা মাইনে তাও এ্যাদ্দিন ঠিক করে জোটাতে পারিনি। এ্যাখন তো এ বছরে চারটাকা বাড়বে। ভেবেছো সে সব কথা?'

অতএব নির্দিষ্ট দিনে বুড়োবাবার সঙ্গে বালিগঞ্জের বড়লোকটির বাড়ি গেল বেনু। বিরাট বাগান ঘেরা দোতলা। মস্ত বাগানটার চারদিকে বারোটা ঘর। সব ঘরগুলোর পাশে পাশে দেওয়ালে একটা করে লম্বা বেলজিয়াম গ্লাসের আয়না। আয়নাগুলোর নীচে এক একটা ছোট তুলি আর এক একটা খড়ি। গোল শ্বেতপাথরের টেবিলে টেবিলে রাখা। মাথার ওপরে আলো জ্বেলে চলেছে। ঘরটার ওপরের সিলিং থেকে ঝুলছে ঝিকমিকে বড় বড় ঝাড় লণ্ঠন। মাঝেরটা সবচেয়ে বড়। ঝাড় লণ্ঠনের গায়ে গায়ে ঝিলিক মারছে। মেঝেটা পুরু গালিচা দিয়ে মোড়া আর দেয়াল থেকে কিছুটা ছেড়ে ছেড়ে জেগেছে মোটা কৌচ। তাতে বর্ণমালী প্রার্থী সবাই বসে আছেন। উত্তর দিকে মুখ করে বসে আছেন গৃহকর্তা। বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। বৃটিশ সরকার তাঁকে স্যার খেতাব দিয়েছেন। তাঁর সামনে একটি গোল শ্বেত পাথরের টেবিল। তিনি কথাবার্তা বলছেন লোকের সঙ্গে। মাঝে মাঝে প্রয়োজন মত কিছু টুকরো কাগজ লিখে কারো কারো হাতে দিচ্ছেন।

বুড়োবাবা গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করল।

'আরে আরে, বুড়ো যে! তোমার পাত্তাই নেই। ছিলে কোথায়?'

বুড়োবাবা আস্তে আস্তে কি যেন বলল তাঁকে।

স্যার বললেন, 'বোস দেখছি।'

বোঝা গেল স্যার বুড়োবাবাকে স্নেহ করেন।

বেনু বুড়োবাবাদের পাশে একটা কৌচে বসল। এত নরম কৌচটা আর এত পুরু তোশকেই বোধ হয় যে কেমন যেন ভেতরে ঢুকে গেল। হঠাৎ চোখ পড়ল সামনের দেওয়াল আয়নায় আর অমনি নিজেকে বড় বোকা বোকা লাগল, কিন্তু আবার একটু পরেই ভুলে গেল। আবার আয়নায় চোখ পড়তেই বোকা বোকা লাগল। এইভাবে এই কসরৎ করতে করতেই বেনু শুনল স্যার বুড়োবাবাকে বলছেন, 'হে, তোমার কি?'

বুড়োবাবা উঠে বেনুকে নিয়ে গিয়ে তাঁদের কাছে প্রার্থনা জানাল। স্যার কোন কথা না বলে একটা ছোট স্লিপ কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে লিখলেন, হঃ, মাসহারা বাবদ এই ছেলেটিকে তিন টাকা দিয়ে দিও।

বেনু তাদের লেখাটা দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে ফেলল। এই বাবদ মাসে তার পঁচিশ টাকার মত আর মাসকাবারি বড়লোক স্যার দিলেন তিন টাকা।

বুড়োবাবা বলল, 'স্যার, যদি আর কিছু বাড়িয়ে দিতেন—'

স্যার টাকমাথাওলা মুণ্ডুটা নেড়ে বললেন, 'আর এক পয়সাও দিতে পারব না বুড়ো। নেহাৎ তুমি নিয়ে এসেছ তাই। যাও ওকে নিয়ে ক্যাশিয়ারের কাছে। আর আখো, তুমি কাল সকালের দিকে একটু আসতে পারবে?'

'কেন স্যার?'

'দরকার আছে ঐ ডিক্রি ইজেকশনের ব্যাপারে।'

'আসব স্যার, নিশ্চয় আসবো।'

ক্যাশিয়ার অপ্রসন্ন মুখে দেখল স্লিপটা। সুতোর কাঁটি বাঁধানো গোল চশমাটা প্রায় নাকের কাছে ঝুলছে। মুখ তুলে বলল, 'খয়রাত আর খয়রাত। লাটে উঠতে আর বেশি দেরি নেই। আয়ের দিকে নজর নেই। ব্যয়ের বহর রোজই বেড়ে চলেছে। বুড়োদের

স্কুলবাবু—'

বুড়োবাবা বলল, 'ভালো কথাই। টাকাটা তাহলে ছেলেটিকে দিয়ে দেবেন। আমি চলি। আমার একটু তাড়া আছে।'

বুড়োবাবা চলে গেলে বেণুকে বেশ খানিকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে ক্যাশিয়ার চশমার ফাঁক দিয়ে বেণুকে দেখে বলল, 'আজ ক্যাশে টাকা নেই কাল এসো।'

বেণু জিজ্ঞাসা করল, 'কাল কখন?'

'এই সাড়ে দশটা নাগাদ।'

'ওই সময় আমার ইস্কুল আছে যে—'

বুড়ো ক্যাশিয়ার খিঁচিয়ে বললেন, 'অতশত জানি না। টাকার দরকার থাকলে এসো। নইলে এসো না।'

কিন্তু পরদিনও দিল না। দিন সাতেক স্কুল কামাই হোল তার ওই তিনটে টাকা ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে পেতে। স্কুল কামাই আরো নানা কারণে হচ্ছে। রোগ তার শরীরে লেগেই আছে। আজ জ্বর কাল সর্দি পেট আমাশা। আর একটা বড় কারণ হোল পুতুলের মরশুম। দশহরা, কার্তিকপুজো আর সরস্বতীপুজো। প্রায় পনেরদিন আগে থেকে বেণুর কোন চিন্তা থাকে না পুতুল রং আর পুতুল বিক্রি ছাড়া। আগে খাওয়ার ব্যবস্থা তবে তো পড়া!

দশদিন বারো দিন পরে যখন স্কুলে গিয়ে হাজির হয় তখন পড়াশোনা বেশ অনেক দূর। কত যে এগিয়ে গেছে! বাড়িতে পড়া বলে দেবার কেউ নেই তাদের। স্কুলের মাস্টারমশাইরা। কিন্তু সেখানেও মাঝে মাঝেই গোলমালটা ঠিক হয়ে যায়। তখন আবার প্রহার বাড়ীর ডিউটিবাবুর। তাদের মাঝে বই। তবু কি করে যে পাশ করে যায় কোন বিষয়ে ফেল না করে, এ সেকশনে প্রমোশন পায় এ রহস্য সে নিজেই ভেদ করতে পারে না। মা বলে সব ভগবানের দয়া। মাস্টারমশাইও তাই বলেন। সেও তাই বিশ্বাস করে। তাই মনে পড়লেই ছুটে ছুটে গিয়ে রথের সব ঠাকুর মন্দির ঘরে ঘরে প্রণাম করে আসে, কোন কোন ঠাকুরকে দু'তিনবার, বিশেষ মা কালী আর শনিঠাকুরকে। মা বলে শনিঠাকুর বলতে নেই, বলতে হয় বড়ঠাকুর। কাঁচাখেকো দেবতা।

বেণুর সবচেয়ে খারাপ লাগে যখন ক্লাসে সে উপস্থিত থাকে অথচ নাম ডাকে না। তাদের স্কুলের নিয়ম একমাসের মাইনে বাকি পড়লেই হাজিরা খাতা থেকে নাম কাটা যাবে। পরে জরিমানা শুদ্ধ মাইনে দিলে তবে খাতায় নাম উঠবে। বেণুর ক্ষেত্রে এটা প্রায়ই ঘটে। ক্লাসশুদ্ধ সব ছেলের নাম ডাকছে অথচ তার নাম ডাকছে না। বেণুর তখন মনে হয় সব ক্লাস যেন তারই দিকে চেয়ে বলছে এই ছেলেটা মাইনে দিতে পারে না তো এ স্কুলে আসে কেন? তার হাজিরা যেন দাঁত বার করে তাকে ব্যঙ্গ করতে থাকে।

এ রকম সময় সে স্কুলে যেতে চায় না। বিভাবতী রুষ্ট জিজ্ঞাসা করে, 'কিরে ইস্কুল যাবি নি?'

'না'।

'ক্যানো? শরীল ভালো নেই?'

'ভালো আছে।'

'তাহলে কামাই করবি ক্যানো?'

'কামাই করি আর যাই করি কিছুতো এসে যাচ্ছে না। নামই ডাকে না ইস্কুলে।'

'নাম ডাকে না ক্যানো?'

'বারে! আমার মাইনে কি শোধ আছে। রোজই তো তুমি আজ দিচ্ছি কাল দিচ্ছি করছো। মাইনে বাকি পড়লেই নাম কাটা যায়। ক্লাসে এ্যাতো লজ্জা করে। সকলের নাম ডাকছে আমার ডাকছে না।'

বিভাবতী বলে, 'ঐতো তোমার আছে খালি লজ্জা আর লজ্জা। এ্যাতো লজ্জা তো আমার পেটে এলে ক্যানো?'

বেণু অভিমান করে বই খাতা নিয়ে স্কুলের দিকে চলে যায়। তার কান্না পায়। সব দোষ যেন তারই। বিভাবতীর পেটে আসাটাও যেন তারই দোষ তারই অপরাধ। মায়ের পেটে সে এল কখন, কেমন করে তার কিছুই জানে না অথচ দোষ হোল তার! এ এক আচ্ছা মুস্কিল হো!

একুশ

নবগোপাল একখানা ঘর ছেড়ে দিয়েছেন। সেই ঘরে ভাড়াটে বসিয়েছে বিভাবতী। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের এক বিধবা, কুড়ি একুশ বছরের রোগা ডিগডিগে চেহারার একটি ছোকরা আর বারো তেরো বছরের মুখে বসন্ত দাগওলা কালো একটি বউ। বিধবাটির নাম সুবালা। ছোকরাটি তার ভাই। বউটি তারই বউ। ঘরটার ভাড়া হয়েছে মাসিক তিন টাকায়। নবগোপালের বারান্দার মাঝখানে একটা ছোট বাঁশের বেড়ার আড়াল তুলে দিয়েছে বিভাবতী। তোলা উনুনে সেই ছোট ভাড়াটেরা রান্না বান্না করে।

বিধবাটি লোকের বাড়ি ঠিকে ঝিয়ের কাজ করে। কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। ভাইটা কোথায় যেন টিনের বাক্স তৈরির কারখানায় মজুরি খাটে আর বউটা সংসারের যাবতীয় কাজ করে। বারো তেরো বছরের বউটা একলাই রান্না করে, ঘর মোছে, বাসন মাজে বিধবা ননদের পা হাত পা টিপে তার আর রাত যায়। মার খায় কখনো স্বামীর কাছ থেকে কখনো ননদের কাছ থেকে। কোনো একটু অপরাধ যদি হয়, পান থেকে চুন খসে তো রক্ষে নেই। স্বামী আর ননদ পালে পালে তার ওপর হাত চালায়। বউটা চেঁচিয়ে কাঁদে খানিক। আবার কাজ করতে যায়।

সুবালা মাঝে বেণুদের দাওয়ায় ভোলা-নাথের চৌকিতে শোয়। তার ভাই আর

বড়টি পড়ে থাকে।

সুবালা এমনিতে ছটফটে হাসিখুশি। বাইরের লোকের সঙ্গে পাড়ার লোকের সঙ্গে বিভাবতী মঙ্গলার সঙ্গেও খুব ভাব জমিয়ে নিয়েছে। তাকে ছোটাছুটি সবাই পছন্দ করে। বিভাবতী মঙ্গলাকে টিপি টিপি করে। হাতের কাজকর্ম টেনে নিয়ে করে দেয়।

কৃষ্ণবেণী প্রথম হয়ে বাপের বাড়ি এসেছিল গতবছর। প্রথম সন্তান বাপের বাড়িতে হওয়াই নিয়ম বলেও গোবিন্দর তেমন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু গোবিন্দর বাড়িতে কোন স্ত্রীলোক নেই এবং তার নিজেরও সাংসারিক অভিজ্ঞতা থাকায় বাধ্য হয়েই পাঠিয়ে দিয়েছিল কৃষ্ণবেণীকে বিভাবতীর কাছে।

একটা মেয়ে হয়েছে তার। ঐ সময় খুব সাহায্য করেছিল সুবালা। কৃষ্ণবেণীকে দেখাশোনা করা, তার মেয়ে সামলানো, তেল মাখিয়ে রোদে দেওয়া এবং করে কৃষ্ণবেণীর মন জেতে নিয়েছিল সে। শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবার সময় বারবার করে সুবালাকে নেমন্তন্ন করে গেছে কৃষ্ণবেণী বারাসাত যাবার।

বেণুও সুবালাকে পছন্দ করে। সুবালা-মাসি খাওয়া হওয়ার পর রাতে ঘুমোতে যাবার আগে পর্যন্ত তার রাক্ষসী খেলার সাথী। কখনো বা পুতুল খেলার সুবালা মঙ্গলাকেও ঠাট্টা করায়। এছাড়া আরো একটা আশ্চর্য কাজ করেছে সে। বিভাবতীকেও একদিন পুতুল খেলতে বসিয়েছিল। বিভাবতীও যে অত বয়সের মত হাসতে পারে সেদিনই বেণু প্রথম জানল। বিভাবতীও যে খেলতে খেলতে ছোট মেয়ের মত আনন্দ করতে পারে সেটাও প্রথম দেখল সে। আর তাকে মায়ের এ এক অদ্ভুত। একেবারে অবাক করে দেবার মত।

সুবালার বয়স কম। তার উৎসাহ অনেক। নানা জায়গায় বেড়াতে যাবার সুযোগ খোঁজে সে। মঙ্গলা তাতে খুশি। কিন্তু বিভাবতী রাজি হয় না। তবে সুবালার প্রভাব এড়ানো শক্ত। মাঝে মাঝে জোর করে টেনে নিয়ে যায় কীর্তন শুনতে, কথকতা শুনতে, বিকেলে কোনও ব্যারিস্টার চক্রবর্তীর ভাগবত পাঠ শুনতে। অনেক ঠাকুরবাড়িতে এসব হয়। মদনমোহনের মন্দিরে তো নিত্য এসব লেগে আছে।

পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে বেণুও যায়। মা তাকে বারণ করে, 'পড় এখন। তুই যাসনি।'

বেণু বলে, 'হয়ে গ্যাছে পড়া।'

বিভাবতী জানে বাইরে পড়ুক না পড়ুক ছেলে ঠিক পাস করে। অতএব ছেলে যখন পড়া হয়ে গ্যাছে বলে অবিশ্বাসের কোন কারণ ঘটেনা। বেণুও কথকতা শোনে, বসিয়ে বসিয়ে ভাগবত পাঠ শোনে। বৃদ্ধ ব্যারিস্টারের সুরেলাকণ্ঠে ভাগবত পাঠ শোনে ও মাঠের শেষে তার সমাধি ভাবে। তখন বিধবা বৃদ্ধা মহিলা ঘোর হল কেউ তাঁকে পাখা দিয়ে বাতাস করে, কেউ কম্বলে শোয়ায়, কেউ তাঁর মাথাটা কোলে নিয়ে বসে। সবাই কাঁদে বিশেষ করে বয়স্কা বিধবারা তো। সুবালাও কাঁদে খুব। মহিলাদের অনেকেরই ভাবসমাধি হয়।

বাড়ি এসে মঙ্গলা বলল, 'সব চরিত্র দেখ! গোঁসাইয়ের মাথাটা কোলে নেবার জন্যে কি কাড়াকাড়ি পড়ে যায় বাবা। বড়লোকের ছেলে, সুকণ্ঠ, খুব ভালো গান গায় বাস্ মাগিদের ঢলাঢলি দ্যাখে কে! যে আগে মূর্ছা যাবে তার জন্যে মারামারি।'

বিভাবতী কোন মন্তব্য করে না। সে গান শুনে কাঁদেও না। বেণুর মনে প্রশ্ন জাগে মা এসব কি বুঝতে পারে? কে জানে!

স্কুলের ছুটিছাটার দুপুরের কাজ না থাকলে বেণু বারাসাত চলে যায়। একা একা বাসে চেপে। কলকাতার গলি ছেড়ে বেরোলেই তার ভালো লাগে। আরো ভালো লাগে বেলগাছিয়া ট্রাম ডিপো ছাড়ালেই। ফাঁকা মাঠ। ধান মাড়কোল গাছ। আম কাঁঠালের বাগান। আরো এগোলে সবুজ মাঠ। ধানের ক্ষেত। নীল আকাশ। প্রাণ ভরে দম টানে ও। আঃ!

গোবিন্দ ছুটির আগেই লেখে চিঠি, বড় স্ট্রেট চলে এসো। ছুটিটা এখানে কাটিয়ে যাও হে।

একদিন সে বারাসাত যাবে শুনে সুবালা বলল, 'চল বেণু, আমিও তোমার সঙ্গে যাই। কৃষ্ণটা অত করে বলে গ্যালো তা যাওয়া আর হয় না।'

বেণু বলল, 'বাবুদের বাড়ি কাজে কামাই করবে?'

সুবালা বলল, 'হোকগে। অত্ত খাটালে অনেক কাজ মিলবে'।

পরদিন ভোরবেলা দুজনে হেঁটে হেঁটে চলে এল বেলগাছিয়া। ওখানে ট্রামডিপোর পাশ থেকে বারাসাতের বাস ছাড়ে। দু'ঘণ্টা অন্তর অন্তর বাস। যশোর রোড ধরে সোজা চলে যায় বসিরহাট বারাসাতের ওপর দিয়ে।

ওরা যখন পৌঁছল তখনি প্রথম বাস-খানা ছেড়ে গ্যাছে। আবার ঘণ্টা পরে বাস।

সুবালা বলল, 'বেণু হেঁটে যাবে?'

প্রস্তাব শুনে বেণু হাঁ হয়ে গেল। বলল, 'হেঁটে বারাসাত? সে তো অনেক পথ মাসি।'

সুবালা বলল, 'তা হোক না। এইতো যশোর রোড ধরে সোজা পথ। হাঁটতে হাঁটতে চল এগোই। না পারলে পথের

থাকে বসে থাকবো। বাস তো এই পথ ধরেই যাবে উঠে পড়বো।'

বেণুর বুদ্ধিটা ভালো লাগল। জায়গার প্রথম। সকালে চমৎকার মিঠে হাওয়া। রোদ্দুর তেমন লাগছে না গায়ে। হাঁটতে ভালোই লাগবে। সে বলল, 'হ্যাঁ মাসি তাই চল। আর মাঝরাস্তা থেকে বাসে উঠলে ভাড়াও কম লাগবে তো।'

বেলগাছিয়া ট্রাম ডিপো ছাড়ালেই শহরের সীমানা শেষ। শুরু হোল চওড়া চকচকে পিচ বাঁধানো বড় রাস্তার দু'পাশে বড় বড় গাছ। দেবদারু কৃষ্ণচূড়া শিরীষ নিম। দু'পাশে বড় বড় বাগান। সে সব বাগানে ফলের গাছ ফুলের গাছ। পাখি ডাকছে দু' একটা। বাগানে বড় বড় পুকুর। পুকুরে হাঁস চরছে। কোন পুকুরের মাঝখানে জলটুঙি। পথে গাড়িঘোড়া বিশেষ নেই। মাঝে মাঝে দু একটা গরুর গাড়ি চলেছে। যে সব লোক চলাচল করছে তারা বেশির ভাগ গ্রামের লোক।

এক সময় বারাকপুরের রোডে পৌঁছে গেল। বাঁদিকের পথটা চলে গেছে বি টি রোড। মোটা মুরের কোঠাবাড়ি। একটা মিষ্টির দোকান। ওরা রোডের ফলকটায় বসল। চারপাশটা চেয়ে চেয়ে দেখল বেণু। বাঁ দিকটা বেশিটাই ফাঁকা জলা। ডান দিকে বাগান। দু একটা খোড়ো চালার বাড়ি।

'বেণু কিছু খাবে?' সুবালা বেণুকে জিজ্ঞাসা করল।

বেণু বলল, 'না। শুধু একটু জল খেতে পারলে হোত।'

একটা পয়সা দিয়ে সুবালা বলল, 'যাও, ঐ দোকানে কিছু খেয়ে জল খেয়ে এসো।' পয়সাটা তার হাতে দিয়ে দেন সুবালা।

সুবালার কাছ থেকে পয়সা নিতে লজ্জা করছিল বেণুর। আজকাল মা ছাড়া কারো কাছ থেকে খাবার বা পয়সা নিতে তার সংকোচ হয় তার। সে বলল, 'না না, পয়সা তো আছে আমার কাছে।'

সুবালা বলল, 'তা থাক, মাসির কাছে একটা পয়সা নিলে কিছু দোষ হয় না।' বলে জোর করে পয়সাটা তার হাতে গুঁজে দিল।

বেণু বলল, 'তোমার জন্যেও কিছু আনি'।

সুবালা বলল, 'না, আমার কিছু দরকার নেই। তুমি জল খেয়ে এসো।'

এক পয়সার মিছরি আর জল খেয়ে বেণু ফিরে এল। সুবালা বলল, 'আর হাঁটতে পারবে, না গাড়ির জন্যে এখানেই অপেক্ষা করবো?'

বেণু বলল, 'না না মাসি, চল না যাই এগিয়ে।'

এই সুন্দর পথ হাঁটাটা নেশার মত পেয়ে বসেছে এখন তাকে। বাসে বসে এই পথের দৃশ্য সব এমন করে উপভোগ করা যায় কি! বললুম আর জল খেয়ে চলে গেলুম।

উড়োজাহাজ মাথার ওপর কাছে এসে বেণু বলল, 'মাসি ফাঁকা মাঠের মাঝখানে ঐ একটা গুদামের মত বাড়ি ওটা কি গো?'

সুবালা জানে না। পথচলতি লোক ধরে জিজ্ঞাসা করে জানল ওটা হোল এরোড্রোম। উড়োজাহাজ নামে ওঠে। বেণু আনন্দে লাফিয়ে উঠল। আকাশে যখন উড়োজাহাজ ওড়ার আওয়াজ পায় বস্তির সবাই তখন বাইরে এসে হাঁ করে চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। এটা একটা মস্তবড় বিস্ময় সবার কাছে। পাখির মত উড়ছে কিন্তু পাখি নয়। মানুষ আছে তাতে বসে সে ওড়াচ্ছে। অতবড় ভারি জিনিসটা ভেসে ভেসে চলেছে বাতাসে! অবাক কাণ্ড! সেই উড়োজাহাজের আড্ডা এত কাছে।

বেণু বলল, 'চল না মাসি যাই।'

লোকটা বলল, 'এখানের থেকে তাকাচ্ছে কাছে বটে কিন্তু দূর আছে খোকা। সোজা একক্রোশ পথ।'

সুবালা বলল, 'না বেণু, বারাসাত যদি হেঁটেই যাও তাহলে এমনিতেই পৌঁছতে বেশি হবে আবার একক্রোশ যাওয়া আসায় আরো বেশি হবে। কাছে গিয়ে কি হবে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে বেশ।'

একটু পরেই বেণুর আশা আকাঙ্খাই মিটল। আকাশ থেকে ঘুরে ঘুরে সেই আশ্চর্য জিনিস একটা নামতে লাগল। রাস্তার থেকেও বেশ ভালভাবেই দেখা যাচ্ছে। পাক খেতে খেতে একটু একটু করে নামতে নামতে এরোপ্লেনটা নেমে পড়ল ওধারের মাঠের মধ্যিখানে। তার পর তীব্রবেগে ছুটতে লাগল। নামছে। এ-বা ছুটছে— মাঠ বরাবর সোজা এখুনি কোথাও গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। কিন্তু না। থেমে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করল বেণু।

পথ অনেকটা চলছিল। গৌরীপুর থেকে বেশ খানিক বাঁ হাতে রাজপুরের পথ শুরু হোল। পথের দু'ধারে বড় বড় গাছের সারি যাচ্ছে। গাছের বড় বড় ডালপালা আর নতুন গজানো পাতার মধ্যে মাথায় কে যেন পাতার চাঁদোয়া দিয়ে ঢেকে রেখেছে। হঠাৎ নাকে এল মন মাতানো একটা তীব্র সুবাস।

'মাসি, কিসের গন্ধ বলতো?'

'কি জানি, বুঝতে পারছি না'

বেণু বুঝতে পেরেছে। মনে পড়ে গেল তার দাদামশাইয়ের সঙ্গে প্রথম বারাসাতে এসে এই গন্ধ পেয়েছিল।

বলল, 'আমের বোলের গন্ধ! কি সুন্দর না?'

একজন বুড়ো চাষা চষী দুটো গরু নিয়ে যাচ্ছে। কাঁধে তার লাঙল। মুখে খোঁচা

ঘোড়া গাড়ি থেকে। পরনে একটা ঢোলা কুর্তা। কালো হাত কিলবিলিয়ে বেরোলো। বেণুকে দেখে বলল, 'কাকে যে খুঁজিতো খোকাবাবু?'

বেণু বলল, 'কোলকাতা।'

'যাবা কমনে গো?'

'হাটখোলা'।

'হাটখোলা? কার বাড়ি যাবা?'

'হাটখোলার গোবিন্দবাবুর বাড়ি।'

'গ্যাঁটাবাবুর বাড়ি! তা এ্যাতোটা পথ হেঁটে হেঁটে যাবা? বাসে এলিই পারতে।'

বেণু বলল, 'হাঁটতে বেশ লাগছে তাই—'

লোকটা বলল, 'ও। পথ কড়ি খাওয়াতে বেরিছো। তা যাও খাওয়াতে খাওয়াতে চলি যাও আর দূর নেই। এইতো মহাদেবতলার মোড় পার হলি কোলবাগের গেলি হাটখোলা পেরি যাবা।' বলে লোকটা গরুগুলোকে হ্যাট হ্যাট করতে করতে মাঠে নেমে গেল।

বেলা বারোটা নাগাদ পৌঁছল ভুবনেশ্বরীর শ্বশুরবাড়ি। ভুবনেশ্বরী তো রীতিমত বিস্মিত। বিশ্বাস করতে চায় না যে অতটুকু ছেলে কলকাতা থেকে এতটা পথ হেঁটে এসেছে। বলল, 'তোরা কি পাগল না কি!'

ভুবনেশ্বরী খুবই রোগা হয়ে গ্যাছে।

বেণু জিজ্ঞাসা করল, 'ভুবন, তুমি যে আধখানা হয়ে গ্যাছো। ব্যাপার কি!'

ভুবনেশ্বরী বলল 'আর বোলো না দাদা, রোগ জ্বর। ম্যালেরিয়া ধরেছে।'

'তা ওষুধপত্তর খাচ্ছো না?'

'ও রোগের আবার ওষুধ। ওই গোটা দিন থেকে কুইনাইন এনে মুঠো মুঠো খাই। আসতে না আসতে হাসপাতালের কম্পাউণ্ডারবাবু ইনজেকশন দিয়ে যায়। মেয়েটারও ধরেছে।'

মেয়েটাও হাড়সার হয়েছে।

ভুবনেশ্বরী বলল, 'কুইনাইন খেয়ে জ্বর বন্ধ হয় বটে কিন্তু কান মাথা ভোঁ ভোঁ করে। আজকাল কানে ভালো শুনতে পাই না'।

বেণু প্রতি বার আসছে আর চারপাশ দেখে বুঝতে পারছে যে এদিককার অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। একসময়ে যে বাড়ি ঝকঝক তকতক করত আজ চারদিকে ঝুল ময়লা ঝুলছে। গোয়ালঘরের চালাটা উড়ে গ্যাছে। সেখানে অনেকদিন চুন পড়েনি।

গোবিন্দ খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে গেল। লাঠি দিয়ে পা টেনে টেনে হাঁটে। পায়ের গাঁটে বড় বড় ফুলো। অর্ডার দিয়ে বড় বড় চটি তৈরি করে সে পরে। সাধারণ চটি পায়ে ঢোকে না। আর তার ব্যথা নেই। গোবিন্দ শুধু বাকি পাওনার তাগাদায় ঘোরে।

ওকে দেখে বলল, 'বড়কুটুম যে! খুব শাইনাইজ দিয়েছ হে। বেশ করেছ। যাও এ্যাখন চান করে খাও। আগে থেকে চিঠি দিয়ে এলে তাদের মতো ভিজতাম টাকা পেতো। হাটখোলার ছাড়া তো উপায় নেই কিছু খাবার তাগো আনোই।'

বেণু মাথা নিচু মুখে বলল, 'আমার ঠিক ছিল না। দু'দিন ছুটি পড়ে গেল ইস্কুলের তাই ভাবলুম—'

'বেশ করেছ বেশ করেছ। যাও এ্যাখন চান টান কর।'

বেণু খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে গেল। বাড়ির সামনে মস্ত একটা বাগান। তার মাঝে পুকুর। পুকুরে অনেক পুঁটি মাছ। সে একটা বাঁশের কঞ্চির ছিপ আর ময়দার গুলি নিয়ে গেল সঙ্গে করে। গতবার এসে হাট থেকে হুইল আর সুতো কিনে এই পুঁটি মাছ ধরা ছিপটা তৈরি করেছিল। এ বাগানটা গোবিন্দর এক জ্যাঠার। অতএব তাকে কেউ কিছু বলে না। ঘুঘু-ডাকা অলস নির্জন দুপুর। বঁড়শিতে ময়দার গুলি লাগিয়ে পুকুরে সুতো ছুঁড়ে দিয়ে চুপ করে ফাৎনার দিকে চেয়ে বসে রইল সে। মাছ ধরার ব্যাপারটা কিছুতেই বশ করতে পারেনা। গতবারে তিনদিনের চেষ্টায় দুটো পুঁটিমাছ ধরেছিল। কিন্তু পাশে বসে একটা ছেলে একবেলায় গোটা তিরিশ মাছ ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সে গতবার ছিপ ফেলে ছিপ তোলে হুইলিতে গিঁথে আনে রূপোর মত চকচকে একটা পুঁটি মাছ আর বেণু গতবার ছিপ ফেলে ভাবে হুইলি শূন্য। মাছতো নেই মাছের ঠোকরটাও নেই।

মাছ না পাক তবু তার ভালো লাগে এখানে বসে থাকতে। বাগানটা কলমের বাগান। আম জাম কাঁঠাল গাছের ছায়া। পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদ্দুর এসে পড়েছে মাটিতে। পুকুরের জলে। আর হাওয়ায় কোথা থেকে বুনো বুনো গন্ধ এসে নাকে লাগছে। শিস দিয়ে ডাকছে কোন পাখি আর বেণু ফাৎনার দিকে চেয়ে বসে আছে। শহরে অনুভূতি আর তীব্র হয়ে উঠেছে। আশ-শ্যাওড়ার ঝোপের থেকে আমের মুকুলের গন্ধ, মাটির সোঁদা গন্ধ নাকে নিতে কি ভালোই লাগছে তার। বস্তির ক্যাপসা পচা জলের গন্ধ, সেখানের নরক বা বাড়ি থেকে ভেসে আসা ধোঁয়ার গন্ধ, তার অজানিত বাতাস গন্ধ থেকে কত তফাৎ। সেখানে শ্বাস বন্ধ করে থাকতে ইচ্ছে হয়। এখানে বার বার বুক ভরে শ্বাস নিয়েও আশ মেটেনা যেন। আর কি নির্জনতা! মানুষের গলার কোন আওয়াজই নেই। শুধু পাখির ডাক—পোকা মাকড়ের কুট কুট কট কট শব্দ, ছুটে চলে যাওয়া খরগোসের পায়ের খসখসানি। কেঁউ কেঁউ করে আওয়াজ। পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঝিকিয়ে আসা রোদ্দুরের দিকে দেখতে দেখতে বেণুর মনে হয় কেউ যেন চিত্র-বিচিত্র ছবি এঁকে চলেছে অনবরত। কিছুতেই শহর হচ্ছে না। পুরোনো ছবি

দূরে কোনো নতুন নতুন ছবি আঁকছে বার বার।

বেণুর মনে এখন গান আসে, গান সে গাইতে পারে না কিন্তু গুনগুন করে গলা দিয়ে ঠেলে বেরোতে চায় সুর। পড়ত আসে। মামাবাবুর কথা মনে মনে নাড়ায় সে। কিন্তু বার বার ভুলে যায় আবার নতুন কথা শোনায়। অত্যধিক খোঁজে পাছে পাছে অত পাখি/কহিতেছে পাখি পাখি— ভাবনা?

বিকেল বেলা অবকাশ বাবার আগে তিন ঘণ্টার দিয়ে বাড়ি ফিরে এলো বেণু। হাতে তার একটা আধ ইঞ্চি পরিমাণ পুঁটি-মাছ। বেণুদিদি পই পই করে বলে দিয়েছে বিকেলের আগেই বাড়ি ফিরতে। পাহাড়ে পাহাড়ে যেন না ঘোরে। ভাজনাগ অনেক বেড়েছে। এ বাড়ির উঠোনেও মাঝে মাঝে দেখা মেলে তাদের।

বাড়িতে এসে দেখল কুসুমবতী আর সুবালা কিসব রান্নাবান্না করছে। খুব জমছে।

'কি করছো দেখি?'

কুসুমবতী বলল, 'এসেছিস? এই দ্যাখ না দিদি কি তৈরি করছে সব।'

'কি দারুণ! আলুর চপ, বেগুনি? ইস্ একেবারে দোকানের মত দেখতে হয়েছে।'

বেণু খেয়ে দেখল। অবাক কাণ্ড! খেতেও ঠিক দোকানের মত হয়েছে! তার ধারণা দোকানে যে সব খাবার বিক্রি হয় বাড়িতে করলে মোটে দোকানের মত স্বাদ হয় না।

কিন্তু করেছে সুবালা। অতএব দোকানের মত হবেই। সুবালার স্বামীর দোকান ছিল তেলেভাজার বেণুদের পাশের বস্তিতে। সুবালা স্বামীকে খুব তৈরি খাবার যোগাড়ে সাহায্য করত। এখন স্বামীর মৃত্যুতে সুবালা টিকে কি।

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল গোবিন্দ। বলল, 'খুব ভালো হয়েছে, চমৎকার হয়েছে। এখানে এমন দোকানেও পাওয়া যায় না। এখানে শুধু সিঙাড়া আর নিমকি। এটা আপনার বোনঝিকে শিখিয়ে দিতে হবে তো মাঝে মাঝে মুখ বদলানো যাবে।'

বোনঝি হাসিমুখে তার বাপিকে বলল, 'হ্যাঁ, বোনঝির হাতে স্বাদ কম তো, বসে বসে এমন করে খাওয়াবে।'

'মামাবাবু, আপনি এ্যাতোসব কি লেখালেখি করেন?' খাওয়ার পর গোবিন্দর লেখাপড়ার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে বেণু জিজ্ঞাসা করল। গোবিন্দর টেবিলে স্তূপীকৃত কাগজ। গোবিন্দ এক একটা কাগজ নিয়ে চোখের সামনে আতশী কাচ রেখে পড়ছে তারপর একটা খাতায় টুকছে কিছু।

'এসব হচ্ছে অঙ্ক।'

'অঙ্ক! কি অঙ্ক এ্যাতো?'

'এসব তুমি বুঝবে না। এ হোল হায়ার ম্যাথেমেটিক্স'।

'কি হবে এসব অঙ্ক দিয়ে?'

গোবিন্দ এবার আতশীকাচ আর পেন্সিলটা টেবিলে রেখে দিয়ে বলল, 'তাহলে বলি তোমায়। সব অঙ্কের কিছু ফর্মুলা বা নিয়ম আছে বুঝলে? তুমি এ্যালজেব্রা শিখছ?'

'হ্যাঁ, এই বছর থেকে দিয়েছে ইস্কুলে।'

'হ্যাঁ, এটা তো তোমার ফোর্থ ক্লাস হোল তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

গোবিন্দ বলতে লাগল, 'এই এ্যালজেব্রার বড় একটা ফর্মুলা আছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার। তার রেজাল্ট কি? না এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার। এই রেজাল্ট সব জায়গায় সব সময় একই হবে তাই হওয়া উচিত, তাই নিয়ম। দুই আর দুইয়ে যেমন চার হয় তেমনি।'

বেণু অবহিত, বলল, 'হুঁ'।

'এই রকম এর এক দিক থেকে কথা হয় এমন অঙ্কের কিছু ফর্মুলা বহুকাল যাবৎ চলে আসছে কিন্তু হঠাৎ একজন লোক দেখতে পেলেন সেই ফর্মুলাগুলো ঠিক নয়, ভুল। অর্থাৎ ধর দুই আর দুইয়ে চার না হয়ে হচ্ছে পাঁচ কিংবা তিন। এটা তো হবার কথা নয়।'

বেণু বড় বড় চোখে মামাবাবুকে দেখতে দেখতে বলল, 'কে করে বার করল এই ভুলটা? আপনি? কিন্তু আপনি তো ম্যাট্রিক পাশ। আপনি কি করে এত এত দিন ভাবেন অঙ্ক—'

গোবিন্দ হাসল অল্প। বলল, 'না আমি নই। আমার অতটা ক্ষমতা নেই। যিনি করেছেন তিনি একজন মানুষ। আমার বন্ধু, একজন রাশান।'

বেণু বলে উঠল, 'আমি জানি। বিবেক-বাবু। না?'

'তুমি তাঁকে কি করে জানলে?'

'উনি অনেকদিন আগে একদিন আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন। হঠাৎ দুপুর-বেলা। সেদিন আমি ইস্কুলে যাইনি বাড়িতে ছিলুম। ওঁর মস্ত দাড়ি আছে না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত?'

গোবিন্দ বলল, 'হ্যাঁ। মাস তিনেক আগে উনি মারা গ্যাছেন। কিন্তু উনি যে তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন তা তো আমায় বলেন নি।' গোবিন্দ একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'হয়তো ভুলেই গিয়েছিলেন। যা ভুলো মন ছিল তাঁর। অঙ্ক ছাড়া আর কিছু খেয়ালই ছিল না। সংসারটাও দেখতেন না। যাক্ সে তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন কেন হঠাৎ?'

বেণু বলল, 'উনি কড়া নাড়ছিলেন আমি দরজা খুলে দিলুম। উনি জিজ্ঞাসা করলেন এটা কি বারাসাতের গোবিন্দর মামাবাড়ি? আমি বললুম হ্যাঁ। উনি বললেন, তুমি তার কে হও? আমি বললুম। তখন

বললেন তোমার হাতে থাকে। হাতে রেখে দিয়ে যেতে বললেন, তুমি না থাকলে আমার দেখে বললেকোটাই হবে। তোমাকে তুমিই বলি। আমি বিজেন বাঁড়ুজ্যে। বারাসতে থাকি। আমি গোবিন্দর বন্ধু। বড় ভালো বন্ধুত্বের মত। এ খাতা তোমার কাছে দুটো থাকবে। বা তবে তাড়াতাড়ি রেখেছে দিয়ে গেলেন।'

তারপর বেণু একটু থেমে গেল। পুরনো কথা মনে পড়ায় হাসি পেল তার। বলল, 'জানেন দাদাবাবু, বিজেনবাবু না থাকে খুব ভুগিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন!'

গোবিন্দ বলল, 'কি রকম?'

'উনি তো সব সময় চৌকিতে বসে হাতের পুঁটুলি খুলে কেবল খেতে একটা মোটা বই খাতা আনতেন তারপর আমায় বলতেন, 'খোকা একটু কাগজ দাও তো।' আমি কাগজ দিতে উনি কি সব লিখতে লাগলেন বই দেখে। উনি খেতে বেশ ভালবাসতেন। মায়ের কথামত দুই আর মিষ্টি দিয়ে এনে দিলুম। কিছুতে খাবেন না। বললেন এখন থাক, ভাত খাবো। মা বলতে হলো ভাত হতে দেরি হবে। এখন ওগুলো খেয়ে নাও। উনি মিষ্টি খেতে খেতে অঙ্ক কষতে লাগলেন। মা নতুন হাঁড়ি কোথায় পেল তাতে সব সেদ্ধ করতে চাপিয়ে দিল খোকা মিতামিতি উত্তরে। একটু পরে আমায় বলল, ওখানে বল ভাতটা হয়ে গ্যাছে নামিয়ে দিন। বিজেনবাবু শুনে অবাক হয়ে গেলেন, বললেন, ক্যানো আমি ক্যানো? তোমার মায়ের হাতে কোন অসুখ হয়েছে নাকি। আমি বললুম না আপনি বামুন তাই। উনি তো হো হো করে হেসে উঠে গায়ে জড়ানো চাদরটা খুলে ধরলেন দেখতো। কোনো পৈতে আছে? আমি বামুন মানুষ নই। মাকে বল ডিমিই বেঁধে খাওয়াবেন। আর তা যদি না করেন আমি চললুম। তখন মা আর কি করে। নিজেই ভাত নামিয়ে বেড়ে খেতে দিল। মা এখনো বলে লোকটা আমায় দিয়ে পাপ করিয়েছে।'

গোবিন্দ হাসল। বলল, 'ঐ রকমই ছিল বিজুদা, জাতপাত কিছু মানতো না। মুচি বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে রেখে খেয়ে আসতো।'

বেণু জিজ্ঞাসা করল, 'বিজেনবাবু কী পাস ছিলেন দাদাবাবু?'

গোবিন্দ বলল, 'আমি তো শুধু একটা পাস করেছি। ওঁর বিদ্যে ছিল হাইস্কুলের ফিফথ ক্লাস অবধি। গরীব ছিলেন তো খুব। আর পড়া হয় নি।'

বেণু অবাক। 'সেকি! ক্লাস নিচের দিকে দিলে—'

'সারা জীবন অঙ্ক করে গ্যাছেন বিজুদা। ইস্কুলের পড়াটাই কি সব! ওঁর চিন্তা ধারণ করার মত ছিল ঐ সব।'

একটু থেমে আবার বলল গোবিন্দ, 'কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে বিজুদার ঐ ইউনিভার্সিটির ছাপগুলো নেই বলে কেউ পাত্তা দায় নি। সবাই পাগল ভেবেছে। সবাই তাকে হটিয়ে দিয়েছে। তাই তো উনি মারা যাবার পর আমি সেই কাজের ভার নিয়েছি। আমি প্রমাণ করে দেখাবো বিজুদা পাগল ছিলেন না।' গোবিন্দ কাগজপত্রগুলোর পাতা উল্টে হাত বুলোতে বুলোতে বলল আবার, 'বিজুদা খুব পরিশ্রমী ছিলেন, কোন কাজ তো [illegible] করেন নি। উনি মারা যাবার পর ওঁর বাড়ি থেকে সব কাগজপত্র পাওয়া গেছে আমি যোগাড় করে এনেছি। প্রায় সব খাঁটি জিনিষ। যখন যাতে পেরে-ছেন তাতেই অঙ্ক কষেছেন। এই ভাবে—

গোবিন্দ তাকালো একটা হলুদ কাগজের পাতে অঙ্ক কষেছেন বিজেনবাবু। এছাড়া খবরের কাগজের টুকরো, ঠোঙার কাগজের টুকরো সবেতেই অঙ্ক কষা হয়েছে।

গোবিন্দ বলল, 'এগুলো আমি সব সাজাবার চেষ্টা করছি। তারপর বই করে ছাপিয়ে পাঠাবো সব বড় বড় ম্যাথেমেটি-শিয়ানদের কাছে। বলবো ভাখো, আমরা এইসব ভুল ধরেছি তোমাদের। হয় আমাদের থিওরি ভুল প্রমাণ কর, নয় স্বীকার করে তোমাদের ভুল শুধরে নাও।'

বেণু দেখল তার দাদাবাবুর মুখে চোখে অদ্ভুত জেদের ছাপ। মনে হোল উনি যা বলছেন তা করবেনই।

মাঝিবেলা কুসুমেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করল বেণু, 'হ্যাঁ দেখছি, দাদাবাবু কতরাত অবধি লেখাপড়া করে?'

'তার কি ঠিক আছে। দুটো তিনটে। কোনদিন সারারাত।'

'বল কি! ঘুমোয় না?'

'বিজেনবাবু মারা যাবার পর থেকে সেই যে কাগজপত্তর নিয়ে এসেছে দুটোর মাথায় চাপিয়ে তারপর থেকে এই চলছে। কি যে হবে ওই ছাইপাঁশ নিয়ে। এদিকে তো গয়না বিক্রি করে সংসার চলছে। বাবলা তো বেটিই বলতে গেলে।'

একটু চুপ করে থেকে কুসুমেশ্বরী আবার বলল, কিছু বললে বলেন আমি নাকি অপয়া, আমায় বিয়ে করেই নাকি সংসারের এ হাল। অথচ এদিকে ঠাকুর দেবতা কিছু মানেন না।'

বেণু ভাবতেই পারে না তার মনন লক্ষ্মীর মত বৌদিকে কেউ অপয়া হতে পারে। সে বলল, 'না, কখখনো না।'

কুসুমেশ্বরী অবাক হয়ে বলল, 'কি কখখনো না রে বেণু?'

'তুমি অপয়া হতেই পারো না। হতেই পারো না।' বলে বিবির বুকে মুখ গুঁজে দিল বেণু।

কুসুমেশ্বরী তাইতো মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'কিন্তু কথাটা তো সত্যি ভাই। বিয়ের পর এসে দেখেছি

তো কি ঝকমকে ঝলমলে, বেনিয়াটোর, চাদোর, কাপড়ের। কত লোকজন। পুজোর সময় এই বড় বড় ঠাসা কাপড়। বিক্রী হয়ে যাচ্ছে সব। কিন্তু খুকুরাও গেল না। কি রোগে যে ধরল আর সব গেল।'

বেবুর বাবার সময় কেটে যুবরেখাটী হাত বুলোতেই থাকেন। বেবু বুঝল না যে তার বেদনা কিসের দাগ কাটছে। যুবরেখাটীর শাড় এককোণ। তার কাঁধটাও বড় নীরব।

বাইশ

একদম গোবিন্দ খুব খুব করে কেঁপে উঠল। খোঁড়া পা নিয়ে বহুবারের মতো সারা কলকাতা শহর চষে বেড়াতে লাগল। বড় বড় অফিস প্রোফেসর, বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের সব বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত, উপাচার্য, কাউন্সিল মেম্বার, কেনকেউ কার কাছে যায় নি গোবিন্দ? তার হাতে বিরাট এক পুঁটুলী থাকে। সেই পুঁটুলীতে অঙ্কের খাতা। বন্ধু বিবেকবাবুর জীবনী। ইংরিজিতে টাইপ করা। তাঁর সংসারকে সাহায্য করার কথা আবেদন। তাঁরা তোমার চলিত বই।

গোবিন্দ যাদের কাছে যায় তাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করে, 'কি বিরাট ভুল হয়েছে এতদিনকার চালু অঙ্কে দেখুন আপনারা। আপনারা একটু ভালো করে নিজেরা বুঝুন তারপর যদি মনে করেন যে আমরা ঠিক তাহলে এই ভুল পদ্ধতি পাল্টে আমাদের সঠিক পদ্ধতি গ্রহণ করুন।'

বেশির ভাগ পণ্ডিতরা অধ্যাপকরা হাঁ হাঁ আচ্ছা বলে সেরে দেন। কেউ কেউ বিবেকবাবুর জীবনীটা পড়ে হাসেন কষ্ট করে। গোবিন্দর বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় মাপতে চান। যখন শোনেন সঠিক পদ্ধতির আবিষ্কারকের বিদ্যার দৌড় হাইস্কুলের মাস্টার আর তাঁর কাজ শিশু প্রচারকের এক্ট্রা পদক, তাঁরা হাসিটা চেপে যান। গোবিন্দ চলে গেলে তার পিছনে বলেন,—'আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছল।' পণ্ডিতদের ঘরে ঘরে ধর্না দেওয়া বিফল হয় তবু দমে যায় না গোবিন্দ।

সহানুভূতিশীল শ্রোতা পেলে তাকে বলে, 'সব ভেস্তা। ভেস্তা সব। পরাধীন দেশের লোক কখনো সাহস করে সাহেবদের বলতে পারে, হ্যাটো সাহেবরা, তোমাদের ভাও। তোমরা ভুল অঙ্ক কষে এতদিন ধরে পৃথিবীতে চালাচ্ছ। আমরা তোমাদের ভুল ধরে ফেলেছি। কেমন, কোনো প্রোফেসর কোনো পণ্ডিত আমরা যে ভুল ধরতে পারেনি অথচ আমাদের সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে আসছে না। কি করে আসবে, সব তো ভেস্তা। সাহস আছে কারো সাহেবদের বিরুদ্ধে কথা বলার?'

বেবুকে স্কুলের হেডমাস্টারমশাই বেতনা দিয়ে ক্লাসে ফিস পাঠিয়ে রেখে আসিয়েছেন। বেবুর বুক টিপটিপানি এখনো কমেনি। হেডমাস্টারমশাইকে স্কুলের প্রত্যেকটি ছেলে ভয় ও ভক্তি করে। শুধু এই স্কুলের ছেলেরা কেন কলকাতার বহু লোক এঁকে মান্য করে। অত্যন্ত সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবী পরনে, চোখে পুরু চশমা আর পায়ে পেশোয়া চটি পরেন। কিন্তু গভীর এই মানুষটি যখন তাঁর ঘরের বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়ান যেন সারা স্কুলবাড়িটা শান্ত হয়ে যায়। অথচ স্কুলের ছাত্র সংখ্যা প্রায় একহাজার। অবিবাহিত শিক্ষায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এই মানুষটি বেবুর কাছে আদর্শ পুরুষ।

ঘরে ঢুকে সে অবাক হয়ে গেল। হেডমাস্টার মশাইয়ের সামনে চেয়ারে বসে গোবিন্দ। হাত টেবিলে ঠুকে ঠুকে বক্তৃতা দিচ্ছে। একপাশে বসে অঙ্কের শিক্ষক সুশীলবাবু। গোবিন্দের অঙ্কের খাতাটি দেখছেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে। হেডমাস্টারমশাই চুপ করে শুনছেন গোবিন্দর কথা। মুখে তাঁর স্মিত হাসি।

গোবিন্দর কথা শেষ হোলে হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'কিঃ পাল, আপনি আমার কাছে এসেছেন কিন্তু আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি?'

গোবিন্দ বলল, 'এইটাকে ছাপিয়ে পৃথিবীর প্রত্যেক ইউনিভার্সিটিতে আর অন্য বড় বড় পণ্ডিতদের কাছে পাঠাবো। এ দেশের লোক কিছু করবে না কিন্তু সাহেবরা গুণগ্রাহী। তারা যদি বোঝে আমরা যা বলছি তা ঠিক তারা নিশ্চয় আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। এ বিষয় আমার বিশ্বাস আছে। আমার অর্থ নেই। বৈদিক সাধর্মিক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আপনি যে ভাবে হোক এটা ছাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।'

খুব চশমার আড়ালে হেডমাস্টারমশাইয়ের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আপনি কিছু কাগজপত্র রেখে যান। সুশীলবাবু অঙ্কে পণ্ডিত লোক। আমি তো আর্টসের ছাত্র। অঙ্ক আমার কাছে দুর্বোধ্য দুরূহ। উনি দেখুন। আরো কিছু ম্যাথেমেটিসিয়ানদের সঙ্গে আলোচনা করুন উনি। তারপর দেখি ছাপানোর জন্য আমি কি করতে পারি।'

গোবিন্দ হঠাৎ হেডমাস্টার মশাইয়ের হাত দুটো চেপে ধরল। তার চোখে প্রায় জল এসে গেছে। বলল, 'মাস্টারমশাই, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। এই প্রথম আমি একজন লোক পেলুম যিনি আমার কথা এত মন দিয়ে সহানুভূতি দিয়ে শুনলেন।'

হেডমাস্টার মশাই বিব্রত বোধ করলেন। হাতটা গোবিন্দর হাত থেকে টেনে নিয়ে বললেন বেবুর দিকে চেয়ে, 'এই যে বেবুর আপনার ভাইপো, না। এসো তুমি, এদিকে এসো দেখছ।'

বেবু গুটি গুটি পায়ে হেডমাস্টার মশাই-

এর টেবিলের ধারে এসে দাঁড়ান। তার চিন্তার অন্ত নেই। কেন বাবাবাবু অত্যে ব্যাপারে হেডমাষ্টার মশাইয়ের কাছেও এসেছে!

গোবিন্দ তাকে দেখে বলল, 'আজ্ঞে হাঁ এইটিই আমার বড় কুটুম।' কেশবাবাবু কখনো বেণুকে শালা বলে না, বলে বড় কুটুম। বেণু লজ্জায় মুখ নামায়।

গোবিন্দ বলল, 'আপনার কাছে আমার আসার কোনো কিছু নেই।'

হেডমাষ্টার মশাই বললেন, 'কি বলব?'

'ও বলছি আমার বাড়ি যায় লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে, স্কুলের কথা জিজ্ঞাসা করলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আর সব প্রশংসা শেষ হয় আপনার প্রশংসায়। আপনার স্কুলের ছেলেরা সবাই আপনাকে নাকি ভীষণ ভক্তি করে আর বেণুর কাছে আপনি স্বামী বিবেকানন্দ। ও বলে আপনাকে দেখলে ওর নাকি ঠাকুর কথা মনে পড়ে। তাই অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়টা করব। তা আজ এসে আপনার সঙ্গে পরিচয় হবে দেখলুম বেণু ভুল বলে না।'

বেণু তো গোবিন্দর উচ্ছ্বাসে বিব্রত বোধ করছিলই। এখন মনে হোল হেড-মাষ্টার মশাইও এই ভাবকথায় অস্বস্তি বোধ করছেন। তিনি তাড়াতাড়ি বেণুকে বললেন, 'দেবব্রত, তুমি কাল একটা হাফ-ফ্রিশিপের দরখাস্ত দিয়ে যাবে আমার কাছে। দরখাস্ত লিখবে তোমার বাবা মারা গ্যাছেন। আর কোন অভিভাবক নেই দাদা ছাড়া। তোমাদের নিজস্ব কোন আয় নেই এইসব, কেমন?'

বেণু অবাক হয়ে ভাবছিল এসব কি ব্যাপার। নিশ্চয় দাদা অথবা বলে কয়ে ফ্রিশিপ করেছে কেশবাবাবু। এত আয়াস লাগে বেণুর কাছে এই নির্ভরশীলতা। লজ্জায় মাথা কাটা যায়। কিন্তু উপায়ও নেই। গত বছর প্রতিবাদে চাকরিটি গেছে টাকা কি করে যে মা জোগাড় করেছে!

বেণু হেডমাষ্টারের কথায় ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানায়। হেডমাষ্টার মশাই বললেন, 'যদি তুমি হাফফ্রি হও তবে সেটা বজায় রাখতে কেবল পড়া তো চলবেই না আর প্রতিবছর 'এ' সেকশনে প্রোমোশন পেতে হবে। নইলে হাফফ্রিশিপ বন্ধ হয়ে যাবে। বুঝেছ?'

বেণু এবারে ঘাড় নেড়ে জানাল বুঝেছে।

দুটি জিনিস কিছুদিন পরে স্কুলে ঘটল। বেণু হাফফ্রি হোল। আর স্কুলের ছেলেরা তাদের এ বছরের প্রথম জিনিস ম্যাগাজিন হাতে পেয়ে দেখল ম্যাগাজিনের পিছনে হরফে কি কতগুলো শব্দ ছাপা হয়েছে। তার মানে কি তারা কিছুই বুঝল না।

তেইশ

গ্রীষ্মকালে যখন মর্নিং স্কুল হয় তখন বেণুর দারুণ মজা। সকাল বেলা ছটা নাগাদ কোনমতে স্কুলে গিয়ে হাজির হও। ঘণ্টা তিনেক কাটিয়ে চলে এস। তারপর সারাদিন অখণ্ড আড্ডা। এসময় পুকুর চং থাকে না। বিভাবতী বসন্ত পুকুর চাঁদ থেকে তোলে এখন। যবের শষ্য বিক্রি হবে। বেণুর কাজ আরো পরে। মাঝি কাজে কখনো কখনো মায়ের সঙ্গে হাত লাগায় কিন্তু তেমন গা নেই দেখে বিভাবতীও তেমন জোর করে না। ভাবে কটা দিন খেলছে খেলুক ফিরে এলে পরেই তো দিনরাত খাটতে হবে ছেলেটাকে।

স্কুল থেকে ফিরেই বই খাতা ছুঁড়ে ফেলে বিছানার ওপর তারপর আয়না ঘরে গিয়ে তেলচিটে ময়লা ইজেরটা কোমরে গলিয়ে নিয়ে একটা ছেঁড়া গামছা কোমরে জড়িয়ে মাথায় পাকিয়ে মাকে যেন খাবড়াতে খাবড়াতে গঙ্গার দিকে ছোটে। পথে ঐ তেলেভাজাওলার দোকানে আধ পয়সার বড়া কিনে মুড়ি আর আধপয়সার ফিরেকটি ধনের মত একটা মুড়কি নেয়। এই খাওয়াটাই সকালের খাওয়া। মায়েরা বলে জলখাবার।

গঙ্গার ঘাটে একে একে বন্ধুর দল জোটে। বেণুর বন্ধুর দল থেকে মেয়েরা বাদ হয়ে গ্যাছে। আটবছর বয়সের পর সাধারণতঃ গৃহস্থ বাড়ির মেয়েরা আর ছেলেদের সঙ্গে মেশে না। বাড়ির বাইরেই বার হয় না তারা।

বেণু ভাল সাঁতার শিখেছে। বাবু ভোলানাথ পালই তকতা করে দিয়ে গিয়েছিলেন। খুব ভাল সাঁতার কাটে। গঙ্গার মধ্যে পর্যন্ত যায়। তবে পাঁচটা বড় রোগা তার, অন্য ছেলেদের থেকে দুর্বলও কম।

কয়েকবছর হলো গঙ্গার মাঝ বরাবর একটা চড়া পড়েছে। বেণু বন্ধুদের সঙ্গে সাঁতার কেটে সেখানে গিয়ে জোটে তারপর চড়ার বালিতে গড়াগড়ি, বালি ছোঁড়া খেলা, চুকিৎ কিৎ কবাডিবল বালি খেলা এসব খেলা হয়। সাঁতার কেটে ফিরে আসে বেলা একটা দেড়টা নাগাদ।

একদিন বিভাবতী প্রচণ্ড মার দিল বেণুকে। সেদিন চড়ায় খেলতে খেলতে বেলা আন্দাজ করতে পারে নি তারা। গঙ্গার ভাটার টান থেকে জোয়ারের টান আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। সেই টানে স্রোতের উজানে সাঁতার কেটে তাদের ঘাটে আসা সহজ নয়। বেণুরা ভাসতে ভাসতে প্রায় দু মাইল দূরে কাশীপুরের ঘাটে গিয়ে উঠল। সবাইর প্রায় আধমরা অবস্থা। তারপর হাঁটতে হাঁটতে যখন নিজেদের ঘাটে এসে পৌঁছল বেলা তখন চারটে বেজে গ্যাছে।

বিভাবতী ঘাটে উদ্বিগ্নমুখে দাঁড়িয়েছিল। দুচোখে তার ধকধক করছে। হাত দুটো নিশপিশ করছে।

বেণু বিভাবতীকে গঙ্গার ঘাটে দেখেই

দেখেছে আর তার বয়েসে কি আছে! তবু একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, 'মা তুমি খাটে এসে—'

কথা শেষ হোল না তার। বিভাবতীর পিছনে রাখা হাতটা মাথার ওপর উঠল। হাতে ধরা ছিল একটা বাঁশের বাখারি। সপাং সপাং করে পড়তে লাগল বেণুর পিঠে বুকে মাথায়, কোথায় নয়!

সে মার দেখতে পথে ভিড় জমে গেল। কেউ বলল, 'এই ছোঁড়া, পালিয়ে যা না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছিস কেনো? আচ্ছা ছেলে তো!'

কেউ বিভাবতীকে বলল, 'আহা, অত মেরো না গো। রোগা ছেলেটা মরে যাবে।'

বেণু পালাল না। একঠাঁই দাঁড়িয়ে মার খেয়ে যেতে লাগল। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল কিন্তু লজ্জায় গলা দিয়ে একটা কথাও বার হোল না তার।

বিভাবতীর মার বন্ধ হোল যখন হাতের পুরোনো বাখারিটা একসময় ভেঙে গেল। তবু রাগ পড়ে না। হাত দিয়ে মারতে মারতে নিয়ে গেল বাড়ি। নন্দবালা অবস্থা দেখে বেণুকে সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'ছি ছি, এমন ভাবে মারতে হয়, এযে দাগড়া দাগড়া হয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।'

সুবালা কাছে বেরোচ্ছিল থমকে গেল। বলল, 'একি চণ্ডালের মত রাগ দিদি!'

বিভাবতী ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'তোমরা সবাই মিলে অত ভালোবাসা দেখিও না। যখন স্যারের সবার সামনে আমার মাথা খারাপ হয়েছে। আমি তো মরেই গিয়েছি বলে ধরে নিয়েছে। আমার বুকের মধ্যে কি হচ্ছে জানতে পারো?'

এবার নন্দবালা বললেন, 'তা সত্যি! বেণু তুমি বুড়ধাড়ি ছেলে হয়েও এমন কাণ্ড করলে কি করে। ছি ছি!'

বেণু আর কখনো মার খাবার ভয়ে মাঠে খেলতে যায় নি।

দুপুরের আড্ডা হাবু মল্লিকদের বৈঠকখানা ঘরে। দুপুর থেকে বিকেল গড়িয়ে যায়। তাস খেলা চলে। টুয়েন্টি নাইন। হাবু মল্লিক থাকে না। খেলাধুলায় কোনদিনই থাকে না সে। থাকে তার জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাইয়েরা যারা ঠিক হাবুর বিপরীত। পড়াশোনায় থাকে মন না তারা। তাদেরই সঙ্গে সারা দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত তাস খেলে। মাঝে মাঝে ক্যারমবোর্ডও খেলে। বিকেলে তাস খেলা শেষে পার্কে যাওয়া। সেখানে খেলার চেয়ে খেলা দেখাটাই মুখ্য আকর্ষণ বেণুর কাছে। ফুটবলে কেউ তাকে নেয় না। তার গায়ে জোর নেই। অল্পতেই হাঁপিয়ে যায়। মাঝে মাঝে ছেলে কম পড়লে গোলকীপার খেলতে কেউ আবার দয়া করে। কিন্তু গায়ে গতরেও জোর নেই। তাই ফুটবলে সে ব্রাত্য।

বেণু স্কুলের ছাত্র। ভাল স্কুলে পড়ে। কিন্তু সারা বছরের ছুটিতে পড়াশোনা করে না বললেই হয়। অভিভাবকহীন বেণুকে পড়াশোনার কথা বলেই না কেউ। খুশিমত পড়ে। খুশিমত খেলে বেড়ায়।

এবারে ফাইনালে উঠেছে সে। এবারের গরমের ছুটিতে সে হাতে পেল নাগাল। 'বাবার বাক্স' বলে একটা বাক্স আছে ঘরে। টিনের তোরঙ্গ। বিভাবতী সেই বাক্স খুলে ঝেড়ে মুছে রাখে মাঝে মাঝে। স্বামীর জিনিসপত্র রাখা আছে সেই বাক্সের মধ্যে। মাঝে মাঝে জিনিসগুলো রোদ্দুরে দেন বিভাবতী। এবার সেই বাক্সে হাত দেবার অধিকার পেল বেণু। অবশ্য অনেক মিনতি করতে হয়েছিল বিভাবতীর কাছে এই অধিকারটুকু পাবার জন্য।

খুলতেই ন্যাপথলিনের গন্ধ পেল। ভিতর থেকে বেরোল একটা গরদের কাপড়, দুটো সিল্কের পাঞ্জাবী, একটা পশমের শাল। বাকি সব বই। চল্লিশখানা পত্র-পুষ্প মাসিক পত্রিকা। বাইবেল, মধুসূদনের গ্রন্থাবলী, হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, ছ'খণ্ড বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, গিরিশ ঘোষের নির্বাচিত নাটক, মোটা তার হোমিওপ্যাথিক বাংলা বই, একটা বাঁধানো খাতায় চন্দ্রনাথের লেখা গানের পাতা।

প্রথমেই বেণু খুলল বাবার লেখা খাতাটা। কি সুন্দর মুক্তোর মত পরিষ্কার হাতের লেখা! বানান ভুল নেই কোথাও। কোন কাটাকুটি নেই।

খাতাটা আগাগোড়া নাটক লেখা। চরিত্রগুলো তার পৌরাণিক ঈশ্বর বিষয়ক ইত্যাদি।

পড়তে শুরু করে দিল তৎক্ষণাৎ। পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। হৃদয়স্পর্শী লেখা। তিন অঙ্ক পর্যন্ত। বেণু ভাবে নাটক পাঁচ অঙ্কে শেষ হয়, ইস্ বাকি দু'অঙ্ক কোথায়? পড়তে পড়তে বেণু মনে মনে ঠিক করল একদিন না একদিন বড় হয়ে সে বাবার এই অসম্পূর্ণ নাটকটা শেষ করে ফেলবে। কিন্তু এত সুন্দর গান কি লিখতে পারবে সে? যদিও আজকাল পদ্য লেখার চেষ্টা সে করে। কাটাকুটি করে মেলাতেও পারে প্রথম লাইনের সঙ্গে দ্বিতীয় লাইনের শেষটা। কিন্তু বাবার মত এত সুন্দর গান লিখতে সে পারবে না, কিছুতেই পারবে না। একটা গান তার মনের মধ্যে তো গেঁথে গেল। 'নাইবা আসিলে কাছেতে আমার দূরে থেকে ভালবাসিব / লাজ ভরে আমি ও মুখ বারেক হেরি শুধু হাসিব।'

নাটকটা পড়া শেষ করে হাতে তুলে নিল বঙ্কিমচন্দ্র। পাতা উল্টোতেই প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী। পড়তে একটু অসুবিধে হতে লাগল। যেন শক্ত শক্ত

ব্যাকরণ নয়। কিন্তু আশ্চর্য্য। পড়ে যেমন সব শব্দের মানে না জানলেও অদ্ভুত একটা রসের মধ্যে ডুব হয়ে গেছে। বেশ বুঝতে পারছে কি ঘটছে। কোথায় কি অবস্থার মধ্যে দিয়ে ঘটনা প্রবাহ কোন খাতে বয়ে চলেছে।

শক্ত শক্ত শব্দের মানে জানবার জন্যে একটা খাতায় শব্দগুলো লিখে রাখল। বাবার বাড়ি গিয়ে মেজদা মহেন্দ্রের বাংলা অভিধান খুলে দেখে নেবে। এর পর শুধুই বঙ্কিমচন্দ্র।

বিভাবতী পরদিন সকালে বলল, 'বেণু বাজার যা। দু'এক পয়সার মাছ কিনে আন।'

বেণু বই থেকে মুখ না তুলেই বলল, 'মাছের দরকার নেই মা।'

বিভাবতী বলল, 'বুঝিছি। এখন বই ছেড়ে উঠতে হবে তাই মাছের দরকার নেই না। ওদিকে খাবার সময় কিচিমিচি গলা দিয়ে নামতে চায় না।'

বিভাবতীই সকাল থেকে আলু পটল শাকসব্জী বাজার করে আনে। ওখানে মাছ হয় না। মাছ আনতে গেলে বাজার যেতে হয়। বেণু বই রেখে একদম একছুটে গঙ্গায় যায়। ডুবটা দিয়ে আসে। কোনমতে নাকে মুখে গুঁজে দুটি ভাত তরকারি। আবার বই নিয়ে বসে। যতক্ষণ না চোখে ঝাপসা দেখে। সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে এলে তবে বই রাখতে পারে।

মনোবালার বড়ছেলে মাঝে মাঝে প্রায়ই আশপাশ মাসীর কাছে আসে। একদিন বেণুকে বঙ্কিম গ্রন্থাবলী পড়তে দেখে বিভাবতীকে বলল, 'ওকে এই বয়সে এ সব নভেল পড়তে দিচ্ছ মাসী। ও যে উচ্ছন্নে যাবে। এ বয়সে নভেল নাটক পড়া মোটেই ভালো নয়।'

তারপর বেণুর হাত থেকে বইখানা নিয়ে বলল, 'হুঁ। বঙ্কিমবাবুর বই পড়ছিস মানে বুঝিস?'

বেণু বলল, 'সব কথার মানে বুঝি না তবে গল্পটা বুঝতে পারি।'

দাদা বইটার পাতা খুলে বলল, 'বিবাদ মানে কি বলত।'

'ঝগড়া ঝাটি'

'পিঞ্জর মানে কি?'

'খাঁচা।'

'উষ্ণীষ?'

'পাগড়ি।'

'আচ্ছা পিতৃষ্বসা মানে কি বলত?'

'পিসি।'

তখন দাদা বলল, 'হুঁ, তুই তো দেখছি সব মানেই জানিস।'

মনোবালা মজা উপভোগ করছিলেন। বললেন, 'বাংলা মানে জিজ্ঞেস করে ওকে হারাতে পারবি নি বাবা। ও যখন হতে চাঁদ পড়েছি তখন থেকে কাশীরামদাসী মহাভারত কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়ছে। ও প্রায় সব মানে বলে দিতে পারে।'

দাদা গম্ভীর হয়ে বলল, 'কিন্তু এইটুকু মেয়ের এই সব নভেল পড়া কি ভালো?'

মনোবালা বললেন, 'একদিকে ভালো। বই নিয়ে আছে তাই বাড়িতে থাকে। কোথাও যায় না। নইলে তো ছোট-লোকদের ছেলেপুলের সঙ্গে হয় নর্দমায় নর্দমায় গুলি খেলে খ্যাপাতো, না গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপাই জুড়তো।'

এই বাংলার জন্যই বেণুর সব বছর থেকে স্কুলেও একটু খাতির বেড়েছে ছেলে-মেয়েদের কাছে। একদিন স্কুলে বাংলার ক্লাসে বাংলার টিচার কবিরবাবু ক্লাসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মরীচিমালি মানে কি বলত?'

কেউ পারেনি, এমন কি ফার্স্টগার্ল অমলাও নয়।

বেণু উঠে বলল, 'সূর্য স্যার।'

কবিরবাবু বললেন, 'ভেরি গুড। তুমি কোথায় পেলে এ শব্দ?'

ও বলল, 'মহাভারতে।'

'হুঁ। কি নাম তোমার?'

'বেণুবালা। বেণুবালা পাল।'

'বস। সিট ডাউন।'

ক্লাসে সবচেয়ে ফাজিল মেয়ে শকুন্তলা ঘোষ। মাস্টার মশাই চলে যেতে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'শোনো, সবাই শোনো তোমরা। বেণুকে আর কেউ বেণু বলে ডাকবে না। ওর নাম বঙ্কিমচন্দ্র পাল। বাবাঃ। মরীচিমালি! আমি তো ভেবেছিলুম ও মানে গোলমরিচ ক্ষেতের মালি। তা নয় একেবারে সূর্যি!'

ছেলেরা তাই শুনিয়ে হো হো করে হেসে উঠেছিল।

এর পর থেকে কবিরবাবু শক্ত শব্দের মানে হোলেই প্রথমে বেণুকে জিজ্ঞাসা করেন। বেণু প্রায়ই বলতে পারে। দু একটা পারে না। বাংলা শব্দের মানে জানার জন্য পরিশ্রমও করে। মেজদা মহেন্দ্রের অভিধান যেখানা হয়তো কোনদিন খুলেও দেখেনি কিন্তু বেণুর সেটা এখন তখন ঘাঁটা চাই। বিশেষ করে মাস্টারমশাইদের কাছে সুনামটা বজায় রাখার জন্য।

এই সময়ের ছুটির মধ্যে তলায় তলায় যে একটা ঘটনা ঘটতে থাকছিল তা বেণু জানতেও পারে নি এমনি মশগুল হয়েছিল সে বঙ্কিমচন্দ্রে। এ পাড়ায় প্রতি বছরই চৈত্র বৈশাখ মাসে একদল নতুন লোক ঘোরাঘুরি করে। তাদের বেশভূষা অদ্ভুতরকমের। পরনে লম্বা গলাবন্ধ কোট আর চুড়িদার পাজামা। মাথায় গোলটুপি। ভাঙা ভাঙা হিন্দি মেশানো বাংলায় কথা বলে। তীর্থের পাণ্ডা তারা। তীর্থে যাবার লোক যোগাড় করতে আসে। দুর্গম বদরিনাথ কেদারনাথ তীর্থে নিয়ে যাবার লোক জোটায়। এ বাড়িতেও আসে। তার প্রধান কারণ বেণুর ঠাকুমা বাবার মা বর্তমান ছিলেন। দু দুবার তিনি

গিয়েছিলেন বদরিকা তীর্থে।

একদিন হঠাৎ বিভাবতী বলল, 'বেণু, আমি যদি তীর্থে যাই তাহলে তুই দুটো মাস বড়মামার কাছে থাকতে পারবি না?'

বেণু বই থেকে মুখ তুলে মার দিকে চেয়ে রইল। সে বুঝতে পারল না মার কথা ঠিক সে শুনেছে কিনা। মা বুড়োমানুষ কত তীর্থে যাবে? সে মাকে যোগাযোগ করে মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে নিয়ে যেতে হয়। সে বলল, 'তীর্থ! কোন্ তীর্থে মা?'

'বদ্রিনাথে।'

বেণুর বিশ্বাস হচ্ছিল না। সে শুনেছে যে বদরিনারায়ণ তীর্থ হিমালয়ের খুব একটা উঁচু জায়গায় যেখানে কোন গাড়ি যেতে পারে না, বহু দূর থেকে যাত্রীদের পায়ে হেঁটে হেঁটে যেতে হয় সেই দুর্গম উঁচু পাহাড়ে। বহু যাত্রী পৌঁছতেই পারেনা। পথেই মৃত্যু হয় অনেকের। মা সেখানে যাবে!

সে জিজ্ঞাসা করল, 'সেখানে কার সঙ্গে যাবে তুমি?'

'তোর ছোটমামা যাচ্ছে। মামীমা যাচ্ছে। পুঁটুমাসী যাচ্ছে। পাড়ার আরো অনেক লোক যাচ্ছে।'

এতকাণ্ড হচ্ছে অথচ সে কিছুই জানে না? বেণু বিষণ্ণ হয়ে গেল। বলল, 'আমি একা থাকবো?'

'একা কেন? তোর বড়মামার কাছে থাকবি।'

'কিন্তু শুনেছি সেখানে যাওয়া খুব কষ্ট। রাস্তাতেই মরে যায় অনেক লোক।'

'না না। সে সব আগে কথা। পাড়াতে কি বছরই কেউ না কেউ যাচ্ছে। ফিরেও তো আসছে সবাই। কই কেউ তো মরে নি। তাছাড়া তোর ছোটমামা তো সঙ্গে যাচ্ছে। আর তীর্থের পথে মরা সবাই বলে খুব পুণ্যির জোর না থাকলে ঘটে না। আমার কি অত পুণ্যির জোর! দেখবি ঠিক ফিরে আসবো।'

বেণু দেখল এ যা তার পরিচিতা মা নয়। অন্য বিভাবতী। তীর্থের আগ্রহ তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। তার কাছে সংসার, বেণু কোনটাই যেন বড় নয়।

বেণু বলল, 'অত টাকা তোমায় কে দেবে?'

বিভাবতী বলল, 'খরচা সবাই বলছে খুব বেশি নয়। হরিদ্বার অবধি রেলে করে যেতে হবে। সেটাই যা খরচা। তারপর থেকে তো হাঁটা। ওখানে রাস্তায় রাস্তায় চটি আছে কালি কমলি না কার যেখানে যাত্রীদের বিনে পয়সায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া পাণ্ডারাও ধার দেয়। পরে বছর বছর ওরা যখন আসে তখন শোধ দিলেই হয়।'

'কিন্তু হরিদ্বার অবধি রেলভাড়ার টাকা?'

'সেটা এ্যাদ্দিন দাদা দেবে বলেছে।'

বেণু এবার সত্যিই বিস্মিত। বড়মামা টাকা দেবে। প্রচণ্ড একটা অভিমানে বুক ভরে গেল তার। কোনদিন তোর মামা পুজোর কিছু তাকে কিনে দিয়েছে কি? মনে তো পড়ে না বেণুর। এমন লোকের পুণ্যে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে বড় ভাই। দুর্গম তীর্থযাত্রায় সঙ্গী হচ্ছে ছোট ভাই।

বেণুর চোখে জল এল। মুখ লুকিয়ে ফেলল সে।

বিভাবতী বলল, 'কিরে পারবি না থাকতে?'

বেণু বলল, 'কেন পারবো না। খুব পারবো।'

কতটা ইচ্ছের বলল আর কতটা অভিমানের বলল কথাটা তা বিভাবতী বুঝল না।

পরের মাসটা দিন বেণুর কাছে সব বিষাদ লাগতে লাগল। বাড়িতে লোকে বিভাবতী দুপুর সন্ধ্যায় মুখে শুধু তীর্থ-যাত্রার কথা। তার আয়োজনে ব্যস্ত তারা।

বড়িমাসীও আর ভাল লাগছে না। বেণু প্রায় বেরিয়ে যায়। সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকে। দাদা বিকেল কাটায় গল্প মাঠে বসে। আমি মনে হয় না আর সে থাকবে কি করে!

আচ্ছা মা একবারও ভাবল না যে ঐ দুর্গম তীর্থযাত্রা থেকে যদি না ফেরে কি হবে তার। অথচ অত পরিশ্রম করে মা তাকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে! দিনরাত পুতুল তৈরি করছে শুধু বেণুরই জন্য তো! বেণুর ছোট মাথায় কিছুতেই ঢোকাতে পারে না কিছু। তার মা তার জন্য এত কিছু হয়ে গেল কি করে?

তীর্থযাত্রার আয়োজনের ফাঁকে ফাঁকে উপদেশ দায় বিভাবতী, 'ছোট বাক্সটাতে কিছু টাকা থাকবে। তার থেকে এক-মাসের খাওয়া দেবে বৌদিদিকে। আর বাকিটা তোমার কাছে। মাঝে মাঝে কিছু কেনে ইচ্ছে করে খাবে আমার। মোটেই মন খারাপ করবে না বুঝলে?'

খুব শিগগিরই যাবার দিন এসে গেল বিভাবতীর। ভিড়ি সময়ে গাড়ি থেকে যাত্রা করল তীর্থযাত্রীর দল। বেশ ভারি দলটি। প্রায় জন দশেক। সকলের পরনে গেরুয়া। বেণু এক এক করে সবার পায়ের ধুলো নিয়ে শেষে মাকে প্রণাম করে যখন উঠে দাঁড়াল তার চোখ দুটো থেকে জল গড়িয়ে পড়ল।

বিভাবতীরও চোখ ছলছল করছিল। কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'কাঁদিস্ কি। কেকটিন তো এ্যাকো বোক হচ্ছে। ঠিক ফিরে আসবো।' বলে ছেলের মাথাতে হাত দিয়ে চুপ গেল। আবার বলল, 'মাঝে মাঝে বাড়িতে আসিস ঘরটা খুলে দেখিস।

নিষ্কৃতি হয়ে থাকিস নি। রামনগরের মত হইল।'

পাড়ার লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। অনেকেই তীর্থযাত্রীর উদ্দেশে প্রণাম করে বিদায় জানাল।

বিদায় দিয়ে ধীরে ধীরে গরু গাড়ীর পর গাড়ী এগিয়ে চলল তারা হাওড়া স্টেশনের দিকে। হেঁটে হেঁটে যাবে সবাই হাওড়া স্টেশন। মালপত্র যাবে গরুর গাড়ি। তীর্থযাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে বেণুও চলল হেঁটে হেঁটে।

ভাগীরথীতীরের ঘাটের কাছে এসে বিভাবতী বলল, 'এবার বাড়ি যা বেণু। এইটা নে। যাবার পথে খাবারদাবার কিনে খাস।'

বিভাবতী আঁচল খুলে একটা আধুলি দিল বেণুর হাতে। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলল তীর্থের পথে।

মধুবালা বললেন, 'মনটা শক্ত কর বউ। এখন থেকে শুধু বাবা বদরিনারায়ণের কথা মনে কর। ছেলে ছেলে সংসার সংসার তো অনেক করলে। আর কেঁদো না।'

বেণু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল তাদের দিকে চেয়ে। ক্রমে ক্রমে ছোট হতে হতে দলটা চোখের বাইরে চলে গেল। বেণু ফিরে এসে ঘাটের জেটিতে মাথা ঠেকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। হঠাৎ সে মা বলে হাতের আধুলিটা খুব জোরে ছুঁড়ে দিল গঙ্গার জলে।

চল্লিশ

বাড়িটা বড় ফাঁকা লাগে। বিভাবতী নেই মধুবালা নেই সুবালা নেই। আছে শুধু সুবালার ভাই গণেশ আর তার বউ বাসন্তী। তা গণেশ তো সারাদিন বাড়িতেই থাকে না। সকালে উঠে কোন্ ট্রেন ধরে [illegible] কারখানায় চলে যায়। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার জন্য এসে খেয়ে যায় আবার ফিরতে ফিরতে রাত আটটা নটা। বাকিটার মধ্যে সারা দিন থাকে বাসন্তী মায়ের বউটা। মায়ের সঙ্গে চেহারার এক অমিল কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায় যেমনটা হয়েছে গণেশ আর বাসন্তীর ক্ষেত্রে। গণেশ হচ্ছে রোগা কালো হাড় জিরজিরে পাঁকাটির মত। আর বাসন্তীও রোগা কালো দাঁতউঁচু, তারপর মুখে বসন্তর দাগ। এরা দুজনা এ বাড়িতে আছে কিন্তু তাদের সঙ্গে কোন কথাবার্তাই হোত না বেণুর। কোন প্রয়োজনই ছিল না কথা বলার। এখন বাসন্তীই বেণুকে মিনতি করে বলে, 'বেণু একটু বাড়িতে থাক না। আমার একা একা বড় খারাপ লাগে। তোমার তো ইস্কুল নেই এখন ঘরে।'

তবে উত্তর বেণু দেয় না। বাসন্তী কি করে বুঝবে যে বাড়িতে মা নেই সে

UCO.CAS-71:85 BEN

বাড়ি বেণুর কাছে বড় বাগান। এখানে একমুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করে না তার। শুধু বাসন্তীর জন্য মায়া হয়। নইলে বাড়ীটা বড় একলা। বাড়ী আর মন্দিরের কাছে তার পাওয়া শুধু পাশাপাশি আর যায়। যেখানে কোন নদী নেই পাখী নেই। বেণু যতক্ষণ পারে বাড়িতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র পড়ে। মাইকেলের কবিতা পড়ে চিৎকার করে। তারপর একসময় বেরিয়ে পড়ে আবার।

সমবয়সী বন্ধু নিতাই পালদের কারখানায় যায়। নিতাই পড়াশোনা এর মধ্যে শেষ করে হাত ব্যবসায় লেগে পড়েছে। সে চাকের ওপর মাটির তালটা বোধ হয় দিয়ে চাকটা বোঁ বোঁ করে ঘোরায়। সেইগুলো ফুলে ফুলে ওঠে। তারপর তার দু'হাতের আঙুলের ফাঁকে তৈরি হয় ঘট। কখনও বা পুতুল। কোনদিন চায়ের কাপ। বেণু মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। ঘুরপাক চাকাটা দিয়ে চাক ঘোরাবার চেষ্টা বেণুও করেছে নিতাইয়ের চাকে ছোটখাটো চাকে। জীবন কোন মানে। আজ কোন তার সুখে নেই।

বাবার বাড়িতে দক্ষিণ দিকটা একটানা টানা মধ্যে বিধবার হাতের অনেক মায়া দুধভাত আর পোস্তচচ্চড়ি দিয়ে ভাত খেয়ে হাওয়া হাঁটতে থাকে বেণু। যেদিকে পারে চলে যায় উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম। বড়বড় পোড়ো হাওড়ার আম জাম হাবর কুলগাছ। কোনো অভিভাবক নেই কাউকে কৈফিয়ৎ দেবার নেই। বড়মামা এদিন বাড়ি থেকে রাত করে খাবার। তার মধ্যে ফিরতে পারলেই হোল। আর বড়মামার যে উদাসীন ভাব তাতে বেণুকে দু'দিন দেখতে না পেলেও খোঁজ খুঁজবে না। নিজের ছেলেদের সম্বন্ধেই বিশেষ খোঁজ রাখে না কখনো।

হঠাৎ পাড়ার দু'তিনটে ছেলের সঙ্গে দেখা হোল একদিন। ফাঁকা মাঠে বসে তারা সিগারেট টানছে। তাকে দেখে বলল, 'কিরে তুই এখানে কাকো যে! সিগারেট টানবে বুঝি?'

ছেলেগুলো বেণুর বড়মামার ছোট ছেলের বন্ধু। সে বলল, 'না তো।'

'কার সঙ্গে এসেছিস? একা একা?'

সে বলল, 'কার সঙ্গে আবার আসবো। একাই তো এসেছি।'

'কিন্তু সিগারেট খেতে এসেছিস বইকে এই ফাঁকা মাঠে কেউ আসে নাকি একা একা। ইয়া চোর বাবাকে বলছি।'

বেণুর ওদের সঙ্গ নেই। বললে তো বয়েই গেল। সে তো আর সিগারেট খাচ্ছে না। কিন্তু ওদের কথাগুলো নিয়ে ভাববে না বলির ভেবে আবেশ তার লাগে তার এই ফাঁকা মাঠ। কত ভাল লাগে চুপচাপ বসে থাকতে নির্জন পাড়ে একা বসে থাকতে।

সন্ধ্যে বেলাতেই বাড়ি ফিরে যায় [illegible] বাসন্তীর কথা ভেবেই। [illegible] বারান্দায় কিংবা ছোটোখাটো [illegible] বিস্কুট। ঘর থেকে হ্যারিকেনটা বার করে জ্বালাতে বসে। বাসন্তী তাড়াতাড়ি চলে আসে তার কাছে। বলে, 'দাও, আমায় দাও।'

বেণু বলে, 'না না আমি পারব।'

'তুমি পারবে না। এ সব কি ছোট ছেলের কাজ নাকি?' বেণু একটা কাগজ জ্বালায়। তাড়াতাড়ি দিয়ে হ্যারিকেনটার কাচ মুছতে মুছতে বাসন্তী বলে, 'আর বলে বলে এটা তাওয়ায় বার করে রেখে দেও। আমি মুঁছে টুছে ঠিক করে জেলে রেখে দোব।'

হ্যারিকেন আলো হোলে বেণু বই বার করে বাইরের দাওয়া চৌকির ওপর পড়তে বসল। পড়েই দেখে বাবার আকারের বার করে রাখব দাঁড়াবে।

বাসন্তী কাছেই দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'বাদামভাজা বুঝি?'

বেণু চেয়ে দেখল বাসন্তীর দিকে। সে খুব আগ্রহ নিয়ে চেয়ে আছে বাদামভাজাগুলোর দিকে। বলল, 'খাবে তো খাও না'।

'তোর?'

'হ্যাঁ খাও না।'

একটা বাদামভাজা তুলে নিল বাসন্তী। বেণু তার খাওয়া দেখে খুব খুব খুশি হয়েছে যেমনটা বাবাকটা পেয়ে। বলল, 'আরো খাও না সেইটিকতক। খাও। লজ্জা করছো কাকো।'

আর একদিন ঘুগনি কিনে খেতে খেতে ঢুকেছিল বেণু সন্ধ্যেবেলা। বাসন্তী ওর কাছে এসে বলল, 'কি খাচ্ছো বেণু?'

'ঘুগনি'।

বাসন্তী লোভের লোভ সামলাতে পারল না। বলল, 'একটু দাও না।'

বেণু লজ্জা পেল। শালপাতাটা এগিয়ে দিল, 'খাও [illegible] নেই। এই [illegible] শালপাতাটা [illegible] খেয়ে [illegible] চেটে খেল বাসন্তী।

বেণু লোকের মত তাকিয়ে তাকিয়ে বাসন্তীর খাওয়া চেটে খেতে লাগল। একসময় বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবগারীর ঘুগনি কিনে নিয়ে এসে বাসন্তীর হাতে দিল। বলল, 'এই নাও মামী, খাও। এঁটো শালপাতাটা অমন করে চাটতে হয়?'

বাসন্তীর মুখে চোখে বিস্ময় ফুটে পড়েছিল। সে বলল, 'এ কার জন্যে বেণু?'

'তোমার জন্যে তো তোমার জন্যে।'

'সবটা?'

'হ্যাঁ।'

'আঃ! তুই খাবি না?'

'না আমি তো খেলুম। তুমি ওটা খাও।'

বাসন্তী কি আগ্রহ নিয়েই না পুলিটি খেতে লাগল। রেনু হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইল। কেন যে এত কষ্ট হোতে লাগল বাসন্তীর খাওয়া দেখে তা বুঝতে পারল না।

খাবারটা চেটে পুটে শেষ করে দু'হাতে মুখ ধুয়ে বাসন্তী এসে বসল চৌকির বিছানায় আলস্যের বশে যত। রেনু বই থেকে মুখ তুলে তার দিকে চেয়ে একটু হাসল।

'ভালো না পুলিটা?'

'খুব ভালো।'

'আচ্ছা মাসী, তোমার বাপের বাড়ি কোথায়?'

বাসন্তী উদাস হয়ে বলল, 'কোথাও না।'

রেনু বলল, 'সেকি, তা আবার হয় নাকি।'

'ক্যানো হবে না? বাপ মা ভাই বোন কেউই তো নেই। তাহোলে বাপের বাড়ি কি করে থাকবে!'

'তবে তোমার বিয়ে দিল কে?'

'ও এক পাতানো মামা।'

রেনুর মুখে আর কোন কথা যোগাল না। বইয়ে মন দিল সে আবার।

বাসন্তী বলল, 'তুই বড্ড ভালো মেয়ে রে রেনু।'

রেনু বলল, 'হঠাৎ এ কথা বলছো ক্যানো মাসী?'

'তুই আমায় রোজ খাবার দিস চানা-ভাজা থেকে বিস্কিট। আজ গোটা এক পয়সার ঘুগনি কিনে এনে দিলি।'

'এক পয়সায় বড় বাটী জোটে আধ পয়সায়।'

'যাই হোক। তাই আমাকে কে দিচ্ছে বল্। কেউ দিয়েও চায় না। এরা আমাকে পেটপুরে খেতেও দেয় না। সকালে চাট্টি ভাত আবার রাত্তিরে চাট্টি ভাত। দুবেলা আধসেরো চালের ভাত রান্না হয় তাতে ছটা লোকের দুবেলা খিদে মেটে? তুইই বল্।' বাসন্তী আঁচল দিয়ে চোখ চাপা দিল। তারপর চোখ মুছে বলল, 'সেদিন তো বলতে গেলে কি ঝামেলা করে! যাতে খিদে করে, বলে আমার বড্ড লোভ, আমি রাক্ষুসি। তাই আর কিছু বলি না। কিন্তু খিদে চাপতে আমার বড্ড কষ্ট হয় রে।'

রেনু উঠে পড়ে। 'মাসী তুমি বোসো একটু আমি আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছিস আবার। এখন সন্ধের পর বড্ড ভয় করে আমার। কোথাও যাসনি। তোর মামা এসে যাবে।'

'আমি তোমার মুড়ি মুড়কি এনে দি'।

বাসন্তী তার হাত চেপে বলল, 'না রে রেনু, আজ আর দরকার নেই অত খাবার। তুই পড়।'

রেনু পরদিন বাড়ি থেকে একটা বড় জামবাটি আর একটা থালা নিয়ে গেল মামার বাড়ি। দিদের খাওয়া শেষে বলল, 'দিদিমা, তোমার ভাত তরকারি বেশি আছে নাকি গো?'

দিদিমা ঠোঁট উল্টে বলল, 'আছে। কে খাবে আর। মেয়েটা তো সকালে বাইরে গ্যাছে কোথায়। রাতে ফিরবে না। আর ছোটকত্তা আবার কার থেকে পয়সা যে পাইয়েছে। ফিরবে কি ফিরবে না কে জানে?'

'তাহলে এই জামবাটিতে চাট্টি ভাত আর থালে তরকারি দিয়ে দাও।'

'ওমা! ক্যানো রে?'

'আমার দুপুরে বড্ড খিদে পায় এই দুটো দিনের পর। এখন তুমি কোথায় থাকবে ঠিক নেই। আমি বাড়ি নিয়ে গিয়ে খেয়ে নোব। খিদে পেলে খাবো।'

'তা বেশ তো। বেশি বেশি করে খাসনি? শরীরের পক্ষে ভালো হবে।'

দিদিমার দেওয়া ভাত তরকারি এনে রেনু বাসন্তীকে ধরে দিল।

'মাসী, এটা খেয়ে নাও।'

বাসন্তী অবাক হয়ে গেল। বলল, 'রেনু, এ কোথেকে আনলি, হোটেল থেকে?'

'না না। হোটেল থেকে নয়। যেখান থেকেই আনি তুমি চটপট খেয়ে নাও। বাটিটা থালাটা ভালো করে মেজে দাওয়ায় রেখে দিও। আমি যাচ্ছি।'

বাসন্তী রেনুকে দেখছিল। তার হাতে বড় ভাত তরকারি। কোন কথা বলতে পারছিল না সে।

রেনু বলল, 'কি হোল, কি দেখছো অমন করে আমার দিকে? খেয়ে নাওগে যাও মামা বাড়ি আসার আগে।'

বাসন্তীর চোখে জল। ধরা ধরা গলায় বলল, 'রেনু, আরজন্মে তুই কোথায় আমার মাই ছিলি, নারে?'

রেনু আর দাঁড়াল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। তারি দুঃখেও হচ্ছে একটা ভাব। লোকের কান্না দেখলে তারও কান্না পায়।

একদিন দুপুরে একটা বায়স্কোপ দেখল। বাংলা বই ছিল। কি ভাল যে লেগেছে। আরও একটা বই তার ভাল লেগেছিল। সেটা দেখেছিল ছোটমামাবাবুর সঙ্গে বেশ কিছুদিন আগে। সে বইটা ছিল দেবদাস। উঃ কি কান্নাই যে কেঁদেছিল রেনু। সেই থেকে ভালবেসে ফেলেছে ঐ লোকটাকে। প্রমথেশ বড়ুয়াকে। এখনো মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে গরুর গাড়িতে চড়ে যাচ্ছে দেবদাস। মৃত্যুর অপেক্ষায়। থেকে থেকে গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করছে আর কতদূর!

শরৎচন্দ্র লিখেছেন এই দেবদাস গল্পটা। এত ভালো এত দুঃখের গল্প কি করে যে লিখলেন তিনি! উঃ বুকটা যেন দুমড়ে মুচড়ে কান্না বার হয়ে আসে। দেবদাস বাংলা বইয়ে প্রথম শরৎচন্দ্রের লেখা গল্প পড়েছিল, মহেশ। গল্পটা একটানা পড়তেই পারেনি। পড়বে কি করে! চোখের জলে যে সব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল বার বার! আচ্ছা, একবার পড়লেই তো সব গল্প পুরোনো হয়ে যায়। নতুন করে আবার সেই গল্পটা পড়তে ইচ্ছে করে না আর পড়লেও প্রথমবারের মত আনন্দ দুঃখ কোনো কিছুই অনুভব করেনা। কিন্তু মহেশ কত-বার পড়েছে বেনু? অনেকবার পড়েছে অত-বারই কিছুতেই কান্না চাপতে পারেনি। প্রথম বার পড়ার মতই চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে এসেছে প্রতিবারেই। বেনুর কি বিশেষ রোগ এটা না শরৎবাবুর লেখার গুণ? আর অমন লেখা পারে না কেউ লেখতে। শরৎবাবু মারা গেলেন এই তো কিছুদিন আগে। বিকেলে টেলিগ্রাম ছেপে খবরের কাগজ বেরিয়েছিল। বেনুর মনে হয়েছিল সেদিন গফুর মারা গেল। কেন জানে না শরৎচন্দ্র আর মহেশের গফুর তার কাছে এক হয়ে গিয়েছিল। বেনু বুঝতে পারে না কেন যে তার এত ভাল লাগে কান্না কান্না লেখা গল্প! পৃথিবীতে মানুষ তো হাসে খেলে আনন্দ করে শুধু সব ছেড়ে কান্নাটাই যে কেন ওর এত ভালোলাগে তা বুঝতে পারে না।

কখনো ছেলেদের সঙ্গে খেলে, বেড়ায়। মার্বেলগুলি, ডাংগুলি, লাট্টু, ঘাপলা, ঘুড়িওড়ানো কিন্তু মাঝে মাঝেই কেমন যেন হয়ে যায়। উদাসীন। তখন অকারণ পথ তাকে হাতছানি দেয়, টানতে থাকে। তাই বেনু হাঁটতে হাঁটতে কখনো দেশপ্রিয় কখনো গোলদীঘির ধারে চলে যায়। একা একা চুপ করে জলের দিকে চেয়ে তাকিয়ে থাকে। কখনো বা প্রেসি-ডেন্সী কলেজের রেলিঙে সাজানো বই-গুলো একধার থেকে অন্যধার পর্যন্ত দেখে যায়।

বিকেল হলেই চলে আসে গঙ্গার ধারে। আউটরামের জেটিতে এসে বসে থাকে। সূর্য তখন ওপারের গাছপালা, মিলের চিমনির পিছনে। পশ্চিম দিকের আকাশটায় তখন যেন কমলা রং লাগে। লাল সূর্যটা যেন হারিয়ে যায় বড় বড় লাল বল হয়ে নামতে থাকে নিচের দিকে। এক-সময় মিলিয়ে যায়। আর দেখা যায় না। আকাশের রং লাল থেকে ক্রমশ পাটকিলে, কালো, আরো কালো হয়ে অন্ধকার নেমে আসে। গঙ্গার তীরে অন্ধ-কারে বটগাছের ডালে পাখির আর ঝিঁঝিঁদের কোলাহল শুরু হয়। আকাশে ফুটে উঠতে থাকে একটি দুটি করে তারা।

বেনুর মনটাও বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। এদিক ফিরতে হবে সেই বস্তির অন্ধকার গলিটার ভেতরে এখন না গেলেই। না ভাবে এমন কোলাহল, পৌঁছে যাবে কি যাবে না বস্তি-বাড়িগুলোর গায়ের দেয়াল, যা পথ চলতে চলতে চোখ পড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে শহর এখনই? বুক কেঁপে ওঠে বেনুর। ভাবতে চায় না এই অসম্ভব কথাটা।

একদিন একটু বেশি দেরি হয়ে গিয়েছিল বাড়ি ফিরতে। বাসন্তী রোজের মতোই দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। গলিতে ঢোকে তাকে মাত্রই সে ছুটে গিয়ে বলল, 'বেনু এসেছিস, বাঁচালি ভাই।'

বেনু হেসে ফেলল, বলল, 'ভাই কিগো, তুমি যে আমার মামী হও।' বাসন্তী বলল, 'চুলোয় যাক ও সম্পর্ক। তুই আমার ভাই ছাড়া অন্য কিছু নোস। ভাই, আর কিছু নয়।'

বেনু আবার হেসে বলল, 'আচ্ছা ভাই। কিন্তু তুমি অমন করে দৌড়ে এলে ক্যানো?'

বাসন্তী বলল, 'আসবো না? আজ কি ঝড় যে বইছে। তোকে দেখতে পেয়ে ধড়ে প্রাণ এলো', তারপর একটু থেমে যেন আবদারের সুরে বলল, 'তুই এ্যাতো দেরি করিস ক্যানো ভাই?'

বেনুর গৌরব বেড়ে উঠল। আরো বড় সেজে বেনু পরের বয়েসী অবলা বাসন্তীকে সাহস দিল, 'ভয় কিসের! চারপাশে লোক গিজগিজ করছে।'

বেনুও ভয় করেছিল। যেদিন দিবাকরী তীর্থে চলে গেল সেই রাতে। [illegible] রাতে বাসন্তী শেষ রাতে বলেছিল, 'বা বেনু, চৌকিতে কাছে শুয়ে পড়।'

বেনু বলল, 'না, আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

[illegible] আশ্চর্য হয়ে বলল, 'সে কি [illegible] একা থাকবি কি করে?'

'ঠিক [illegible] ঘরে কেউ না থাকলে [illegible] চুরি হয়ে যাবে। [illegible]'

[illegible] বলল, 'ঘরে থাকলেই বুঝি [illegible] না, না। এখানে [illegible] কাজ নেই। একা বড় করবে [illegible]।'

'না। ভয় করবে না,' বলে বাড়ি চলে এসেছিল বেনু। বলে এসেছিল বটে কিন্তু যখন ঘরে ঢুকল ঘরে যেন তখন মনে হোল হাজার ভূত প্রেত দৈত্য দানা একসঙ্গে ছুটে আসছে তাকে খাবে বলে। হারিকেনের আলোয় বিছানাই দেখা যায় রেখে শুতে উঠেছিল। কিন্তু মাথার কোণায় একটা বই টেনে নিয়েছিল সে। সে বইটা বঙ্কিম গ্রন্থাবলী।

যত ভয়ই করুক বস্তির ছোটমার কাছে শুতে সে নিতে চায় না। তার সব-চেয়ে দুঃখ সকালের বাজারটা তাকে এখনো মামার বাড়ি থেকেই খেতে যেতে হয়।

আর না চলে গেলে দুবেলাই এমন খেতে হচ্ছে সেখানে। এই কেনবার কাজে বেণুকে বড়লোকের বাড়ি গিয়ে কাজে যেতে হয়। কোনদিন কোন বাবা বলে না যে এই টাকা কটা দিয়ে বই কিনে আন বেণু। সেই বড় বাবা বোনকে ফেলবারার টাকা দিল আর বোন সেই টাকা পেয়ে একবার ছেলেকে কেনে একটা দুর্গা ঠাকুরের পাখি দিল। কিন্তু কিনে কে খাবে? কেন খাবে টাকা দিল এতবারা? বেণুকে না হাতা করবার কথা? না, পারতপক্ষে বেণু বাবাদের কোন সাহায্য নেবে না। এই রকমেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে সে।

বঙ্কিমচন্দ্র তার বড় ভালোবাসার বিশ্বাসের মনে গাঁথা ছিলেন। কখন যে সে দুখ-দারিদ্র্যের মধ্যে ডুব দিয়ে নিয়েছে তা ফুলেছে আর কখনই বা সেই বইয়ের জন্য মাথা রেখে গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে তা জানে না। দশমাসের বয়স হারকেন বড়লা ঠাকুরকৈশির চোটে খুব কাশে বেণুর মাথা থাকে হারিকেনটা বাতি হাতে পড়ে থাকে।

পঁচিশ

স্বাধীনতার একটা না একটা কিছু লেগেই থাকে। কখনো বাজিগর কখনো তারা সবাই কখনো বাবাদের পায়। বেণুর একটা থিয়েটারে হচ্ছে কেমন স্বাধীনতার। তাদের একটা ক্লাব হয়েছে। তাকে নাম দিয়ে। সেখানে পাঠা হচ্ছে বেণুর বড়দাদার ছোট ছেলে। তার বয়স এক যোলো। বড়দাদার ছোট ছেলের লেখা-পড়ার দিকুমার বড় বেশি রেখে দিলের অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছে ছেলেকে।

সকল পাড়ার সব ছেলেদের বয়স বারো থেকে ষোলো। তারা সবাই মিলে নাটক করছে দেবলাদেবী। বেণুর বয়স কম তাই তার বরাতে জুটল মেয়ের পার্ট। দেবলা দেবীতে উৎসাহীর ভূমিকায়। পার্টের একটা কবিতা হোক যদি মেয়ের ভূমিকা তবু একটা দুধ ছাড়া আর সব মুখে ছেড়ে দেবেন।

বেণুর অভিনয় দেখে সবাই বাহবা দিল। বড় জেঠা বললেন, 'হবে না। বাবাওনার রক্ত ওর গায়ে বইছে যে। কত বড় এ্যাক্টর ছিল ওর বাপ'।

বিজয়বতী বাবুর কথায় না। শুধু বললেন, 'আমি চেষ্টা করলে কি হবে। দুঃখপোকাকে আবড়ে টানছে যে। যাবে শেষ যদি যাত্রাতার দলে। বড়বে দুখে বুক ফেটে।' কিন্তু যখন সবাই বেণুর প্রশংসা করেছিল তখন আড়ি এসে চন্দ্রনাথকে মনে করে কেঁদেছিল বিজয়বতী।

এবার যাত্রা থিয়েটারের ঝোঁকটা খুব বেড়ে গেল বেণুর। কাছাকাছি যাত্রা হলেই সেখানে সে হাজির হবে। পরের থিয়েটার দেখতে যায় এখানে সেখানে। বিজয়বতী বাধা পায় না। তাঁর থেকে ফিরে এসে

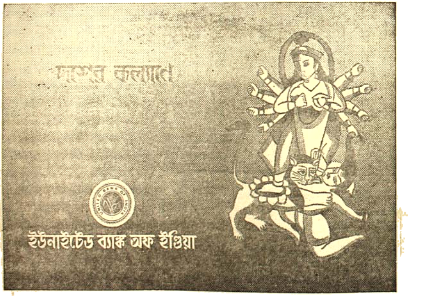

একটু অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে কেন ও। ছেলেকে সে যেন গভীর করে। প্রতি কাজে অন্তরে সবে পরামর্শ করে।

মা তীর্থ থেকে ফিরে আসার অনেক-দিন পরে বেণু একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা মা তুমি আমাকে খুব ভালবাসো, না?'

বিভাবতী বলেছিল, 'এ আবার কেমন কথা। মা ছেলেকে ভালোবাসে না তো কাকে ভালোবাসে? হঠাৎ এ কথা জিগ্যেস করছিস বলতো?'

'না এমনিই। আমি দেখি তুমি আমার জিনিসে বেশি হাত দাও, সবসময় না খেয়ে এসে বকাবকি কর অথচ কি করে দু মুঠো ভাত আমার খেতে হবে বলতো? তখন আমি কি করতুম, কি খেতুম, বাড়ি ফিরতুম কি না কি করে দেখতে?'

বিভাবতী চুপ করে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর বলেছিল, 'কি করে যে তোকে তখন ছেড়ে গেলুম তা আমি আজ ভাবতেও পারিনা। সবাই মিলে নাচাতে তীর্থ তীর্থ করে আমিও মেতে উঠলুম। কিন্তু বিদেশ কদিন বেণু সেই হাওড়া থেকে গাড়িটা ছেড়ে দিল আমার প্রাণ ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল; পালিয়ে আসতেও ইচ্ছে করছিল। কিন্তু লোকে কি বলবে এই লজ্জায় আমি ফিরে আসতে পারি নি।' আর একটু থেমে বলল আবার, 'আমার তীর্থের ফল কোথায় কিছুই হয় নি। সব সময় তোর কথাই মনে পড়ত। বিশেষ করে দেবঘরের হাসপাতালে তবে।'

বেণু এটা জানত না। বলেছিল অবাক হয়ে, 'তুমি হাসপাতালে ছিলে? কেন?'

সিঁড়িতে পা পিছলে গিয়েছিল। তারপর পা মচকে গেল। বাড়ি বসে সেই পা ফিরিয়ে গেল। তাই আমায় হাস-পাতালে দিতে হয়েছিল। তখন ভাবতুম আর বুঝি তোকে দেখতে পাবো না।'

একথা শুনে মায়ের ওপর খুব মায়া হয়েছিল। বেণু এখন একটু একটু বুঝতে পারে যে কি দুঃখী মানুষটা তার মা। একটু তীর্থ করে মনে শান্তি পেতে চেয়ে-ছিল তাই বেরিয়ে পড়েছিল সব ফেলে। তীর্থ থেকে ফিরে এসে মা কত বদলে গেছে।

কালীতলার বাজারে গান করছে একটা দল কদিন ধরে। এ দলটার বিশেষত্ব এরা মেয়েছেলে সাজা করার মত করে গান করে। আর সেখানে শেষ করে আবার সেখানে শুরু করে। বড় ভালো। অভিনয় আছে তো! এ দলটা শুধু রামা-য়ণের পালাই গায় না অনেক পুরাণ কাহিনী অভিনয় করে। প্রত্যেক টিকিট মানুষজন জনের মধ্যে গায় এরা ঐ ক্ষণ চড়ে।

কালীতলায় এ দলটাকে আসার মূলে আছে সুবালা। কোথায় যেন কোন ঠাকুরবাড়িতে এদের গান শুনতে যেত সে। দলের অধিকারী বুড়ো বলে লোকটার সঙ্গে আলাপ করে পরে কালীঘরের সেবা-য়েৎ পুরুত বাবা বেণুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে কালীতলায় এই এদের গাওয়ার ব্যবস্থা সেই করেছে। বুড়োর সঙ্গে সুবালার বেশ বন্ধুত্ব।

সুবালা এখন বেণুদের বাড়িতে একাই থাকে। সতেরো তারা বদরিনারায়ণ তীর্থে থেকে আসার কয়মাসের মধ্যেই গণেশ আর বামনী মারা গেল। মারা গেল খাইসিসে। খাইসিস এখন বড্ড হচ্ছে খুব। আর খাইসিস হয় তার যে কি দুর্দশা! লোকে বলে তার মিনীমারায় বেঁচে না। খাইসিস যে জীবন ফোঁপরাচ্ছে! আর এক-বার ধরলেই নিশ্চিত মৃত্যু। কোন ওষুধ নেই এ রোগের। একেবারে কালব্যাধি!

প্রথমে রোগ দেখা দিল গণেশের দেহে। একা বামনী তার সেবা করত, রান্না বাসন মাজত, তার থুতু গয়ের সব পরিষ্কার করত, সব নিজেই করত। সুবালা ভিতরে যদি খাইসিসের ঘরে উঁকি দেয় দেখে তো সেটা ছোঁয়া গণেশের ভাগ্য। সুবালা তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখত না।

বেণু জানত না গণেশ বামনীর বাওয়াটা কি করে যুক্ত। বামনী আগেই দুবেলা পেটপুরে খেতে পেত না এবং রোজ-ই গাড়া উপোস যায়। কে জানে? সারাক্ষণ বাড়ি থাকত বেণু বামনীদের ঘরের দিকে চাইত না পর্যন্ত, পাছে বামনীর সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে যায়।

গণেশ মারা গেল। আর তারপর দুটো মাসও কাটল না বামনীও মারা গেল ঐ খাইসিসেই। বেণু জানত বামনী খাইসিসে মারা যাবে। খাবা কইতে সে তো পড়েছে কি করে খাইসিস হয় মানুষের। তারপর খেতে না পাওয়া, অত্যাধিক খাটনি খাওয়া, অতিরিক্ত পরিশ্রম। তা বামনীর তো সব জুটেছিল। তারপর দুঃখের কথা দুবেলা পেটভরে খেতেও পায় না সে। বরিষ তেলে মড়াই বা মানুষ অবস্থা বিধবাদের সে ঐ অবস্থায় অনাহারে থাকে। তারপর চরিশ ঘণ্টা খাটনিম কাটিয়ে গলে যায়। গণেশ মারা যাবার দুমাস পরে আরও জ্বর হোল, দুপুরে খুব কাশি, কাশির সঙ্গে রক্তপাত।

কি জেনো গেছেটায়। গণেশের অসুখে বামনী সেবা করত কিন্তু বামনীর অসুখে উঁকি দেবার জন্যও কেউ রইল না। সুবালা বরং বাইরে থেকে দু একটা কথা বলত কখনো কখনো। কথা বলত যাতে শান্তিতে কিছু। গণেশ মরার পর থেকে সুবালা তার নামকরণ করেছিল আভাগ-খাকী।

ওষুধ নেই পথ্য নেই তাই বড় জলদি শেষ হয়ে গেল গণেশের অভাগী বউটা। হতভাগী ওরা দুবেলা সুখে ভাত খেতে পায়নি।

... মৃত্যু রেণুর মনে দাগ কাটেনি। কিন্তু বাসন্তীর মৃত্যুটা তার মনে কাঁটার মত বিঁধে আছে।

মৃত্যুর দিন সাতেক আগের সেই কাণ্ডটা! মনে পড়লেই রেণুর চোখ ফেটে জল আসে।

রেণু স্কুল যাবে। ভাত খাওয়া শেষ। [illegible] এখন বাড়িতে মা ই রান্না করে ভাত [illegible] বাবার বাড়িতে [illegible] সাড়ে দশ হয়ে গ্যাছে। দিদিমা আর নেই। [illegible] দিদিমা একদিন দুপুরে [illegible] কোথায় যে চলে গ্যাছে কেউ জানে না। মামারাও ভাল করে খোঁজ করে নি। বাসন্তীই শুধু দিনকতক চোখের জল ফেলেছিল। ব্যস। সেখানেই [illegible] শেষ হয়নি। ভাত খাওয়া শেষ করে রেণু বই খাতা গুছোচ্ছিল। বাড়িতে কেউ নেই। [illegible] বিভাবতী বাড়ির বাইরে গিয়ে [illegible] মধ্যে বাটি [illegible] হঠাৎ একটা আওয়াজ পেয়ে ঘরের বাইরে এসে রেণু দ্যাখে বাসন্তী দুহাতে তার খাওয়া এঁটো থালাখানা বুকের কাছে তুলে ধরে চাটছে। [illegible] বাসন্তীর চেহারাটা মনে পড়ে কি রেণুর। সেদিন দেখল। [illegible] উদোম সম্পূর্ণ খোলা। একটা কালো চামড়া ঢাকা কঙ্কাল। বুকে মেয়েলি কোন চিহ্নই নেই। চোখ দুটো কোটরে ঢোকা। হনু দুটো অসম্ভব উঁচু। রেণুর মনে হোল একটা ডাইনি তার সামনে বসে আছে।

রেণু বলে উঠল, 'একি করছো তুমি! এঁ্যা—'

ঠিক এই সময়ে বিভাবতীও বাড়ি ঢুকছিল। সেও বাসন্তীর কাণ্ড দেখে চিৎকার করে উঠল, 'ও মাগবি! এ কি কাণ্ড। একি অনাচারের [illegible] এঁ্যা। ছি ছি ছি। ডাইনির মত তুমি। রেণুর থালাটায় মুখ দিলে—ও থালাটা ফেলে দিতে হবে যে।'

রেণু কিছুতে সামনে দিয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি। মা চিৎকার করতে দেখে মাকে প্রায় ধমক দিয়েই বলেছিল, 'মা চুপ কর। দেখছো না বাচাদের দিকে পেয়েছে। যদি চাটি ভাত থাকে তো দাও।'

বিভাবতী আরো ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'আদিখ্যেতা কোরনা রেণু। [illegible] আমাদের?'

রেণু মায়ের দিকে বিষদৃষ্টিতে চেয়ে দেখে। এই সময়ে বড় বিদ্রূপ মনে হচ্ছিল মাকে। মাকে কোন কথা না বলে বাসন্তীকে বলল, 'মাসী ওঠ। ঘরে যাও।'

বাসন্তী থতমত করে একবার রেণুর দিকে আর একবার বিভাবতীর দিকে চোখ ফেরাতে লাগল। একটু ঠোঁট নড়ল উঠল। পারল না। রেণু তাড়াতাড়ি এসে ধরে কেমন তাকে!

বিভাবতী রেণুকে চিঁচিয়ে উঠল, 'কি হোচ্ছে কি? এই ডাইনিকে আর ছোঁয়াছুঁয়ি করছো আবার? তবে আমি নাইতে দিবি?'

রেণু মায়ের দিকে চেয়ে বলল, 'তাহোলে সারাদিন আমাদের বাড়ির ভেতরে থাকুক। ওর তো নিজে নিজে খাবার ক্ষমতা নেই।'

বিভাবতী বলল, 'না নেই। আহ্লাদী এসে এঁটো পাত চাটবার ক্ষমতা তো ছিল।'

বিভাবতী নিজেই এসে বাসন্তীকে চান করিয়ে দিল।

রেণু দেখল মা যত রাগ করে কথা বলছিল কিন্তু বাসন্তীকে আদর করে দিতে গেল খুব যত্ন করেই। তবু মুখের শব্দ-[illegible] পারি তার রক্ত হয়নি। রেণু বাইরে গিয়ে নিজের স্কুলের টিফিনের পয়সা দিয়ে এক-পয়সার মুড়ি বাতাসা কিনে এনে মাকে বলল, 'এটা মাসীকে দিয়ে দাও না মা।'

বিভাবতী মেয়ের দিকে কেমন কিছু [illegible] কিছু না বলেই ঠোঙাটা বাসন্তীকে দিয়ে এক ঘটি জল দিল।

বাইরে এসে বলল, 'কাচা পেন্টুল ছেড়ে কাচা জামা পেন্টুল পরে ইস্কুলে যেও। আর পয়সার কৌটো থেকে টিফিনের পয়সাটা নিয়ে যেও। নিজেই কৌটো আবার [illegible]।'

এর পর বাসন্তী আরো বেশীদিন বাঁচেনি। বিভাবতী একমুঠো করে ভাত তরকারি শালপাতা কি কাগজে করে বাসন্তীকে দুপুরে ঘরে দিয়ে আসত। আর রেণু লুকিয়ে লুকিয়ে একঠোঙা মুড়ি বাতাসা কি [illegible] কিনে দিয়ে আসত তার হাতে।

বিভাবতী একদিন দুপুরে ভাত দিতে গিয়ে দেখল বাসন্তী মেঝের মধ্যে শুয়ে আছে। বিভাবতী ডাকল কিন্তু সে উঠল না। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখল বাসন্তীর দেহটা কাঠের মত শক্ত। কখন থেকে মরে পড়ে আছে কে জানে। হাতে তার মুঠো করে ধরা আছে বাতাসার একটা ঠোঙা।

সুবালা এখন সেই ঘরটায় থাকে। ঘর ঝোলায় আগে খুব ভাল করে নিকিয়ে [illegible] দিয়ে ধুয়ে একপোচ চুনও বুলিয়ে নিয়েছে মাটির দেওয়ালের গায়েই। চালের খুঁটিতে আড়াআড়ি আলনা বাঁধিয়ে নিয়েছে। ঘরটা বেশ ঝকঝক করে এখন। সুবালার ঘরে বসবার বিছানা, মাদুরে ওয়াড় দেওয়া বালিশ, এককোণে জলচৌকিতে ঠাকুরদেবতার ছবি। সেখানে ছোট ছোট শিশুদের [illegible]

ফুল। দেখতে বেশ ভালই লাগে। ট্রেনে ঝি ঝিঝির শব্দটুকু বাদ দিলে সবটাতেই থাকে বলদের গাড়ি, ঝিঁঝি পাটকাঠি পাতকুড়ি। আজকাল বিকেলের দিকে বাসে একটানা আসে। গরমে দুপুরের কড়িবরগাও বাদ করেছে তীর্থ থেকে ফিরে এসে।

বুড়ো লোকটা প্রায়ই বাড়িতে আসে। সুবালা নিজে পান খায় না কিন্তু বুড়োর জন্য আজকাল পানের ব্যবস্থাও রেখেছে। লোকটিও বেশ মিশুকে। বয়স তিরিশ তার বেশ। মাথায় বাবরি চুল। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী। পরনে মিহি কালোপেড়ে ধুতি। খুব পান খায়। হেসে হেসে মেয়েলি গলায় মিহি মিহি করে মেয়েদের মতো ভাব করতে সে ওস্তাদ।

পাড়া গাঁয়ে সে বেশি সময় মেয়েছেলের পাট করে। গান গায় সুরেলা গলায়। মাঝে মাঝে কাজুবাদাম বেচে বেড়ে বেড়ে আসর বাড়িয়ে যাবে।

রেণু বুড়োকে সহ্য করতে পারে না। পুরুষ মানুষ মেয়েছেলের পাট করবে তাই বলে সব সময় এমন মেয়েলিপনা, এমন হেলেদুলে চলা, মিহি মিহি করে মেয়েদের মতো গলায় কথা। ঘৃণা ধরে যায় তার।

আর আশ্চর্য। সে মেয়েদের পাট করে আর মেয়েদের মত হাবভাব করে বলে বাড়ির মেয়েরা বুড়োর সঙ্গে সব খুলে গল্প করে। সুবালা তো করেই আর নমবালাও সে তার সঙ্গে গল্প করেন এতে খুবই বিস্মিত বোধ করে সে।

কিন্তু গান শুনতে খুব নিবিড়। যাত্রা থিয়েটার আছে স্থির থাকতে পারে না বাড়িতে। কি যেন এক মোহিনী আকর্ষণী শক্তি আছে তাদের। যাবে না যাবে না করেও এক সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের জন্য হলেও দেখে আসে। অদ্ভুত নেশাগ্রস্ত মানুষের মত কিছুতেই এ টান রেণু কাটাতে পারে না।

এই বুড়োর জন্যেই পালা চলার সময়ে রেণুর টাইফয়েড পরীক্ষা পড়ে গেল। সে জানত, প্রথম দিকটা ক্লাইভদের পালাগান শুনে নিয়ে বাড়িতে এসে একবারে পড়াশোনা করবে রাত বারোটা একটা অবধি। শেষ রাতের পালাটা হবে বেশ জম নিয়ে।

তাই হল। নিত্যবন্ধী যখন রাত নাচে মঞ্চে নাচ কালীতলায় হাজির হোল তখন মায়ের কাছে বসে চাবি চেয়ে নিয়ে বাড়িতে চলে এল সে। অন্ধকার বাড়িতে ঢুকে মনে হোল কোথাও যেন কাদের ফিসফাস শব্দ শোনা যাচ্ছে। প্রায় দম বন্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কান পাতা করে শুনল। তার মনে হোল আওয়াজটা আসছে সুবালার ঘর থেকেই।

সুবালা তো এখন যাত্রার আসরে! যাত্রার আসরেও তো সুবালাকে সেখানে বসে থাকতে দেখেছে রেণু। তবে? নিশ্চয় চোর ঢুকেছে। খুব পা টিপে টিপে সন্তর্পণে সুবালার ঘরের দিকে গেল। ঘরের পাশের জানালার ফাঁক দিয়ে সরু আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। তবে কি চোরে আলো জ্বালিয়ে জিনিসপত্র দেখে দেখে বেছে বেছে নিয়ে যাচ্ছে? রেণু কপাটের ফাঁকে চোখ রাখল। সুবালার বিছানায় নবীন পাড়ি পরা একটি মেয়ে কাউকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। মেয়েটি কাকে যে জড়িয়ে ধরে আছে তা দেখতে পেল না রেণু, মেয়েটিকেও ভাল ভাবে চিনতে পারল না, কারণ সে দরজার দিকে পিছন ফিরে ছিল। ও পাশের লোকটি সম্পূর্ণ আড়ালে পড়ে গিয়েছে। শুধু চাদরখানা পা দেখতে পেয়ে বুঝেছিল ওদিকেও কেউ আছে। কিন্তু সুবালা যাত্রার আসরে এখন, তখনো নবীন পাড়ি পরা কোন মেয়ে কখন এল? কাকেই বা জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে সে। আবার খুবই কৌতূহল হোল তার কিন্তু কিছু করতে পারল না। এমনভাবে উঁকি দেবে মেয়েদের ভাবা যে সব গর্হিত কাজ এ বোধ তার পুরোপুরি হয়েছে। পা টিপে সরে সরে এল। নিজেদের ঘরের বাইরে প্রায় নিঃশব্দে বসল রেণু। কিন্তু আলো জ্বালল না। অন্ধকারে ঘরের ভিতর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে সুবালার ঘরের দিকে চেয়ে।

খানিক পরে অনেকক্ষণ বলে মনে হল। ঘর থেকে শাড়ি পরা মেয়েটি বেরিয়ে এল। গলায় ওর মালা ফুলের গোড়ে মালা তা অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে। এ ফুলের মালাটা রেণু দেখেছে আজই। বাড়িতে সুবালা গাঁথল হাতে একটা থালায়। আর যাত্রার আসরে বুড়োর গলায়। চোখ-জুড়ানো অন্ধকারে ফুলের মালা গলায় দেখা মেয়েটির চলার ঢঙ দেখেই রেণু বুঝল এ বেশে আসা বুড়ো। একটু নবীন পাড়ি পরে একটু আগে সে বৈষ্ণবীর পাট করছিল। আবার বেশ কিছু পরে ঘর তালা দিয়ে সাদা থান ধুতি পরা সুবালাও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

রেণু এবার আলো জ্বালল। বই খাতা খুলে পড়তে বসল কিন্তু তার চোখের সামনে খোলা বইয়ের পাতার একটি অক্ষর তার মনে ঢুকছিল না। চোখের সামনে ভাসছিল বুড়ো আর সুবালার চেহারা। ভাবের ঘরে থাকার দুখ। সুবালার বয়স যে পাড়েছে যাচ্ছে এটা সবাই বলাবলি করে পাড়ায়। নমবালাও বিস্তারীর কাছে প্রায়ই বলেন যাবা কথা রেণু শুনেছে।

কিন্তু আজ যেটা সে দেখল এতখানি নিশ্চয় কেউ জানে না। আর যোগ্য সুবালাকে তাদের বাড়িতে রাখা উচিত নয়। বাড়ির সকলে যদি কেউ জেনে ফেলে সুবালার এ দশা তাহ। কিন্তু মনে

কি সে সব কথা? জীবন বিমার সঙ্গে বেবু। তাকে বললে বড় জোর হেসে না দুবারাকে কখনো বাড়ি থেকে উঠে যেতে বলবে। কিন্তু দুবারা যে তিন টাকা ভাড়া তার মাসে মাসে। আর ঐ তিন টাকা তুলতে তাকে আরো কত পরিশ্রম করতে হবে, আরো কত কাজ ফেলে ছুটে বাড়ি দিনে দিনে সুতুল তুলতে হবে!

তাকে তাই কোন কথাই বলতে পারেন না বেবু। কিন্তু দুবারার দিকেও আর অমনো ভালভাবে চেয়ে দেখতে পারেন না সে। তাকে যদি বলে ফেলতেও আর কোনদিন পারেন না।

ছাব্বিশ

গত পাঁচ ছ বছর ধরে এ পাড়ার সর্বজনীন দুর্গাপুজো বিরাট করে উঠেছে। বিরাট বিরাট ফেস্টুন তুলিচিত্রে তুলিতে করছেন প্রতিবছর নতুন কায়দায়। দুর্গাকে আর বরাভয় প্রতিমা মনে হয় না। যেন জীবন্ত মানুষ। অসুরকে মনে হয় বাস্তবিক-ই। সিংহ যেন সত্য বন থেকে বেরিয়ে এসেছে।

আলো সাজানো হয় থিয়েটারের ঢঙে। পাড়ার আকাশ হয় বর্ণময়। বিদ্যুতের নানা মনোহারী ব্যবহার করা হয়। সারা কলকাতায় ঘোষ চেয়ে পরে এই প্রতিমা দেখতে। কলকাতার বাইরে থেকেও ট্রেনে চেপে লোকে আসে। বড় বড় ভিড় হচ্ছেই প্রত্যহ। কিন্তু প্যান্ডেলে বড় অন্ধকারের রাত থাকে। পাড়ার ছোটদের ছেলেরা এরা সবাই পুজোর সময়েই কাটায় সারা দিন রাত।

ছোট ছোট ছেলেদের বিশেষ করে কিশোরদের এ নিয়ে উৎসাহ উদ্দীপনার শেষ নেই। বুক বাধে এঁটে যখন তারা ভলান্টিয়ার হয় তখন তাদের মুখ দেখে মনে হয় কী প্রচণ্ড দায়িত্ব নিয়ে তারা চলাফেরা করছে। তাদের পাড়ার পুজো যে সেরা পুজো!

কিন্তু এ আনন্দ থেকে বেবু বঞ্চিত এ বছর। এই পুজোর কটা দিন সে বন্দীর মত থাকার কথা। বংশীর চলার পথ কোথায় কাকে সে। বংশীটা তাদের এখন যেন বড় আপনজন। দাদাটা ইংরিজিতে জিনিসটা উচ্চারণ। বেবু এখন সেদিকেও কান দেয় না। সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহে বেরোচ্ছে ইউনিয়নে। বেবু-দের বংশীতেও বিরাট দুখ বেরোচ্ছে। চতুর্থ দেবে হবেছে, মাস তিনেক বাদ। তার সাপ্তাহিক নাবো সেছে। বাকী সাটিনাম কাজ করতে হবে দুর্গাপুজোর মধ্যেই। চতু

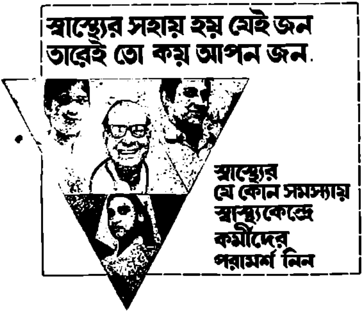

তথ্য বিভাগ/রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর – পঃ বঃ সরকার

মেয়ে নিয়ে আছে বাপের বাড়ি। কুমকেশবতী আবার অতঃপর গোবিন্দর পায়ের ফুলো ওলো কেটে বড় বড় ঘা হয়েছে। সে এখন ভর্তি হয়েছে ক্যাম্বেল হাসপাতালে। কুমকেশবতীও এখানে।

চন্ডীর বাবা খড় পাঠায় কিন্তু বড় অনিয়মিত। তারও মানুষ শেষ না হোলে টাকা দেবার ক্ষমতা থাকেনা। টাকা তার হাতে পেলে তবে তো টাকা দেবে! গোবিন্দর বাড়ি ভাড়া দেবে না আবার হয় প্রায় সবটাই যায় গোবিন্দর ওষুধ পথ্য কুমকেশবতীর চিকিৎসায়। অতঃপর হয়েছে বটে কিন্তু ম্যালেরিয়া তো তাকে ছাড়ে নি। সুতরাং এ অবস্থায় নানান ওষুধপত্র খাওয়াতে হচ্ছে তাকে।

বিভাবতী যেন গুম মেরে গাছে। কোন দিশাই পায়না যেন সে। বাজার যায় আঁচল ভরে নিয়ে আসে যত সস্তার সব্জী। একরাশ হাবা পটোল বার হয় একসাথায় দুদিন দেয়। নয়তো ঐ হয়েই পচা আলু পোকা ধরা বেগুন, চ্যাঙ্গন খবর না পাওয়া যায়। সস্তারের চাল আর সবচেয়ে সস্তা খদ্দাই বা খেঁসারি ডাল এই আসের নিত্যকার খাদ্য।

বেণু কি বলবে! একদিন বলেই ফেলল মাকে তার মাথায় যারা(বেটা) সত্য সেই কথাটা। বলল, 'আমি না হয় ইস্কুলটা ছেড়েই দি। কোন কারখানায় টারখানায় ঢুকে যাই।'

বিভাবতী ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইল বেশ অনেকক্ষণ, তারপর বলল, 'কথাটা তুই মন থেকে বোলনি বেণু?'

বেণু চুপ করে চোখ নামিয়ে বসে রইল।

বিভাবতী বলল, 'আর দুটো বছর চালাতে পারে তুই পাশটা দিবি, তার পরে একটা চাকরির যোগাড় হোলে আর আমাদের কোন কষ্ট থাকবে না। বাবা বেণু, তোকে লেখাপড়া ছাড়তে দেবনা, অন্তত দুটো বছর।'

'কিন্তু কি করে চলবে মা?'

'ভাবিস না, চলেই যাবে ঠিক।'

বিভাবতী চোখের জল মুছে নিল আঁচলে। বেণু অবাক হয়ে ভাবতে লাগল কোথা থেকে পায় মা এ সাহস। যত কষ্টই হোক মা কিছুতেই তাকে লেখাপড়া ছাড়তে দেবে না। অন্তত ম্যাট্রিকটা পাশ না হওয়া পর্যন্ত!

বেণু তাই আর বাড়াবার খাতা খোঁজে। প্রতিবছর পুজোর সময় বাবার সঙ্গে পাড়ায় রাখহরি পাল সবাই অনেক সরা বিক্রি করে। মাটির সরার পিছনে, চাটুর পিছনে লক্ষ্মীমূর্তি আঁকা থাকে। কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর সময় পূর্ববঙ্গের লোক পুজো করে ঐ সরা। প্রতি বাড়িতেই তাদের সরা পুজো হয়। বেশ চাহিদা আছে জিনিসটার। রাখু পাল তো করেই এ ছাড়া কৃষ্ণনগর নবদ্বীপ থেকে অনেক কারিগর এ সময় ঐ সরা আঁকতেই আসে। অনেকেই সরা বিক্রী করে ঐ সময়। বেণু প্রতিবছরই রাখে তাদের আঁকা। আঁকার প্রতিও তার সহজাত একটা অনুরাগ আছে। খুব ছোট থেকেই দুর্গা প্রতিমার পিছনে চালচিত্র আঁকা লক্ষ্মীর সরা আঁকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে সে। তাছাড়া তোলাবাবু পালও ভাল চালচিত্র আঁকতে পারতেন। তার হাতের আঁকা দুর্গার আর লক্ষ্মীর দুটো পট এখনো ঘরে টাঙানো আছে। রাখু দেখাদেখি বেণুও ছোটবেলাতেই কিছু কিছু আঁকাজোকা করত বেড়ে খাতায়। রাখু সখে তার আঁকা সংশোধন করে দিতেন।

বাপ মরবার আগে থেকেই মাথায় তার মতলবটা ঘুরছিল। কেন সে পারবে না সরা আঁকতে। এমন কিছু শক্ত নয়। সে দুটো নমুনা সরা আঁকল। একটা সরা একটা চাটু। তার আগে কিছুদিন ধরে খাতায় অভ্যাস করল আঁকাটা। নমুনা দুটো নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল বৈঠকখানা বাজারে। ওখানে মাখনবাবুর মাটির কলসীর দোকান। মাখনবাবু বড়বড় মাটির পুতুলও বিক্রি করেন। বেণুদের একজন বড় পাই-কার তিনি।

বেণু দেখেছে মাখনবাবু রাখু পাল মশাইয়ের কাছে প্রতিবছর লক্ষ্মীর সরাও পাইকারি কিনে নিয়ে যান।

বেণুকে একটু স্নেহের চোখে দ্যাখেন তিনি। তিনি তাকে দেখেছেন একমনে পুতুল রং করতে করে সেই একটুকু বয়েস থেকে। এও জানেন, বেণু বেশ মাথাওয়ালা স্কুলে পড়ে এবং প্রতিবছর ভালভাবে পাশ করে ক্লাসে ওঠে। এদেশে তো বস্তির ছেলেরা বিশেষ কেউ পড়াশোনা করে না তার ওপর এই ছেলেটা সংসারে পয়সা উপায়ের সাহায্য করে লেখাপড়া শিখছে। পড়াশোনায় সাহায্য করার মত একটা বাড়ীর কেন, বাবা কাকা জ্যাঠা কেউ নেই ছেলেটার।

তাই প্রতিবছর সরস্বতী পুতুল কিনতে এসে প্রত্যেকই বেণুকে জিজ্ঞেস করেন 'বেণু-বাবু, কোন্ ক্লাস হোল?' এবারও ব্যতিক্রম হয় নি।

বেণু বলেছিল 'টেস্টেও পাস।'

'বাঃ বাঃ! কোন সেকশন? নিশ্চয়ই 'এ' সেকশন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

এবারে আরও উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন মাখনবাবু, 'চমৎকার! চমৎকার! আর দুটো বছর। ব্যাস। বেণুবাবু ম্যাট্রিক পাশ করা ফেলেছেন্যাব! তবে এ্যাতো আনন্দ হয়। মন দিয়ে পড়। বাপ দুঃখ ঘোচাও।'

তারপর বিভাবতীকে তিনি বললেন, 'মা, ছেলে আপনার রত্ন। ওর লেখাপড়াটা বন্ধ করবেন না যেনো।'

বিভাবতী বলে, 'কদিন আর টানতে

পারবো বুঝছি না বাবা।'

'না না সে কি কথা। চালিয়ে যাব চালিয়ে যাব। অন্তত দুটো বছর। ছেলে কি। মাথার নেই, বাবার অসুখ ব্যাপার কেউ নেই, আলোয়াম খেতে পায় না, আপনার সঙ্গে দয়াশে পুতুলের কাজ করে পাশ করে যাচ্ছে বছর বছর—না না এ ছেলের পড়াশুনো বন্ধ করে কেউ!'

তারপর বেণুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'যার হবার এমনি করেই হয় না। আমার ছেলেটা দেখুন। বাড়িতে দু দুটো মাস্টার। কোনোদিকের কোন অভাব নেই। নিটো দুখটো মাষ্টো, আবার একাদিনের মধ্য পিসির জন্য ডোজ কইয়াছেন যাবা খাওয়াতে হবে। সবই হচ্ছে। কিন্তু ছেলে সেই যে প্রাণ কাইবে গাঁট হোয়ে বসে আছে দাড়ি গোঁপ গজিয়ে গ্যালো লেখার থেকে মন্তরে অক্ষর নেই।' বলে নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

মাষ্টারমশাই দুটো হেসে বললেন, 'খুব ভালো দুমি হবে চলবে। চালিয়ে যাবে। তা বেণুবাবু এটাও শুরু করলে, লেখাপড়াটার ক্ষতি হবে নাতো?'

বেণু খাড় কিছু করে বলল, 'না এ তো পুজোর ছুটির মধ্যে করবো। কটা দিনের তো কাজ।'

মাষ্টারবাবু খুশীর ছিলেন বেশ কিছু দরের। প্রায় একশো খানার মত ছোট বড় জিনিসে অগ্রিম কিছু দিলেন।

বেণু এসে বিভাবতীকে খুশির খবরটা দিল। প্রায় পঁচিশ টাকার মত কাজ এখন পাওয়া গেছে। আরো বড় জোর গোটা চার চাই।

বিভাবতী খুশি হোল বটে কিন্তু বলল, 'বেণু, তুই একা হাতে অত সব পারবি?'

বেণু তখন আনন্দে আত্মহারা। নিজের চেষ্টায় এই প্রথম উপার্জন হবে তার। সে বলল, 'পারবো না, খুব পারবো।'

মাটির মডা দিয়ে প্রথমে মানুষের চেহারা দিয়ে তার উপর খড় বাঁধি কাঠামো, তারপর মাটি তলে তার উপর চৌখস করে লাগানো। শুকিয়ে গেলে তার উপর একটা আকাশী রঙের আস্তর। এই কাজগুলো বেণুকে করতে হোল না। ছোটী বিভাবতী দুজনে মিলে একলা করে দিলে। তারপর থেকে বেণুর কাজ। প্রথমে হালকা তুলি। তারপর রঙের কাজ। সব এক হাতে করা। এখানে আর কারো সাহায্য পাওয়া যাবে না। বিভাবতী ছোটী দুজনেরই সবাই চায় বেণুকে সাহায্য করতে কিন্তু আঁকার ব্যাপারে তারা নিতান্ত অনভ্যস্ত। ছোটী বরং একটু কিছু কিছুতেই ঠিকমত নকশাটা আঁকতে পারল না।

পুজোর ছুটির কিছু আগে জুর আসাই করে বেণু আঁকতে বসল। সকাল ছটা থেকে রাত্রি দশটা এগারোটা পর্যন্ত। মাঝে স্নান করে দুটি খাওয়া। পিঠের শিরদাঁড়া টনটন করে, হাতের আঙুল টনটন করে, চোখ কনকন করে। তবু উঠতে পারে না। পাড়ায় সবারোয়ে সর্বজনীন পুজোর হচ্ছে। ভিড় গোলমাল সব কানে আসছে। মন তার ছটফট করছে একটা খাম খুলে এঁটে অনার্দী কিছু করার জন্য, কিন্তু পারছে না যেতে। সবচেয়ে বড়ো বাধা নিয়েছে সে। তার জীবনের প্রথম উপার্জন। সেটা শেষ করতেই হবে। কুড়ি একুশ টাকা। একশালের ওপর মধ্যে বহর। এতগুলো মুখ সাজাবে। বেণু তাতে আর আঁকে।

অষ্টমী পুজোর দিন সকালবেলা জোর করে তাকে উঠিয়ে দিল ছোটী। বিভাবতী নেই। মাস্টারমশাই সঙ্গে তার ক্যারেন্স হাসপাতালে যায় দিয়েছেন ফেলা জামাইদের খাবার দিতে। সে কতদিন বেণু তার আঁকার ব্যস্ত থাকবে সে কতদিন ওরাই যাবে। নইলে এ ডিউটিটাও স্কুল থেকে ফিরে বেণুকেই করতে হয়।

ছোটী বলল, 'বেণু ওঠ, একটু বাইরে থেকে ঘুরে আয়। এইভাবে ঠায় বসে থাকতে সকাল থেকে রাত্তির অবি পারে কোনো মানুষ? যা বেড়িয়ে আয়, ঠাকুর দেখে আয়, ওঠ বোলছি।'

বেণু ছোটদির তাড়াতেই উঠে পড়ল। তার মনও চাইছিল বাইরের আনন্দের মধ্যে নিজেকে একটু মিশিয়ে দিতে। উঠে মুখে চোখে জল দিল। একটা লুঙির উপর শার্টটা পরল। দুটোই পুরোনো। নতুন জামা কাপড় কে দেবে তাকে পুজো সময়? অমনি নয়া বেচে যদি হয়।

'বেণু শোন,' ছোটী পিছন থেকে ডাকল।

'কি ছোটদি?'

ছোটী আঁচল থেকে খুলে একটা ছোটো দুখানি দিল তার হাতে। বলল, 'কিছু কিনে খাস।'

বেণু বলল, 'এ আবার ক্যানো দিচ্ছ তুমি?'

'কিছুই বা। দিতে নেই? বছরকার দিন তুই ছোট ভাই।'

'না না, তোমার কত দরকার লাগতে পারে। এ তুমি রেখে দাও।'

'আবার আবার কি দরকার। যা তুই, যা এখন।'

বেণু প্রথমে কিছু ঠেলে ঠেলে পাড়ার পুজোমণ্ডপে এসে হাজির হোল। হ্যাঁবা কমল গোপালদার সঙ্গে। গোপালদা ক্লাবটার সর্দার। মস্ত চওড়া বিশাল চেহারার লোক।

'গোপালদা, একটা ব্যাজ দিন না।'

'এখন ব্যাজ ট্যাজ নেই, যাও। এসেছেন ছিনি জোঁকা।' বলে অবজ্ঞাভরে গোপালদা সর দিল।

বেণু একপাশে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। পাড়ার সমবয়সী ছেলেরা, বড়রা বুকে ব্যাজ এঁটে বুক ফুলিয়ে ঘোরাফেরা করছে। আর

এবার বিরক্তি বাধান বেণু গোপালদার কাছে, 'গোপালদা দিন না—'

গোপালদা ধমক দিল এবার, 'আলাতন করিস নি তোরা। এখন ব্যাজ কোথায় পাবো। ব্যাজ নিয়ে গেছে বাচ্চা ক্লিনটের দলে আসতে হবে।'

গুটি গুটি চলে আসে। ওখানে থাকা সম্ভব না আর। এ পাড়াতেই থাকা সম্ভব না। পাড়ারই ছেলে অথচ এ সময় বুকে ব্যাজ নেই এ হোতে পারে না।

বেণু বেরিয়ে এল পাড়া থেকে। পকেটে ছোটদির দেওয়া দুআনিটা নাড়তে নাড়তে মনে হোল তার নাগরদোলা চড়ার কথা। রাস্তায় রাস্তায় নাগরদোলা বসে। ওখানেও পুজোর মেলা বসে।

ভিড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আন-মনা ভাবছিল হঠাৎ কে যেন ডাকল তাকে, 'বেণু, এাই বেণু।'

বেণু পিছন ফিরে দেখল পুঁটি। পুঁটি দেখতে এখন অন্যরকম হয়ে গ্যাছে। অনেক বড় বড় মনে হয়। শাড়ি পরেছে সে। তার মুখের দিকে বেণু চাইতেই পারে না। লজ্জা করে। চোখ নামিয়ে নেয়। পুঁটির সঙ্গে তার দেখা বন্ধ হয়ে গ্যাছে অনেক দিন। পুঁটি মাঝে মাঝে তাদের বাড়িতে আসে। দিদিদের সঙ্গে গল্প করে যাবার সময় কিছু কথাবার্তাও বলে। কিন্তু বেণুর সঙ্গে তার কথাবার্তা কেমনধারা সব বন্ধ। বাড়িতে চোখাচোখি হলেও মনে হয় যেন তারা পরস্পরের অপরিচিত। দু পক্ষেই কেমন এক সংকোচ তা দুজনেই বোঝে না বোধ হয়।

এখন পুঁটি তার হাতটা ধরে বলল, 'দাঁড়াও।'

পুঁটির ছোঁওয়ায় বেণুর শরীরটা শির-শির করে উঠল, কোনমতে চোখ তুলে বলল, 'ক্যানো?'

পুঁটি বলল, 'দিদিদের সঙ্গে এসেছিলুম ঠাকুর দেখতে। ওরা যা ভিড় বাবা ভিড়। কিন্তু বাঁড়ুজ্জে বাড়িতে ঠাকুর দেখছিলুম যখন কোথায় যে হারিয়ে গ্যালো আর খুঁজে পাচ্ছি না। অ্যাতো ভয় পাচ্ছিলুম। একা একা বাড়ি ফিরবো কি করে ভাবছিলুম।'

বেণু বলল, 'অ্যাতো ভয় কিসের? বাড়ি তো আর খুব বেশি দূর নয়।'

পুঁটি বলল, 'ও তুমি বুঝবে না। অ্যাতো ভিড় অ্যাতো অ্যাতো বেটাছেলে দেখলেই ছোঁড়াগুলো যে কি করে। এই তো একটু আগেই অ্যাকটা বুড়োলোক আমায় চিমটে দিল। ভাগ্যিস তোমায় দেখতে পেলুম।'

তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি একা এসেছো?'

'হুঁ।'

'এখুনি পাড়ায় যাবে?'

'না তো। এইমাত্তর এলুম।'

'তবে কোথায় যাবে এখন?'

'তেমন কোথাও না, এই একটু নাগর-দোলা চড়বো ঘুরবো এদিক ওদিক।'

'বেণু, চল না আগে একটু দিদিদের খুঁজে দেখি।'

বেণু বলল, 'চল।'

হঠাৎ বেণুর মনে হোল তারা পরস্পরকে তুই তোকারি করত কিন্তু এখন দুজনেই তুমি তুমি করে কথা বলছে। বেণু আড়-চোখে পুঁটির দিকে চেয়ে দেখল একবার। না, এতদিন পরে এতবড় মেয়েকে 'তুই' বলে কথা বলা তার পক্ষে অসম্ভব।

অনেক জায়গায় খুঁজল তারা। তিনটে রাজবাড়িতে পুজো হয়। বড় রাজবাড়ি অর্থাৎ রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ি, বাঁড়ুজ্জে বাড়ি আর বটতলার বাড়ি। কিন্তু কোথাও দিদি বা তার মাকে কাকাকে দেখতে পেল না।

পুঁটি বলল, 'এখন কি হবে কি করে বাড়ি যাবো?'

বেণু বলল, 'নাগরদোলা চড়বে? চল না একবার নাগরদোলা চড়ে ঘুরেই পাড়ায় ফিরব।'

পুঁটি বলল, 'ওরে বাবা রক্ষে কর, নাগরদোলা চড়লে আমার মাথা ঘোরে বমি পায়।'

বেণু বলল, 'চল তাহলে পাড়ায় ফিরি।'

পুঁটি বলল, 'ভাবো দিকিনি আমার জন্যে তোমার দেখা হোল না একটুও। নাগরদোলা চড়া হোল না।'

বেণু বলল, 'তাতে কি? তোমায় পৌঁছে দিয়েই আমি আবার ফিরে আসবো। নাগরদোলা চাপবো ঘুরবো।'

যেতে যেতে একটা ফুচকাওলার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল পুঁটি বেণুকে বলল, 'এসো ফুচকা খাই।'

'না না, আমি এই মাত্তর আলুকাব্লি ঘুগ্নি খেলুম তো। তুমি খাও।'

'তুমি না খেলে আমি খাবো না। এসো না। দুটো ফুচকা খেলে কিছু হবে না। এসো।'

হাত ধরে টানল পুঁটি। আবার শরীর শিউরে উঠল বেণুর। মনে হোল পুঁটির শরীরে কি ইলেকট্রিক কারেন্ট রয়েছে? সে হাত ধরলে বেণুর শরীর এত শিউরে ওঠে কেন?

পুজোর সময় দর বাড়িয়েছে ফুচকা-ওলা। এক পয়সায় চারটে ফুচকা। এতো দিনে ডাকাতি! পুঁটি ঝগড়া করে পাঁচ-টার রফা করাল। পুঁটি যেন দু পয়সার বেণু এক পয়সার। দাম পুঁটিই দিল। বেণুকে কিছুতেই দিতে দিল না।

পথ চলতে চলতে পুঁটি বলল, 'ব্যাটা-ছেলে হওয়ার বেশ মজা।'

'ক্যানো?'

'যখন একা একা ঘুরতে পাও, বেড়াতে পাও। আমাদের আজকাল বা

তো বাড়ি থেকে বেরোতেই চায় না। বাবাও বকাবকি করে।'

খানিক চুপচাপ পথ হাঁটা। পুঁটি বেণু পাশাপাশি। বেণুর জড়তা কাটছে একটু করে। বেশ ভাল লাগছে পুঁটির সঙ্গে হাঁটতে। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক দেখছে চেয়ে। পাড়ার চেনা জানা কেউ নেই তো। দেখলেই সর্বনাশ। বেণুর হুলুস্থুলু শুরু হয়ে যাবে।

পুঁটি বলল, 'জেঠিমাদের বাড়ি বেশ ছিলুম, বেণু? ক্যারম খেলতুম, পুতুল, লুডো, চোর চোর।'

বেণু একটু হেসে বলল, 'তোমাদের বাড়ির বড় বারান্দায় সেই গানটা গেয়েছিলি, সেই যে ঝিরঝির কিছু ভালো লাগে না যায়?'

পুঁটি বলল, 'হুঁ মনে আছে তো। গায়। এখানেও সব সময় ক্যাসেট বাজে ছুটতে গান করে তাই না?'

'হুঁ। কিন্তু খুব ভালো গায়। কি মিষ্টি গলা! আমার যদি অমন গলা থাকতো।'

পুঁটি বলল, 'কি করতে? গান গেয়ে ফিল্মে জোরে বাজাতে রেকর্ড হতে?'

বেণু হেসে ফেলল। পুঁটিও।

একটু পরে পুঁটি বলল, 'জানো আমার শিগগির বে হয়ে যাবে।'

বেণু জানত না। বলল, 'কোথায়?'

'তা জানি না। বড়রা না ঠিকঠাক।'

আবার একটু চুপ করে থেকে পুঁটিই বলল, 'আমি বোকা'।

'সে কি, বোকা ক্যাবলা?'

'মায়ের কি রকম জানা চেনা।'

বেণুর কেমন যেন কষ্ট হচ্ছিল। মনটা মেঘলায় ভরে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। বলল, 'বোকার সঙ্গে বিয়ে হলে তোমার ভালো লাগবে পুঁটি?'

'বোকাকে না।'

'তবে বিয়ে করো ক্যাবলা?'

'কি করব? বাবাজী যে আমার বে করবে? আমার কি কান্নার ঠিক আছে? সবাই বলে আমি ঘুমিয়ে পাকা মেয়ে।'

বেণুর কান্না পেয়েই যাচ্ছে। ও বলে কেমন, 'পুঁটি এ বিয়ে তুমি কোরো না।'

পুঁটি বেণুর দিকে চেয়ে দেখল একবার। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'কি করবো তাহলে? কে আমায় পুষবে? খাওয়াবে পরাবে? বাবা মা আমার যে খাইয়েছে পরিয়েছে এই ঢের। না বেণু, আর ওদের ঘাড়ে চেপে থাকা যায় না। হয় বে করতে হবে নয় আমার দাদা ম্যানেজার মামাদের বাড়ায় যেতে হবে। আমি যে মেয়েছেলে। আমি যাই।'

পাড়া এসে গিয়েছিল। পুঁটি তাড়াতাড়ি মিশে গেল ভিড়ের সঙ্গে।

বেণুর মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পুঁটির বিয়ে হবে কিনা একটা বোকার সঙ্গে? কিছুতেই এ কথাটা মেনে নিতে পারছিল না সে। কিন্তু পুঁটির বাবাদের সঙ্গে বিয়ে হলেই কি তার সুবিধে হোত? কষ্ট হোত না?

আর কিছু বলাবলি না করে চলে গেল না বেণু। বিকেল মনটা নিয়ে ফিরে গিয়ে বসল পড়া খাতাতে। চন্দ্রা এসে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন খাবি? খাবার বাড়বো বলছি?'

বেণু বলল, 'হ্যাঁ ছোটদি, নইলে টাইমে স্কুলে যেতে পারবো না।'

চন্দ্রা ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

সাতাশ

রাত প্রায় দশটা। বেণু চুপ করে গঙ্গার ঘাটের সিঁড়ির উপর বসেছিল। অনবরত জোয়ার চলছে। আকাশ বেশ মেঘ করে আছে অথচ বৃষ্টি কিন্তু ঠিকমত শুরু হচ্ছে না। দু একবার সামান্য আকাশ দু'চার ফোঁটা জল পড়েছে কিন্তু তাতে গরমটা আরো যেন বেড়ে গেছে। বাতাস কোথাও একফোঁটা হাওয়া নেই। গায়ে চটচটে অস্বস্তি। গঙ্গার বাতাসটা তুলনায় অনেক ঠাণ্ডা। অনেকটা হালকা। জল থেকে উঠে আসা শীতল হাওয়ায় প্রাণভরে শ্বাস নেওয়া যায়। আর যায় ভাবনা করা। এই নির্জন পরিবেশে জলের দিকে চেয়ে চেয়ে দূরে ওপারের আলোর মালার দিকে চেয়ে চেয়ে নিজের মনকে ছেড়ে দেওয়া যায় যতদূর সে যেতে পারে।

বেণুর একটাই ভাবনা এই মুহূর্তে। আগামীকাল তোর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বেরোবে। সেই ভয়। যদি ফেল করে? যদি ফেল? নির্ঘাৎ ফেল করবে। কেউ বাঁচাতে পারবে না তাকে। পড়ল কবে যে পাস করবে? সে যা পড়েছে সেরকম পড়ায় কেউ পরীক্ষা পাস করতে পারে না। অঙ্ক প্রশ্নে উত্তর দিয়েছে যার পরিচিত সবগুলোর। ইংরিজি অর্ধেক প্রশ্নের অর্থই বুঝতে পারে নি। আবোল তাবোল উত্তর দিয়েছে।

উঃ! গত পৌনে দু বছর যে কিভাবে কেটেছে! যখন থেকে গোবিন্দ তার পায়ের ঘা নিয়ে ক্যাম্বেল হাসপাতালে ভর্তি হোল। সে মাসটা ছিল ঊনিশশো ঊন-চল্লিশ সালের আগষ্ট মাস। গোবিন্দ ক্যাম্বেল হাসপাতালে আর দুর্ভোগ তখন কাটালেও অভাব-অবস্থায় তাদের বাড়ি। গোবিন্দর ঘরের আলোহীন বাতাসের অভাব ছিল। ইতিমধ্যে অবস্থার পড়তি হওয়ায় সেটা অবশ্য অনেক কমে গিয়েছিল কিন্তু হাসপাতালের খাবার দুবেলা খেয়ে বাঁচা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। বেণুকেই প্রতিদিন স্কুল থেকে ফিরে বিকেলবেলা দৌড়তে হোত খাবার নিয়ে ক্যাম্বেল হাসপাতালে। যেদিন দেরি হয়ে যেত সেদিন ট্রামে যেত নইলে হেঁটেই যাওয়াআসা। কারণ প্রতিদিন যাতায়াতে দশপয়সা ট্রামভাড়া খরচ করা বেণুর পক্ষে বিলাসিতার শামিল। বড় বেশি বিলাসিতা। তাই রোজই প্রায় দু'মাইল

পথ সে হাঁটত। পুজোর সময় কটা দিন বেণু যেতে পারে কি বন্যার সঙ্গে থাকবার জন্য। তখন পারে বিভাবতী আর মনখারাপ।

গোবিন্দ আবার দিনে অপেক্ষা করত বেণুর। বেণুর খাবা দাবার খেতে খেতে বাবা উপদেশ দিত। গোবিন্দর যা কিছু পরামর্শ সব এখন বেণুর সঙ্গে। সে অফিসের ব্যাপারই হোক আর সংসারের ব্যাপারেই হোক। বাপি বলত, 'তুমি পাশটা করেই দেখ। আমার ছাত্র আছে হাইস্কুলে। সেখানে ইংরেজীর হয়েছে। তাকে বলে রেখেছি। সে নিশ্চয় তোমায় একটা চাকরি করে দেবে।'

বেণু বোঝে যেন ক্রমশঃ তার ওপর এখন কতটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তার তো আর কেউ নেই। হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে বেশি সময় সে অবশ্য চিন্তা করত বই নিয়ে। বেণুদের স্কুল ম্যাগাজিনে এক কিস্তি ছাপা হবার পর ম্যাগাজিন যে প্রেস ছাপে তারা বলেছিল এই উপন্যাসের আর তাদের পক্ষে ছাপা অসম্ভব। তাদের ঐ টাইপ নেই। সব সংখ্যাটি চেয়ে চিন্তে ধার করে এনে ছেপেছে। তখন বেণুর স্কুলের হেডমাস্টার মশাই এমন একটা প্রেসে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন যারা শুধু অঙ্কের বই ছাপবার জন্যই বিখ্যাত। গোবিন্দর প্রতি দয়াপরবশ হয়েই হোক আর হেডমাস্টার মশাইয়ের প্রভাবের ফলেই হোক তাঁরা এক হাজার কপি পুস্তিকা ছেপে দিলেন বিনামূল্যে। কাগজের দামটাও নিলেন না।

গোবিন্দ সেই পুস্তিকার নাম দিয়েছিল ম্যাথেমেটিক্যাল চ্যালেঞ্জ পেপার। ছাপবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই পুস্তিকা আন্তর্জাতিক জগতে প্রচার করার চেষ্টাও করেছিল সে। কোন্ অদৃশ্য হাতের নির্দেশমতো, আমেরিকা, অস্ট্রিয়া, জার্মানি, রোম, সমস্ত দেশের নামকরা অঙ্কের পত্রিকার কাছে পাঠিয়েছিল তার কাগজ। আশা ছিল যে সারা বিশ্বের মহাপ্রাণ, তাদের কাছে পড়বার সময় আছে, তারা ঠিক তাদের ভুল ধরবে যেবে, স্বীকৃতি দেবে নিজের বাঁকুড়োয়।

কিন্তু অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। গোবিন্দ যখন হাসপাতালে আর যেতে গেল দ্বিতীয় কিস্তি। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তার পাঠানো বড় হোল বিশেষ অনুমতি ছাড়া।

গোবিন্দ সব খরচই চালাচ্ছিল স্কুলমাস্টারীর মাইনে থেকে, হোস্টেলের আসবাব পত্র বেচে। তার অবস্থা তখন এত সঙ্গীন হয়েছিল যে হাসপাতালে আসার অত বড় বাক্সটা চাকা খুলে দাড়ির দাম দিয়েছিল।

স্বাভাবিকভাবেই গোবিন্দ ভেঙে পড়েছিল। এক রোগের দারুণ যন্ত্রণা থাকতো যেখানে কিলবিল করে পোকা বেরোত। তার ওপর অর্থের এই পরিণতি। আর্থিক দুরবস্থা তো ছিলই। শুধু বেণু দেখে তাকে বলত, 'বেণু একটা কপি বই দিয়ে ডক্টর বাগচির ওখানে দিয়ে আসবে?'

'কোন বাগচি?'

'ওই যে ডক্টর হরিদেব বাগচি। অঙ্কের ধুরন্ধর পণ্ডিত এখন যোগেশ সরকারের একুশেবর রোডের ধারে। কোথায় থাকেন তা জানি না। আগে তো থাকতেন শীলের স্ট্রিটে।'

এক একসময় অবাক হয় বেণু তার ক্রমিক পরিণতি এখনো কেন এই অসংগতির দিকে ছুটেছে! কিছু হবে না, কেউ গ্রাহ্য করবে না, সাহায্যও করবে না কেউ তবু এই চেষ্টা! কিন্তু ডাক্তার বেণুকে কি বলল যেন তা গোবিন্দ জেনে দেখবে কি? একে তো তার নিজস্ব সময় বলতে কিছু ছিল না তার ওপর এই ফেরিওয়ালার কাজ করতে সারা কলকাতা শহর ছুটোছুটি করে বেড়াতে হোত। অথচ গাড়ি ভাড়া বড়, বেণুর কল্পনা সময় নষ্ট। কিন্তু কি বলবে পারে এই অবস্থায় মানুষটাকে? সে যে একাগ্রভাবে এখন আশাই ওপর ভরসা করে আছে।

অতএব সে বলতে বাধ্য হোত 'যাবো, এই রবিবারে গিয়ে দিয়ে আসবো।' কিন্তু বাড়ির ঠিকানা খোঁজবার জন্যে তাকে রাস্তার বড় রাস্তার বাড়ি যেতে হোত। তারা যেখানে বড় সময় একমাত্র তাদের বাড়িতেই টেলিফোন ডাইরেক্টরী আছে।

এসব উটকো ঝামেলায় বিরক্ত থাকতে হয়েছিল তাকে। এছাড়া মাঝে মাঝে বাজারহাট যাওয়া ছিল। বাড়ি ঘর তারা বন্ধ করে এসেছিল। গোবিন্দ ঘর খুলে খুলে দেখে আসা আর দোকানঘরগুলো ভাড়াটেদের কাছ থেকে বেচাকিনি করে আদায় দিয়ে আসার কাজটাও বেণুকেই করতে হোত।

এরি মধ্যে বিধিষ্ঠ সময়ে দুঃসংবাদটা এসে গেল দু'টি সন্তান একসঙ্গে। চারিদিকে যেন বিপদের ছায়া! বিভাবতী মাঝে মাঝে হঠাৎ হয়ে চেয়ে থাকে বেণুর দিকে। বেণু তার মায়ের দিকে। আলো পুতুল তৈরির চেষ্টা করে বিভাবতী। মাঝে মাঝে মাঝে খুব ভেবে বেণু ম্যাপে যায় মায়ের প্রচণ্ড শীতে কোলের ভেতর ছাতিকেল নিয়ে যা সবেতেই পুতুল ভুলছে তাঁরা কনকনে মাটি হাতে টিপে টিপে। মাঝে মাঝে ঢুলে ঢুলে পড়ছে ছাতিকেলের মাথার ওপর। ঘুমে হঠাৎ ঝাঁকা লাগলে আবার চোখ চেয়ে হাতে মাটি টিপছে।

বেণুরা সবাই তখন দেশের ভাবার। বড় কষ্ট হয় বেণুর মায়ের জন্য। কান্না পায় তার। কিন্তু কি করে মাকে এই কঠোর হাত থেকে রেহাই দেবে তা কিছুতেই ভেবে পায় না।

ওদিকে কিস্তিদের প্রভাব ধীরে ধীরে এ দেশের ওপরও এসে পড়ল, সবাই দুর্বল এ যুগে সব চলে না। যত দিন যেতে

দামের দিকে প্রয়োজনীয় জিনিসের বাজারে অভাব হোতে লাগল। দাম বাড়তে শুরু করল একটু একটু করে।

এদিক দিয়ে চলেছিল বেণুর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পড়াশোনা। ম্যাট্রিকুলেশন নয়, ওটা ছিল বেণুর জীবনের চরম পরীক্ষা। এই শেষ। পাশ করলে হয়ত কোথাও একটা চাকরি জুটবে আর ফেল করলে কে জানে বেণু ডুবে যাবে কোন অতলে!

কিন্তু বেণুর সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল পড়াশোনা করার মত একটা পরিবেশ, একটা নিভৃত গৃহকোণ যেখানে বসে অন্তত দু ঘণ্টার জন্য সে মন দিতে পারতো। কিন্তু বাড়িতে কোথায় ছিল সে পরিবেশ? ভুবনেশ্বরীর ছেলে মেয়ের কান্না, চড়াই মেয়ের হাসাহাসি, বিজয়েন্দ্রর সঙ্গে বেণুর বিবিধের নিত্য ঝগড়া। শান্ত ভুবনেশ্বরী এখন আর শান্ত নেই। রোগে চিকিৎসার অভাবে তার মেজাজ সব একেবারে খা খা করে জ্বলে। জ্বলে বিজয়েন্দ্রও। তাই একজন অন্যজনের কথা শুনেই দপ করে জ্বলে ওঠে।

বেণু বই নিয়ে বেরিয়ে চলে যায় গঙ্গার ধারে। ছুটির দিনে বিরাট [illegible] গাছের ছায়ায় বসে পড়ে।

রাতে অবশ্য আরো অসুবিধা। ভুবনেশ্বরী চড়াই মেয়েদের কান্না হয়তো একটু থামে। তারা ঘুমিয়ে পড়লে কিন্তু পাড়ার হল্লা বেড়ে ওঠে।

যুদ্ধের বাজারে অনেক বেকার ছেলে কলে কারখানায় কাজ পেয়েছে। [illegible] আমদানি হয়েছে ইত্যাদি দু দিকেও হাতে লোকেও কেউ কেউ দু পয়সার মুখ দেখেছে। হাতে যখন পয়সা আসে তখন ফুর্তির জোয়ার। আর সে জোয়ারের ঢেউ প্রবলেই এসে লাগে বেণুদের পাড়ায়। আরো বেশি হয়, আরো বেশি বেপরোয়া ভাব, আরো বেশি হল্লা।

আগে বাইরের লোকেরা আসত ঠিক বেশ্যাদের। তারা হল্লা করলে পাড়ার ছোকরারা শাসাত। এখন পাড়ার ছোকরারাই তাদের সঙ্গে মেতে উঠল। কে শাসাবে কাকে?

বেণুর বাড়িতে বসে পড়া হয়ে যায় সন্ধ্যার পর মা বোনের সঙ্গে একসাথে বসে থাকা দুষ্কর হোত। তাকে এসে বাবা মারত অবিরত বোকা কথার চেষ্টা, বোকা আজীব সব গল্প।

সন্ধ্যার পর প্রতিদিনই বইখাতা নিয়ে বেরিয়ে যেতো সে। আসত এখানে এই পড়ার ঘাটে।

ভুবনেশ্বরী বলত, 'বেণু কোথায় যাস রোজ রোজ! তোর পরীক্ষার পড়া।'

বেণু বলত, 'যাই একটু নিরিবিলি পড়ার জায়গা খুঁজতে।'

'ওমা বাড়িতে কি হোল, এখন তো ছেলেমেয়েরা ঘুমোচ্ছে।'

বেণু পাশের বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বলত, 'শুনতে পাচ্ছো না কি চলছে। বসাই যায় না তো পড়া।'

'সত্যি বাপু, যত্ত বাড়াবাড়ি করে তুলেছে এ্যাদের। না তো রোজ বাড়িউলিকে বলে কিন্তু কে শোনে কার কথা? হবে না। পাড়ার ছোকরাগুলোও জুটেছে যে। আবার পাচ্ছে ওরা।'

এ জায়গাটা নির্জন। সিঁড়ির ওপর ইলেকট্রিক আলোও জ্বলে একটা। এখানেই বসে সে পড়ত। গানের পড়া। মাঝে মাঝে মনে মনে হাসত। বিদ্যাসাগর রাস্তার গ্যাসের আলোয় পড়ে বিদ্যাসাগর হয়েছিলেন। সেও সরকারী ইলেকট্রিক আলোয় নিচে পড়ে দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর হবে।

বেণুর কাছে বড় সুন্দর লাগে রাতের এই গঙ্গার তীর। কলকল করে বয়ে যাওয়া স্রোতের শব্দ, বড় বড় স্টীমার নৌকোর ছাড় টিমার শব্দ ঝাঁচ—হুশ ঝাঁচ হুশ... ঝপ ঝপ করে স্টীমার চলে গেল একটা। তার চাকা ঢেউ তুলে দিয়ে গেল জলের বুকে। কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে জলের সাথে। একটা হাওয়া উঠল। মিষ্টি হাওয়া। কে যেন ডাকল বেণুকে না? 'বেণুদা'—চমকে পিছনে চাইল বেণু। না কেউ নেই তো। কিন্তু এমন কেন হয়? একা একা এমনি নির্জন জায়গায় দাঁড়ালেই একটু পরে মনে হয় কে যেন 'বেণুদা' বলে ডাকছে।

না। যে ডেকেছিল সে তো নেই। সে তো চলে গ্যাছে। কিন্তু যাবার আগে অমন কাণ্ডটা না করে গেলেই পারত পুঁটি।

বেণু তো তাকে ভুলেই গিয়েছিল। বিয়ে হয়ে গিয়েছিল উঁচাসতে। কচিৎ কদাচিৎ দেখা হোত ও যখন বাপের বাড়ি আসত। কেউ কথা বলত না। দুজনেই চোখ নামিয়ে নিত। তবু বিজয়েন্দ্রী একদিন বলেছিল, 'পুঁটিটা সুখী নয়।'

বেণু কোন আগ্রহ দেখায় নি। কথার পিঠে কথা বলার মত করেই বলেছিল, 'ক্যানো?'

'ও তো বলে সোয়ামী মাতাল। রাত দিন থাকে পাটকলের এক হিন্দুস্থানী মিস্ত্রির সঙ্গে। শ্বশুর শাশুড়ি সবাই গোঁয়ার। পোড়ার মুখে বাঙালী বলে খুব হেনস্তা করে। কথাবার্তা না বুঝলে পারে মারে পর্যন্ত। সেদিন জানাচ্ছিল পিঠটায় কি দিয়ে মেরে ফালা ফালা করে দিয়েছে। খুব কাঁদছিল ছুঁড়িটা।'

গত বছর বিজয়া দশমীর দিন কাণ্ডটা করেছিল পুঁটি। অবশ্য অবস্থার হয়েছে। বেণুর এদিন মনা থাকতে আর জান ভাগ-

ছিল না। ভেবেছিল সবজান্তা ঠাকুরের বিসর্জনের শোভাযাত্রার সঙ্গে সেও বেরোবে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলি দিয়ে খানিকটা এগোতে এমন সময় মাথায় ঘোমটা দিয়ে একটা বউ এসে খুব কাছে তাকে বলল, 'চেনো তো বুঝি বেণুদা?'

বেণু বউটিকে চিনতে পারেনি। এত নিচু স্বরে কথা বলেছিল বউটি যে আওয়াজটাও বুঝতে পারেনি সে। বউটি তখন মাথা হেঁট করে তার পায়ের ধুলো নিতে চেষ্টা করছে। বেণু তার দুটো কাঁধ ধরে বাধা দেবার চেষ্টা করে বলল, 'আরে, পায়ে হাত দিচ্ছো ক্যানো? কে গো তুমি?'

উঠে দাঁড়াল বউটি। মাথার কাপড় সরাল। তেমনি নিচু গলাতেই বলল, 'চিনতে পারলে না বেণুদা, আমি পুঁটি'—

'পুঁটি, তুমি কবে—তুমি আমার পায়ে হাত দিচ্ছো...'

বেণু কথা কটা বলতে পারল না ঠিক গুছিয়ে। কেমন যেন জড়িয়ে গেল।

পুঁটি বলল, 'তাতে দোষ কি, তুমি তো বড়।'

বেণুর বিস্ময় কাটেনি। সে বলল, 'কিন্তু আমি তো জানি তুমিই বয়সে আমার চেয়ে একটু বড়।'

পুঁটি বলল, 'কি জানি। আর হোলেই বা। তাবে তুমি এ্যাখন অনেক বড় বেণুদা। বস্তিতে সবাই তোমায় কত খাতির করে। আর যাবে কাল তুমি এ্যাকটা পাশ দেবে। এ বস্তিতে কটা ছেলে তা পেরেছে?'

বেণু কিছু বলল না।

পুঁটিই আবার বলল, 'তাছাড়া আজার তুমি কত চ্যাঙা হয়েছ এই ক'বছরে। আর তোমাকে নাম ধরে ডাকা যায়।'

বেণু এবার জিজ্ঞাসা করল, 'কবে এলে শ্বশুরবাড়ি থেকে?'

'কদিন দিন।'

'কই আমি তো দেখিনি।'

'আমি রোজ তোমায় দেখি। বাড়ির সামনে দিয়ে রোজ যাও পড়াশোনা করতে। তুমি আজকাল বড্ড মাথা হেঁট করে হাঁটো। আশপাশে কিছুই দেখতে পাওনা।'

পুঁটি বোধহয় একটু হাসল শেষ কথাটায়। অন্ধকারে বেণু দেখতে পেল না। পুঁটি জিজ্ঞাসা করল, 'চললে কোথা এখন?'

'একটু ঠাকুরের সঙ্গে বিসর্জনে যাবো।'

'যাও। আমিও যাই তোমাদের বাড়ি। দিদিকে দিদিদের বিজয়ার নমস্কারটা সেরে আসি।'

বেণু একটু এগোল। আবার তখন পিছন থেকে পুঁটি ডাকছে, 'বেণুদা—'

এবার যেন আরো চাপা গলায়। বেণু ফিরে দাঁড়াল। পুঁটি লঘু পায়ে তার খুব কাছে এল। বলল, 'তুমি দেখতেও খুব সুন্দর হয়েছ।' বলে দুহাতে বেণুর দুগাল ধরে একটুখানি স্থির হয়ে রইল। বেণুর নিঃশ্বাস দ্রুত পড়ছে। শরীর কাঁপছে। সে অনুভব করল পুঁটি তার গাল দুটোয় ধীরে ধীরে হাত বুলোচ্ছে। মেয়েটা তার বেণুর শরীরের কাছে। অতি কাছে। তার বুকের আর স্পর্শ লেগেছে বেণুর শরীরে। কি করবে পুঁটি? কি বলবে সে বেণুকে এত ঘন হয়ে এই অন্ধকারে।

কিছুই বললো না পুঁটি। কিছু করলো না সে। বেণুর গাল থেকে হাতদুটো সরে গেল। অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল পুঁটি।

বেণু বিসর্জন সেরে বাড়ি ফিরল যখন রাত বারোটা বেজে গিয়েছিল। কালীতলায় তখন এক বেদম পুঁটিদের বাড়ির সামনে ছোট একটা জটলা। পুঁটির বাপের কান্নার আওয়াজ আসছিল ভিতর থেকে।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল বাউল বলা বাবাজী। তাকে বেণু জিজ্ঞেস করল, 'বলাবাবা কি হোয়েছে?'

বলা বাবাজী তাঁহার বুঁজে চোখ দুটো বুজে নিয়ে বলল, 'মেয়েটা শেষ অবধি গলায় দড়ি দিল বাবা—আহাহা!'

'কে? কোন মেয়েটা বলাবাবা?'

'আর কে? হতভাগি পুঁটিটা গো। বিয়ে হয়ে ইস্তক একটু তো সুখ পায়নি, খালি মারধোর লাঞ্ছনা—'

বেণু এখনো যখন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে একা একা কোন নির্জন জায়গায়, মনে হয় পিছন থেকে কে যেন তাকে ডাকছে 'বেণুদা'। বড় চাপা সে স্বর। যেন শোনাই যায় না।

আটাশ

আগের রাতে মোটে ঘুম হয় নি। অত উদ্বেগে হয় কি ঘুম? রাত চারটে নাগাদ চারটের বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল বেণু। দিদাবুড়ী বলল, 'এ্যাতো সকাল সকাল উঠে পড়লি ক্যানো রে'?

বেণু বলল, 'তুমি বুঝি ঘুমোও নি না?'

দিদাবুড়ী বলল, 'না তেমন ঘুম হোলো না। বড্ড গরমটি গরম। তাছাড়া সেকআইয়ের ওই বকটা এলো। সব মিলিয়ে—'

কাল বিকেলে ভুবনেশ্বরীর একটা চিঠি এসেছে। ভুবনেশ্বরী লিখেছে শান্তিনাথ থেকে, 'মা তোমার জামাই কয়েকদিন হইল আর উঠিয়া বসিতে পর্যন্ত পারে না। কোমর শক্ত হইয়া গিয়াছে। খালি বেণুকে খবর দাও বেণুকে খবর দাও বলিতেছে। বেণুর পাশের খবর বাহির হইলেই সে যেন যত শীঘ্র হয় এখানে চলিয়া আসে। তিনটি শিশু ও একটি রোগি লইয়া আমি চোখে অন্ধকার দেখিতেছি কি করিব বুঝিতে পারিতেছি না।'

দেবু বাড়ি ফিরে চিঠিটা চাবের পাশে লুকিয়েছে রাখে। ভুবনেশ্বরী চলে গেছে। মাস চারেক রোগ হাসপাতালে থেকে ছাড়া পেয়েছে গোবিন্দ। রোগ তার সারে নি। বরং বেড়েছে। তোর জন্যই সে চলে গেছে বাবানাথ। নইলে বাড়ি যা তোর জন্যেই সব নষ্ট হতে বসেছিল। ভুবনেশ্বরীই এখন তার সার্থ। কি করে যে টিকটে গিয়ে আর পঞ্চাশটা কবীর দেখা করে পথা বাঁধে যা তোর আর মাথে এক-মাত্র উপায় ছাড়া কেউ বলতে পারে না।

দুধ হাত ধুয়ে পাঁচটার মধ্যেই দেবু বেরিয়ে পড়ল সিমেন্ট হলের উদ্দেশ্যে। আকাশের মুখ আরো গোমড়া। এখুনি বৃষ্টি নামতে পারে।

সিমেন্ট হলের বারান্দায় দেওয়ালে পঞ্চাশ-কার দল টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছটার মধ্যেই পাশাপাশি ভিড়। দেবু একটু চেষ্টা করলে ভিড় ঢুকে হাত রেখে আসতে পারত কলটা। কিন্তু সাহস হচ্ছিল না। ওদিকে ভিড় বেড়েই যাচ্ছিল। এমন সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল পঞ্চানন। প্রাণের সবচেয়ে বেটা ফাজিল ছেলে। দেবুকে দেখে দুইহাতে জড়িয়ে ধরে বলল, 'দেবু বেরিয়ে গেছি রে, বেরিয়ে গেছি।'

দেবু জিজ্ঞাসা করল, 'কোন ডিভিশন?'

পঞ্চা তাকে ছেড়ে দিয়ে ডান হাতের দুটো আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, 'সেকেন্ড। তুই?'

'আমি এখনো ঢুকতে পারি নি। যা ভিড়।'

পঞ্চা তার মাথার হাত একটা চাঁটি মেরে বলল, 'স্যাক্রিফিস। দাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস—আয়।'

তবে ধরে টানল পঞ্চা।

দেবু বলল, 'আমি যাবো না পঞ্চা।'

'সে কি! ক্যানো?'

'আমি নিশ্চয় ফেল করিছি।'

'কে বললে? দেখিছিস তুই?'

'না—'

'তবে? কেন জানি ভাবো! আমার মনে হচ্ছে তোর নামটা দেখিছি। নামের পাশে যে চাঁড়া দেখিনি। তুই নিশ্চয় পাশ করিছিস। তবু আর দেখে আসি।'

'আমি যাবো না পঞ্চা তুই দেখে আয়।'

'স্যাক্রিফিস। বস্ তোর নম্বরটা। তুই এখানে দাঁড়া।'

দেবু পঞ্চাকে রোল নম্বর বলল। বুকটা ভীষণ ধড়ফড় করছে। উঃ কি উৎকণ্ঠিত অপেক্ষা! সময় যেন আর কাটে না। মা কালীকে ডাকে। বাবা তারকেশ্বর গণারেশর মনে মনে স্মরণকে ডাকে। পাশটা যেন হয়! তোমরা দেখো।'

পঞ্চা ফিরে এসে মাথায় চাঁটি মেরে আবার, 'নাইরে যে পাশ।'

'হ্যাঁ…ক্যানো?'

'পাশ করেছ আর ক্যানো।'

পাশ করেছে সে? পাশ করেছে দেবব্রত পাল? নবির সেই দেবব্রত পাল? সে আর ম্যাট্রিকুলেট? একটা পাশ করা বিদ্যান ছেলে? এ সবই রোগ জল্ না কালী মদন-মোহন গণারেশর আর এক ঠাকুরের দয়ায়।

তবু ভয় কাটে না। পঞ্চাকে জিজ্ঞাসা করল, 'হারে পঞ্চা, ঠিক বলছিস তো ভাই? এপ্রিল ফুল করছিস না তো?'

'এপ্রিল ফুল খুব আছে? আর এ ব্যাপার নিয়ে কেউ তা করে? বিশ্বাস না হয় দেখে আয় নিজে গিয়ে। ওই দিক থেকে থার্ড বোর্ডে তোর নাম। তবে খুব বেঁচে গেছিস আর একটু হোলেই হড়কে-ছিলে বাবা বনচন্দ্র।'

'ক্যানো?'

'তোমার নামের ওপরে ভিমটে, তলায় দুটো নামের পাশে চাঁড়া। মাঝখানে তুমি মানিকের মত জ্বলজ্বল করছো।'

'কোন ডিভিশন রে?'

'থার্ড'

'থার্ড?'

'থার্ড তো ডিভিশন। তিন দাঁড়ি বাবা বনচন্দ্র'।

দেবুর যে আনন্দটুকু হয়েছিল সেটা একটু কমে গেল। মনটা বিষণ্ণ লাগছে।

'যা যা, দেখে আর না নিয়ে চোখে,' পঞ্চা ঠেলেঠুলে ঢুকিয়ে দিল ভিড়ের মধ্যে।

দেখে যখন সে ফিরে এল দেখল বন্ধুরা বেশ কয়েকজন জড় হয়েছে। প্রদ্যুৎ, সাতীশ, মণীন্দ্র, চিন্তাজীব। প্রদ্যুৎ পেয়েছে ফার্স্ট ডিভিশনে। মণীন্দ্রও তাই। সাতীশ চিন্তাজীব পেয়েছে ডিভিশন। স্কুলে ভর্তি হওয়ার দিন থেকে দেবু নিজেকে সহপাঠী-দের থেকে অনেক দূর বিষয়ে হীন ভেবে এসেছে। বাবো লোকের বংশ মর্যাদায় অর্থে। আজ লেখাপড়ায় প্রমাণ হয়ে গেল সে বিদ্যাতেও হীন। দেবু পাশ কাটিয়ে চলে আসতে চাইল বন্ধুদের দল ছেড়ে।

নজরে পড়ে গেল প্রদ্যুতের। সে দেবুর হাতটা চেপে ধরে বলল, 'এ্যাই চললি কোথায়?'

'বাড়ি যাইরে প্রদ্যুৎ। মা অপেক্ষা করছে।'

'যাবি যাবি, এ্যাদ্দিন পরে পাশ-টাশ করলো সবাই। এমন একটা দিন সেলিব্রেট করতে হবে না?'

সাতীশ বললে, 'খরচাটা কার ভাই?'

প্রদ্যুৎ বলল, 'খরচা মিস্টার প্রদ্যুৎ ভট্টাচারিয়ার'।

দেবু বাদে আর সবাই চিৎকার করে

উঠল, 'কি চিন্তা কর নিউটন প্রত্যয় ভটচাজ্জি'।

শরৎ মেসে সোমনাথ গিরি একটা কোণে মেয়ো বেড়িয়ে এসে বসল সবাই। রেণু দাঁড়িয়েই রইল। যতীন পকেট থেকে গোল্ডফ্লেক সিগারেটের প্যাকেট বার করে বেশ ভাব করে বলল, 'কাম অন, লেট আস এক হ্যাট উই আর এ্যাকাউন্ট।'

পকা প্রথমেই সিগারেট নিয়ে ধরাল। প্রত্যয় চিন্তিত ছিল। নিলনা যতীন আর রেণু।

পকা রেণুকে বলল, 'কি বাবা বন্দোরা, এ্যাকটা সিগারেট খেলে কি মা বকাবকি রাগ করবেন?'

সবাই হেসে উঠল। পকা আবার বলল 'যে যে বল।'

রেণু মাথা নাড়ল।

প্রত্যয় পকাকে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে পকা, কোন কলেজে যাচ্ছিস?'

পকা বলল, 'বড়ার বিভাগের মান তাই ওই বাড়িতে তো ঢুকতে দেবে না।' বলে হাত বাড়িয়ে রাস্তার ওপারে প্রেসিডেন্সী কলেজের বাড়িটা দেখাল। তারপর বলল, 'স্কটিশে চেষ্টা দেখব।'

যতীন বলল,' ওখানে তোর পড়া হবে পকা?'

পকা হাতের সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'কোন শালা পড়তে চায়। বই পড়া বড় যে সব পড়ার শেষ পড়া যোগ হবে পড়া। আমি ওখানে ঢুকে সেই পড়াই চেষ্টা করবো।'

আবার সবাই হো হো করে উঠল। অবশ্যই রেণু ছাড়া। রেণু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

যতীন বলল, 'আমার কেউ তো স্কটিশে নাই। বাবা কাকা জ্যাঠা দাদারা সবাই ওই কলেজেই ছিল। ওটা আমাদের ফ্যামিলি কলেজ।'

প্রত্যয় যাবে প্রেসিডেন্সী, চিরঞ্জীব যাবে বিদ্যাসাগর আর যতীনের কলেজ এখনো ঠিক হয় নি। তারা যেখানে ভর্তি হবে সেখানেই পড়তে হবে তাকে।

রেণু এসব আলোচনায় যোগ দিতে পারছিল না। সে আগাগোড়া চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। চলে যেতেও পারছে না। প্রত্যয় এখনো জোর করে তার হাতটা ধরে আছে। এসব আলোচনা সে শুনছে আর বুকের মধ্যে একটা শূন্যতা বোধ করছে।

যতীন বলল, 'রেণু তুই অমন মড়া-খেকো হয়ে আছিস কেনো?'

প্রত্যয় বলল, 'ব্যাচারি থার্ড ডিভিশনে গিয়েছে। তাই মনটা খারাপ হয়ে গ্যাছে।'

পকা বলল, 'তাতে কি হয়েছে? বিদ্যাসাগরে ঢুকে পড়। ইউনিভার্সিটিতে ভালো করে রেজাল্ট কর, চলে আর বাড় উপরে উঠলে। সবাই মিলে মজা অনেক করা যাবে আবার।'

রেণু বলল, 'আমি এবার যাই প্রত্যয়। বাড়িতে মা খুব ভাববে।'

প্রত্যয় হাত ছেড়ে দিল। রেণু এগোল বাড়ির দিকে।

আকাশটা ঘোর অন্ধকার হয়ে এসেছে। কোনো হাওয়া বইছে। বৃষ্টি এল বলে। রেণুর কোনদিকে খেয়াল নেই। আশে পাশে রাস্তা পার হোল। ফুটপাথ দিয়ে ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না। চোখ দুটো জলে ভরা। না। প্রেসিডেন্সি নয়, স্কটিশ নয়, বিদ্যাসাগরও নয়। কোনো কলেজেই সে ভর্তি হোতে পারবে না। এ চিন্তা তার কাছে স্বপ্ন বিলাস। ম্যাট্রিক পাশ করেছে রেণু। এই যথেষ্ট। আর বেশি বাড়িতে উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে তার চিরদুঃখিনী মা। বাবার মৃত্যুর পর থেকে তার পর অভিনব, অসহায় দুঃখভাগিনী দেখছিলি।

রেণু যে গোবিন্দকে কথা দিয়েছে। গোবিন্দ তার বাবা হাতটা দু'হাতে ধরে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি দেখবে তো, দেখবে তো ভাই তোমার মেজদিদির বাচ্চাগুলোকে? বল রেণু, কথা দাও।'

সদ্য লোকটার চোখে মুখে কি ব্যাকুল উৎকণ্ঠা!

রেণু আশ্বাস দিয়ে শান্ত করেছিল তাকে। বলেছিল, 'দেখবো দাদাবাবু, নিশ্চয় দেখবো। আমি দুটো খেতে পেলে ওরাও পাবে।'

একটা কিশোরের মুখে ও বড়ই অকল্পনীয় কথা। কিন্তু রেণুর দিকেই লক্ষ্য আছে যে তার বয়স কোটে পনের পার হোল, না তিন পনেরো পেরিয়েছিল? তার নিজের জানা আছে এমন অনেক কিছু দেখলে মা এ বয়সে তার দেবার কথা নয়। দারিদ্র্য তাকে দান করেছে পাকা মাথার অভিজ্ঞতা! চাকরি চাইই তার। অন্তত ছেলে পড়ানো দেখেই। এই মুহূর্তে থেকে।

প্রেসিডেন্সী কলেজের গেটের কাছে এসে পা দুটো আটকে গেল রেণুর। অন্তর ভরে চোখ তুলে চাইল। দলে দলে ছেলেরা আসছে ঢুকছে ওই বিশাল সুন্দর বাড়িটার মধ্যে! চোখে তাদের স্বপ্ন। মনে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

সেই মুহূর্তে বৃষ্টি নামল বড় বড় ফোঁটায়। তীব্র তীক্ষ্ণ বাতাস। আকাশের সঙ্গে রেণুও তার চোখের জল ধরে রাখতে পারল না। অবিরাম ধারায় জল নেমে এল তার দু'গাল বেয়ে। বৃষ্টির জল রেণুর চোখের জল এক হয়ে মিশে গিয়ে ভিজিয়ে দিল তার চলার পথ!

কর্দমাক্ত এ পিছল পথে রেণু কতক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে কে জানে!

প্রসঙ্গ: হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

রনজিৎকুমার সেন

কোনো কোনো মানুষের জীবনকীর্তি সম্পর্কে এক-একটি বিশেষণ আরোপিত হয়ে যায়। এমন একটি বিশেষণ 'জীবন্ত অভিধান'। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে এই বিশেষণে বিশেষিত করেছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। সাংবাদিক হিসেবে এটা ছিল তাঁর অন্যতম পুরস্কারও বটে। রাজনীতিবিদ এবং সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয়। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করতো না, এমন লোক বিরল। সেই ব্যক্তিত্ব আরও বেশী প্রগাঢ় হয়েছিল তাঁর স্বভাব-গাম্ভীর্যে। তার সঙ্গে যোগফল হয়ে মিশে থেকেছিল তাঁর সংস্কৃত সাধুভাষা—যা প্রকারান্তরে ছিল বঙ্কিম অনুসারী।

আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি, তখন তিনি দৈনিক 'বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদক — দাড়ি ও গোঁফে মিলিয়ে অনেকটা ঋষি-কবির মতো চেহারা। সেকালে দৈনিক ও মাসিক বসুমতীর আসর ছিল ঘরে ঘরে। মাসিক বসুমতীর সম্পাদক তখন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—যিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী। সেটা ১৯৩৬ সাল। আমার সাহিত্যজীবনের প্রথম কাল। বসুমতী পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগের ইচ্ছায় একটি প্রবন্ধ পকেটে নিয়ে গিয়ে হাজির হলাম বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে। বড়ো মজা। দোতলায় উঠে সম্পাদকের ঘরে প্রবেশ করেই হঠাৎ নিজের মধ্যে কেমন যেন জড়তা এসে গেলো। তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, তিনি বিরাট টেবিলে লেখায় মগ্ন। সেই পক্ককেশ ঋষির মতো হেমেন্দ্রপ্রসাদ। আমার মুখের দিকে তাকাতেই দু'হাত তুলে নমস্কার জানালাম। আমাকে বসতে বললেন, কিন্তু তার পরিবর্তে হঠাৎ প্রশ্ন: 'কি চাই?' বললাম: 'বসুমতীতে প্রকাশের জন্যে একটি লেখা দিতে চাই।' শুনে আমার মুখের দিকে একবার স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি; আমার বয়স বছর কুড়ি তখন আমার সারা মুখে ফুটে আছে: গুরুগম্ভীর কণ্ঠে, জিজ্ঞেস করলেন: 'কি লেখ তুমি?' বললাম: 'গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, ছড়া, উপন্যাস সবই লিখি।'—অতীব সাহস আমার বলতে হবে। আর একবার সেই গুরুগম্ভীর কণ্ঠের প্রশ্ন: 'বটে! তা—লেখাপড়া কদ্দুর করেছ?' বললাম: 'কলেজ থেকে বেরিয়েছি।' এবারে চোখ নামিয়ে বললেন: 'গল্প-প্রবন্ধের ব্যাপারটা এখানে নয়, ওপাশে মাসিকের ঘরে যেতে হবে।' আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম: 'আচ্ছা চলি তাহলে, নমস্কার।' ব'লে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। কিন্তু মাসিকের দরজা তখন বন্ধ হয়ে গেছে। অগত্যা ফিরে এলাম। আমি তখন বসুমতীর পাড়াতেই। কিন্তু লেখা সম্পর্কে আর কখনো যেতে মন সরলো না। কেমন যেন একটা বাধা অনুভব করলাম।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন পরিচয় হলো রামচন্দ্রের সঙ্গে। আমার প্রায় সমবয়সী। বসুমতীর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র। সে তখন 'বৈশাখী' নামে একটি মাসিক কিশোর পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ করছে। লেখার তাগিদ এলো তার তরফ থেকেই। সেই সূত্রে পুনরায় বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে ঢুকতে গিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ ঘটলো। আসতে যেতে দু'একবার চোখে পড়তো লেখায় হেমেন্দ্রপ্রসাদের। কিন্তু বয়সোচিত কুণ্ঠায় প্রতিবারেই দূরে সংযত করে তাঁর পাশ কাটিয়ে গেছি। একভাবে বেশ কিছুকাল কাটবার পর অকস্মাৎ একদিন রামচন্দ্রের দেহান্ত ঘটলো। তার পূর্বেই পিতা সতীশচন্দ্র ঘরে পুত্রবধূ এনেছিলেন এবং রামচন্দ্র একটি কন্যাসন্তানের জনক হয়েছিল। সব গড়ে ওঠা সৌধটা অকস্মাৎ এভাবে বিধ্বস্ত হবে, ভাবতে পারিনি। মনটা তাই সহজেই বিষণ্ণ হলো। সেই বিষণ্ণ মন নিয়েই সেদিন বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে বেরিয়ে এলাম।

এরপর সারা দেশের উপর দিয়ে এসে গেল কত ঘটনা ও কত ইতিহাসই না গড়িয়ে গেল! ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে নিজেকে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত করার অবকাশ পেয়েছি এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে পরিচয়ের গণ্ডী অনেকখানি সম্প্রসারিত ক'রে নিতে পেরেছি। এমন কোনো কোনো অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে হেমেন্দ্রপ্রসাদের আলঙ্কারিক ভাষণ শুনে মুগ্ধ হতাম। তাঁর ভাষায় জড়তা না থাকলেও বাকচাতুর্যের তুলনা ছিল না। সেখানে যথার্থই তিনি ছিলেন 'জীবন্ত অভিধান'।

তাঁর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসি এ ঘটনার প্রায় বছর ছয়েক বাদে। ততদিনে আমার দু'চারখানি গল্প ও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) সম্পাদিত মাসিক 'রূপ ও রীতি'র কার্যাধ্যক্ষের কার্যভার ত্যাগ ক'রে ১৯৪৩ সালে আমি মাসিক 'বনশ্রী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করি। 'বনশ্রী'র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 'বসুমতী'র কর্তৃপক্ষের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। তাঁদের আগ্রহেই বনশ্রীর তরফে আমাকে এবারে বসুমতীর সতীশচন্দ্র ও হেমেন্দ্রপ্রসাদের রচনা সংগ্রহে অগ্রসর হ'তে হলো। এবারে আর আমার নিজের রচনা প্রকাশের

আরও নয়, আমরাই। এখানে সুকুমার ও মহেন্দ্র। শচীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা ব'লে অভিভূত হলাম। শান্ত চেহারা, ভাবুক চোখের দৃষ্টি, ভক্তিমার্গের মানুষ, অথচ কী বিরাট প্রতিষ্ঠানের অধিকারী এবং পরিচালক ও সম্পাদক। হেমেন্দ্রপ্রসাদকে মনে হ'তো ঠিক তার বিপরীতটাই। প্রথম আবেদনে দু'জনের কাছ থেকেই আন্তরিক সাড়া পেলাম এবং চট্টগ্রাম পেয়ে লেখার অনেকদিনের বাসনাকে। হামচক্রের কথা বলায় অভিভূত হলেন শচীনচন্দ্র। দু'বার দু'টি রচনা দিয়ে তিনি আমাকে ধন্য করলেন এবং খুশী হলেন বসুমতী হাতে পেয়ে। কবে যে আমি ঘটনাচক্রে সেই প্রথম হেমেন্দ্রপ্রসাদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম, সে কথা ভুলিয়ে তিনি নিশ্চুপ রয়েছেন। তাঁর কয়েকটি রচনা বসুমতীতে প্রকাশের পর তাঁকে আমার একটি গ্রন্থ উপহার দিয়ে তাঁর অভিমত জানতে চাইলাম। সেই অভিমতটি ছোট আকারে তিনি দৈনিক বসুমতীতেই প্রকাশ করেছিলেন। বলা বাহুল্য—প্রশংসাই করেছিলেন। সুযোগ পেয়ে একসময় তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের প্রথম দিনের স্মৃতিটি তুলে ধরে বললাম: 'সেদিন আমার খুব সঙ্কোচ হচ্ছিল আপনার সঙ্গে মুখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে।'

হেমেন্দ্রপ্রসাদ এবারে তাঁর স্বভাব গম্ভীর মুখে ঈষৎ হাসির রেখা টেনে বললেন: 'আসলে ঐসব কাটিংএ সাহিত্য-সাংবাদিক ক্ষেত্রে এগোতে দেখলে তার বয়স ও শিক্ষা সম্পর্কে আমার বিশেষ ভাবনায় কৌতূহল হয়। তবু forget the past করাই ভালো।'

—'তাই ভালো।' হেসে বললাম: 'আপনি তো আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিশেষ প্রিয়পাত্র। ভারতবর্ষ-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছি। তাঁকেও আপনি অত্যন্ত স্নেহ করেন।'

হেমেন্দ্রপ্রসাদ বললেন: 'ফণী আমার যেমন স্নেহের পাত্র, আমি ঠিক তেমনি আচার্যের। ফণী আমার সঙ্গে দীর্ঘকাল বসুমতীতে চাকরী করে গেছে।'

বললাম: 'আপনার ব্যক্তিগত লেখাগুলো লাইব্রেরী দেখতে একদিন আপনার বাড়িতে যেতে চাই। সময় হবে তো আপনার?'

খুশী হয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদ বললেন: 'এখন থেকে লেখার জন্যে তুমি আমার গোয়াবাগানের বাড়িতেই এসো। সকালে আমি নিয়মিত বসেই থাকি। সকাল বেলা আমার লাইব্রেরীতে তুমি যেকোনোও পেতে পারো।'

সুযোগ সন্ধান পেতে মনোমত বা হয়, এবারে আমার মনের আকাঙ্ক্ষা মেটাবার হলো। তাঁর যেকোনো লাইব্রেরীর আকর্ষণেই মাঝে মাঝে সকালের দিকে হেমেন্দ্রপ্রসাদের ১২/১০ গোয়াবাগান স্ট্রীটের বাড়ি যাওয়া শুরু করলাম। শুধু যে তাঁহার হাজার টাকার মূল্যের সম্পদ গ্রন্থ সংগ্রহই করেছিলেন তিনি, এমন নয়, সেই সঙ্গে বিভিন্ন কালের প্রয়োজনীয় অনেক সংবাদ পেপার-কাটিংয়ের খাতাও তৈরী করেছিলেন। প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ; বিশেষতঃ এক শতাব্দীর আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সাল তারিখ সহ তাঁর নখদর্পণে ছিল। কোনো ব্যক্তি যেকোনো প্রশ্নে তাঁর কাছে এলে তিনি মুখে মুখেই তা বলে দিতে পারতেন। এমন অসাধারণ স্মৃতিধর ব্যক্তি এদেশে দুর্লভ ছিল। তাঁর এই বিপুল গ্রন্থাগার দেখতে দেখতে একদিন অনেক সম্পর্কে বাঙালীদের বিভিন্ন উক্তির উপর আলোচনা প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রপ্রসাদ বললেন: 'বাঙালীরা তাঁর ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখিয়েছেন যে, বাংলার সেক্রেটারি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের দুর্নামটা বহু বছর ধরে টীকা তৈরী করে অবাধে বিদেশের প্রচারকার্য করে থাকে। এক ইংরেজীতেই আছে বাঙালীর দুর্নাম আছে, সারা বাংলায় তাদের সংখ্যা পঁচিশ হাজার হবে। দেশের অধিবাসী উর্দুভাষী বেশু সংখ্যক, ইংরেজ ও চার দশকের মধ্যে একটি কথা প্রবাদের মতো হয়ে গেছে যে—বাংলার প্রদেশের শত শত সুখ, কিন্তু বাংলা দেশে কোনোখানে একটি বাঙাল নেই।'

বললাম: 'কথাটা অসাধারণ। বাংলার প্রাদেশিকতারই এর মূল কারণ; আজও তার অবসান ঘটেনি।'

এরপর থেকে হেমেন্দ্রপ্রসাদ বললেন: 'বসুমতীর সম্পাদকীয় স্তম্ভে ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে আমি কিছু কথা বলেছি। এবারে বঙ্কিমের জন্ম সালেই বসুমতীতে বসুমতী বাংলাই একটি দুর্লভ গ্রন্থ দিবি, কি বলো?'

বললাম: 'এ গ্রন্থ বসুমতীর পক্ষে বিশেষ গৌরব হবে। আমারই সংবাদেই ছাপতে পারছি তো?'

হেমেন্দ্রপ্রসাদ বললেন: 'এবদম'ই করবে তো।'

শারদীয় সংখ্যায় থেকেই চটকাটি ভাবে লেখায় আরম্ভ শতাব্দী থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সাংবাদিক ইতিহাস ও পরিসংখ্যান সহ অসাধারণ রচনা। একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে বাংলার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরবার এই অদ্ভুত ক্ষমতা হেমেন্দ্রপ্রসাদের পক্ষেই সম্ভব ছিল। বসুমতীর উপর্যুপরি দুই সংখ্যায় প্রথম রচনা হিসেবে আমি প্রবন্ধটি প্রকাশ করি। এ রচনার জন্যে বসুমতীর মর্যাদা সেদিন অসাধারণ বেড়ে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে বসুমতীর স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যু আমাদের সকলকেই বিশেষভাবে অভিভূত করে। শচীনচন্দ্রের পিতা উপেন্দ্রনাথের প্রতি যারপর নাই সহৃদয়-

দেবের আশীর্বাদ ছিল। শচীন্দ্রচন্দ্র রায়ও প্রতিষ্ঠানের একজন ভক্ত ছিলেন। শরৎচন্দ্রের সাথে তাঁর হৃদ্যতা ছিল অসাধারণ। হেমেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে একান্তে বসে আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন বললাম: 'স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে তো আপনার গভীর শ্রদ্ধা, কিছু বলুন না তাঁর সম্পর্কে!'

হেমেন্দ্রপ্রসাদ বললেন, 'আমি দিয়েছি তাঁকে নিয়ে; এমন জীবনে তাঁকে দর্শন করবার সুযোগ পেয়েছি। যদি বিবেকানন্দের আবির্ভাব না হতো, তবে আজ ভারতের কি অবস্থা হতো, তা বলা যায় না। সেদিন জন্ম-ব্যাধি-মৃত্যু প্রত্যক্ষ ক'রে গৌতম বুদ্ধ রাজা হয়েও সব প্রলোভন ত্যাগ ক'রে মুক্তির সন্ধানে ভারতের পথ গ্রহণ করেছিলেন মানবের কল্যাণের জন্যে, সেদিন ভারতের ও পৃথিবীর পক্ষে এক সুদিন। আর সেদিন স্বামী বিবেকানন্দ কন্যাকুমারীতে ভারতের শেষ সীমায় প্রস্তরের উপর বসে ধ্যানস্থ হয়ে যা ভেবেছিলেন, সেই এক সুদিন। তিনি ভেবেছিলেন—নিজেদের স্বাধীনতা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ঐক্য, আমি ভারতবাসী—এই বোধ, ভারতের কল্যাণ এবং সেই সঙ্গে ভারতবাসীর শৌর্য্য ও মানুষের-মুক্তি ও মঙ্গল সাধন। তিনি জাতীয়তাবোধ—দেশাত্মবোধকে ভারতের আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করে সমগ্র শক্তিযুক্ত করতেই চেয়েছিলেন।'

বললাম: 'আমাদের জাতীয় জীবনে বিবেকানন্দের কোনো প্রভাব নেই, এইটেই আমাদের দুঃখ সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।'

হেমেন্দ্রপ্রসাদ বললেন: 'সবেই ঘোর, আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি!'

এমনই সেদিন তাঁর লেখা আনতে গেলাম, গিয়ে জানলাম—তিনি হাসপাতালে গেছেন রাধাপদ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে। হরেকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর সহপাঠী বন্ধু। অপেক্ষা করলাম কিছুক্ষণ। খানিকটা বাদে বিকেল সাড়ে ছয়ে এলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ। বললেন: 'তুমি এসে আছো, কী আশ্চর্য! হাসপাতাল থেকে হরেন ফোন করেছিল, তাই গিয়েছিলাম। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সাত সকালে সাবধানে তাঁর স্ত্রী বললেন বললে—ওখানে গিয়ে ওর হচ্ছে নির্বাসন। জিজি-গ্রামপুর গোবের বাড়িতে থাকতে পাড়া-প্রতিবেশীদের দিয়ে বেশ কেটে যেতো। হাসপাতাল ওর কাছে যেন বন্দীশালা। হরেনও সেখানে অনেকটা দুরবস্থায় পড়েছে।'

বললাম: 'এ তো খুবই স্বাভাবিক। সাহিত্য সাধুচরিত্র মানুষ, হাসপাতালের কাজ কি ওঁকে মানায়? অথচ ওঁর মতো চরিত্রের মানুষকেই দেশের আজ বেশি দরকার।'

হেমেন্দ্রপ্রসাদ বললেন: 'এদের হাতেই কি শেষ আছে! জীবনে নিজেদের জন্য কিছুই রাখেনি; সব বিলিয়েছে, জিনিস আর কিছুই বিদায়কালে দিয়ে গেছে। এ এক অদ্ভুত চরিত্র।'

আলোচনার শেষে প্রণাম করে হেমেন্দ্রপ্রসাদের লেখার কপি নিয়ে উঠে এলাম।

এর পরের ঘটনা ১৩৪৮ সাল। মধ্য-কলকাতার মার্বেল প্যালেসে ২৪শে জুলাই আমার গুরু দিনবন্ধু রে ক'রে চেকোস্লোভাকিয়ার ভারততত্ত্ববিদ্ ডক্টর হ্রাস অ্যাক্সিডেন্টে কলকাতায় সর্বপ্রথম সংবর্ধনা জানানো হলো আমারই প্রতিষ্ঠিত মহাজাতি পরিষদ থেকে। কলকাতায় সেই তাঁর প্রথম জন-পরিচিতি। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের জন্যে আমি আমন্ত্রণ জানালাম হেমেন্দ্রপ্রসাদকে। সভার সাথে দ্বিতীয় সভাপতি হিসেবে ছিলেন শ্রীমতী বিভাবতী মুখোপাধ্যায়। বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের সম্মানীয় ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে হেমেন্দ্রপ্রসাদ উদ্বোধন ক'রে বললেন: 'আমি আজ-কি-কজের পরিচয়ে দিতে নই। আমার স্ত্রীকে রবীন্দ্রনাথ স্নেহ করতেন এবং তিনি মনে রাখতেন। তাঁর মাতুলীকারা সবেই তিনি বাল্যি লেই থেকেই আগে।'

কথাটা সেদিন আমরা সকলেই বিশেষ উপভোগ করেছিলাম। এটা ছিল সেদিন সকলের কাছেই একটা নতুন আবিষ্কার। এখন এই নতুন কথা পড়িয়েন ক'রে তিনি একের স্বাদের ভাবের সূত্রে তুলে ধরেছেন।

১৮৭৬ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর যশোহরের চৌগাছা গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর অগ্রজ দেবেন্দ্রপ্রসাদকে দু'বছরের এবং তাঁকে এক বছরের রেখে পিতা গিরীন্দ্রপ্রসাদ পরলোকগমন করেন। একমাত্র আশ্রয় তখন মাতা মনোমোহিনী দেবী। তাঁর শিক্ষা প্রথমে কৃষ্ণনগরে, পরে কলকাতায়। ১৮৯৯ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি এ পাশ করে এম-এ এবং ল'তে ভর্তি হন। এন্ট্রান্স পাশের পরেই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উচ্ছ্বাস' প্রকাশিত হয় এবং কলেজ জীবনে 'বিশাখা' প্রভৃতি কয়েকটি উপন্যাস আত্মপ্রকাশ করে। এ সময়ে সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রে হেমেন্দ্রপ্রসাদের বহু গদ্য, প্রবন্ধ, সমালোচনা ও কবিতা প্রকাশিত হয়। এরপর নিজে তিনি 'আর্যাবর্ত' নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। চার বছর নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে 'আর্যাবর্ত' বন্ধ হয়। 'সাপ্তাহিক বসুমতী', 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর রচনার তখন খুব আদর। স্বদেশী আন্দোলনের আগে থেকেই তিনি 'প্রতিবাসী', 'সন্ধ্যা' ও তৎকালীন 'প্রভাত' পত্রিকার সঙ্গে লেখক হিসেবে যুক্ত ছিলেন।

সাংবাদিক জীবনের সঙ্গে তিনি সাহিত্যিক ক্ষেত্রেও বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের অধীনে রাজনীতি ও সাংবাদিকতায় কাজ করার ফলে সারাজীবন তিনি তাঁকে গুরুর মত সম্মান করতেন। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি বিশেষভাবে যুক্ত থেকে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগদান করেন। শ্রীঅরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পালের আহ্বানে তিনি সে সময়ে বন্দেমাতরম পত্রিকার দায়িত্ব নিজের হাতে নেন। পরে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ১৯১৫ সাল পর্যন্ত 'সাপ্তাহিক বসুমতী' ও 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদনার কাজ গ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালে সাংবাদিক প্রতিনিধিরূপে তিনি মেসোপটেমিয়ায় যান এবং ১৯১৮ সালে ভারতীয় সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে ইউরোপে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার সংবাদপত্র সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করে আনেন। তিনি লণ্ডনের ইন্সটিটিউট অব জার্নালিস্টসেরও সদস্য ছিলেন। মাঝখানে কিছুদিন তাঁকে 'এ্যাডভান্স' ও 'মাতৃভূমি' পত্রিকাও সম্পাদনা করতে হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের মনোনীত সদস্য এবং কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হিসেবেও তাঁর দক্ষতা কম ছিল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র অধ্যাপক ও সাময়িক অধ্যাপক পদেও তিনি কাজ করেন এবং পরবর্তীকালে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাংবাদিকতা বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত থাকেন। মৃত্যুর পূর্বে বসুমতীর স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র তাঁর প্রতিষ্ঠান পরিচালনের জন্যে যে চারজন এক্‌জিকিউটার মনোনীত করে যান, তার অন্যতম ছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ। এছাড়াও বহু জনহিতকর ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে তিনি যুক্ত ছিলেন, তার হিসেব নেই। বিভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। সাংবাদিক ক্ষেত্রে তাঁর কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই। ১৯৬১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী এই মহাজীবনের অবসান ঘটে।

জাতীয় বিপর্যয়ে সবাই এগিয়ে আসুন

ত্রিপুরায় এক চরম বিপর্যয় ঘটে গেছে। উপজাতি ও অ-উপজাতির মধ্যে গৌরবময় ঐতিহ্যপূর্ণ ঐক্য আজ ক্ষতবিক্ষত। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অবাধ সংঘর্ষের ফলে শত শত মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। অগ্নিসংযোগ ও লুঠতরাজের ফলে লক্ষাধিক মানুষ গৃহহারা। শত শত মানুষের আজ প্রয়োজন চিকিৎসা। গৃহহারাদের আশ্রয়, খাদ্য, চিকিৎসা এবং সর্বোপরি ব্যাপক হারে পুনর্বাসনের সহায়তা দানের প্রয়োজন।

এটাকে একটি জাতীয় বিপর্যয় বলে মনে নিতে হবে। ত্রিপুরার মতো ক্ষুদ্র এবং অনুন্নত রাজ্যের পক্ষে এই বৃহৎ সমস্যার সমাধানের কাজ একার পক্ষে বহন করা খুবই কঠিন। কাজেই আমরা এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারগুলি এবং উদারচেতা নাগরিকদের নিকট ও তাদের বিভিন্ন সংগঠনগুলির প্রতি আবেদন রাখছি—আপনারা সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসুন। দুর্গত মানুষের সাহায্যে নগদ অর্থ এবং ত্রাণ সামগ্রী মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করুন।

কেন্দ্রীয় সরকার সহযোগিতার পথে আমাদের সর্বপ্রকার সহায়তা দানের আশ্বাস দিয়েছেন। ত্রিপুরার জনগণের পূর্ণ সহযোগিতায় উপজাতি এবং বাঙালীর মধ্যে ঐতিহ্যবাহী সম্প্রীতি পুনঃস্থাপনে আমরা অবশ্যই সফল হবো। হানাদারদের আক্রমণে বিধ্বস্ত গ্রামগুলি পুনর্গঠনে সক্ষম হবো। এই সংকটময় মুহূর্তে আসুন, আমরা শপথ নিই—পুনরায় ত্রিপুরাকে শান্তি ও সম্প্রীতির দুর্গ হিসেবে গড়ে তুলি।

নৃপেন চক্রবর্তী
মুখ্যমন্ত্রী : ত্রিপুরা

তথ্য সংযোগ ও পর্যটন অধিকার।

আফটার অল

চিত্ত ঘোষাল

নয়নচাঁদ বড়কে আমরা তো দেখেছিলাম।

পর মনে যখন আমার প্রথম পরিচয় হয়েই তখন বয়স চল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে। আমারোই বয়সী।

বড় ঘরের ছেলে। গ্রামে বিস্তর ভূ-সম্পত্তি আর শহরে কলকাতায় খানেক বাড়ি ছিল তিন পুরুষ আগেও। কিন্তু যে পদ্ধতিতে বনেদী কলকাতার জমিদাররা অনেকেই সুরা-মদ-মেয়েমানুষে মজেছিল আর এবং একজোটেই বাজনায় বেজে এ ওকে টেক্কা দেবার খেলায় ফতুর হয়ে গেল, সেই একই পদ্ধতিতে নয়নচাঁদের ঠাকুরদার বাবা কি তারও বাবার আমল থেকে পূর্বপুরুষদের অর্জিত ও সঞ্চিত টাকা ওড়ানোর যে খেলা শুরু হয়েছিল, নয়নচাঁদের বাবা ও তার একমাত্র কাকার আমলে, তারই ফলে, বিরাট সম্পত্তি উড়ে-পুড়ে গিয়ে ঠেকেছিল দু'খানা মাত্র বাড়িতে। অবশ্য বাড়ি দু'খানা বেশ বড়। বাবার একমাত্র সন্তান নয়নচাঁদ। কাকা নিঃসন্তান। বাবা-কাকার জেদের বাড়ি ভাড়িবাজার বেলগাছিয়াতে পাশাপাশি ঐতিহ্য বহাল রাখতে রাখতে যখন আবিষ্কার করল একমাত্র বংশধর নয়নচাঁদের জন্য দু'খানা বাড়ি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, তখন তাঁরা সুবুদ্ধিতে কে জানে, গুরুদেবতার নামে বাড়ি দু'খানা দেবোত্তর করে দিয়ে দিব্যি হল টেট। অর্থাৎ বাড়ির আয় ভোগ করা চলবে, বাড়ি বিক্রি করা চলবে না। তারপর একে একে যা হবার বাবা কাকা গত হন। ট্রাস্টিদের শর্ত অনুযায়ী নয়নচাঁদের দুই বাবা আর নয়নচাঁদ হল ট্রাস্টী। বাড়িভাড়া থেকে আসে আয়। গুরুদেবতার সেবা এবং সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের পর সেবাইত ও রক্ষক হিসেবে নয়নচাঁদের মাসোহারা বেশ ভালোই। নয়নচাঁদ একা। বিয়ে-থা মসজিদয়ার কারও বালাই ছিল না। বাপ-ঠাকুরদার পাইকও অনুসরণ করতে পারত। কিন্তু এর কোনোটাতেই গেল না সে।

নয়নচাঁদের বাড়ির কাছেই আমি বাসা ভাড়া নিয়েছিলাম। পয়সাওয়ালা বনেদী পরিবারের ছেলে হিসেবে আমার সহ-আড্ডাধারীদের মধ্যে নয়নচাঁদ মাঝে মাঝে আলোচিত হত। ছেলেটা বংশ ছাড়া, বাপ-পিতেমো'র একেবারে উলটো ধারার—এ ধরনের কথাবার্তা শুনতে শুনতে তার সম্পর্কে আমিও একটু কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম।

মাঝেমধ্যে তার দেখা পেতাম বাজারে। সকালেই ছেলেমেয়েদের আবিষ্কার করেছি, যদিও পোশাক-আশাকে নিতান্তই সাধারণ ও বয়সের ছাপ। ধুতি, পাঞ্জাবি, শার্ট, পাজামা, প্যান্টের যে কোনো কম্বিনেশনেই তাকে দেখা যেত। সেগুলো তেমন ধোপ-দুরস্ত নয়, যদিও দোমড়ানো বা ফ্যাশনের কালোবাজারিও পাওয়া যায় না। লম্বা চুল কাঁধের দিকে নিচের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত

গেছেন, হিপি-টাইপ জাতীয় কিছু নয়, সাধু-টাইপের মতো। দাড়ি অবশ্য কামানো, তবে বিন্যস্ত নয়। সবচেয়ে লক্ষণীয় গলার মালাটি। একটি বড় রুদ্রাক্ষের দু'পাশে বৈষ্ণবোচিত মালাবিন্দু ধরনের পরেছেন। দেখলেই বোঝা যায় মহন্টার সাত্ত্বিক ভক্তিমার্গের লোক। মহন্টারের প্রতি আমার আকৃষ্ট হবার কারণ অবশ্য সেটা নয়। পৃথিবীতে মূর্খদের যে পরিমাণে বুদ্ধি বাঁচে থাকে উপরের 'মহন্ত' ও 'সর্বশক্তিমান' সার্টিফিকেট দু'টি আমার দু' কথা বিফল বলেই মনে হয়। শ্রীমন্তকের সে কারণেই আমি তেমন বুদ্ধিমান বা অক্ষম বলে মনে করি না। মহন্টারের কথা আলাদা। অত জানীর হবার পথ থাকে।

আমার সঙ্গে থেকে আলাপ মহন্টারই করেছিল।

—ও দাদা, শুনুন, শুনুন।

পেছনে তাকিয়ে দেখি মহন্টার। এক-মুখ হাসি।

ঘুরে দাঁড়ালাম। মহন্টার এগিয়ে এল কাছে।

—নমস্কার দাদা।

—নমস্কার।

—আমার নাম মহন্টার দত্ত। আঠারোয় ভিতে থাকি।

—জানি। আপনি বিখ্যাত লোক মশাই। হেসে বললাম।

—আজ্ঞেটার বল, বিখ্যাত হবার মতো কোনো গুণ আমার নেই দাদা। তবে পাগলেরও কিছু দাম হবার।

—আপনাকে পাগল বলতে আটকে ভাবিনি। মাস চার-পাঁচ হল এসেছি এ পাড়ায়। এরই মধ্যে কত লোকের মুখে যে আপনার প্রশংসা শুনলাম...

—আজ্ঞেটার বল, যে পাগল কামড়ায় না তাকে লোকে অপছন্দ করে না। পাগলরা মজার লোক।

বেশ লাগছিল মহন্টারের কথাবার্তা, হিমশোলা মানুষটি।

বললাম—তাই বলে পাগলকে কেউ পরোপকারী মহাজনেরা এইসবও বলে না।

মৃদু হাসিতে মহন্টারের মুখখানা ভরে গেল—হাবার সঙ্গে কথায় পারার জো নেই। আজ্ঞেটার বল, সাহিত্যিক যে।

একটু অবাক হলাম। লিখি টিখি বটে, তবে সেটা বাণিজ্যের কাঁধে ভর করে চলে না, লেখক কাগজকারুর পিঠে উঠতে পারিনি। কলে একখানাও 'পরোপকারী' বই আমি লিখিনি। আপনার প্রকাশক যদি বছরে অন্তত খান চারেক 'পরোপকারী' লেখা আপনাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে হাজার হাজার টাকার বিজ্ঞাপনে সেই কথা লোককে না-ই জানায় তবে কে আর আপনাকে চিনবে। বরং লেখেন বলে আপনি তখন মুদ্রিত দো দিয়ে বড় কেতা নতুন বরের মতো মহন্তা হয়ে থাকবেন। ভালো লাগে বলে লিখি, তবে নতুন কেউ আমার লেখার কথা তুললে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করি। আমার পাঠক-সংখ্যা অনুমান করতে পারি। যাঁরা পারবেন আমার লেখার কথা তোলেন তাঁদেরও বেশির ভাগ আমার লেখা বিশেষ পড়েননি। মহন্টারকে তার ব্যতিক্রম মনে করার কারণ ছিল না।

বললাম—খবরটা পেলেন কোথায়?

মহন্টার হেসে বলল—আজ্ঞেটার বল, সেই কাজ তো এই কাজ। খান চারেকের পত্রিকায় বসে বসে পাই। একটা কিছু করে সময় কাটাতে হবে তো।

—একটা কিছু কেন, অনেক কিছুই তো করেন।

—ঐ আর কি। তার মধ্যে একটা হচ্ছে পাড়ার সবার খোঁজখবর রাখা। কোথায় দাদা, টিকটিকি-গিরগিটি জাতের না যেন আবার

—বলেই বা আমার কি। পুলিশের মত পাবার মতো আমার কোনো দোষ বা গুণ নেই।

মহন্টার আমার হাত ধরে খোলা গলায় হেসে উঠল। হাসিটি বড় ভালো লাগল। চল্লিশ-পার মানুষটার মুখে যেন একটি কিশোরের মুখের উঁকিঝুঁকি।

হাসি থামতে মহন্টার বলল—আজ্ঞেটার বল, কাজের কথাটা সেরে ফেলি দাদা।

—কাজের কথা!

—তিন একটা, হঠাৎ কি মনে হতে মহন্টার বলল, চা খাবেন দাদা?

—একেবারে বিকেলের না হলে চা খাবার অভ্যাস আমার আদৌ নেই।

—একটু চা খেলেই আমি কৃতার্থ হব। আপনার সঙ্গে আড্ডা দেবার লোভটা বহুদিনের, বহুদিন আমার সেই হাল। লেখালেখি আমার না লেখার মতোই, পাড়ার ছোট পত্রিকার পড়ুয়া বলেন যখন দেখার হল বিকেল বিকেল দেখেছি পেয়েছি... আজ্ঞেটার বল, আপনি পণ্ডিত লোক, আপনার সঙ্গে কি...

মহন্টারের বিনয়ের একটা বাধা দিয়ে বললাম—দেখুন মশাই, লিখি বলে আমি পণ্ডিত ব্যক্তি নই। আপনাকে আমি আমার চাইতে অনেক কাজের আর গুণী মানুষ বলে মনে করি। বেশ কিছুকাল ধরে পত্রিকার আমার খোঁজ নষ্ট হচ্ছে না, দু'চারজনকে বাদ দিলে ওদের মতো বাজারে দেখাও অধম। লেখকদের অনেকেরই একই কথা। শুনবেন তো। যদি মশাই, বন্ধুর মতো মিশতে পারেন আপনার সঙ্গে আমার পটবে, নইলে...

আমার প্রাণখোলা এবং সহজ ও পরিচয় ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে আমার কটু মন্তব্য বিশেষ বিচলিত মহন্টার আমার হাত চেপে ধরে বলল—খাস কথা দাদা,

দাগ করব। চলুন…

পাড়ার মধ্যেই চায়ের দোকানে বসে মন্টুদা বলল—হাবু, সাত বলে কাপ ধুয়ে দুকাপ চা দে, দুটো করে নোনতা বিস্কুট।

নোনতা বিস্কুটে রুচি ছিল না, তবু মন্টুদার কথা ভেবে আপত্তি করলাম না।

—ব্যাপারটা কি জানেন দাদা, বাচ্চাদের জন্যে একটা নাটক আপনাকে লিখে দিতে হবে।

—নাটক আমি লিখি না।

—লিখবেন। ডাক্তার দাদা, নাটক আপনি লিখেছেন। আপনার [illegible] আমি দেখেছি, চমৎকার নাটক।

বেশ কিছু আগে কয়েকখানা নাটক লিখেছিলাম। বিশেষ চলেনি। একখানা রিহার্সাল চালাবার পর চতুর্থটি কোনও দিনে বলেছিল—আপনার লেখা নাটক যেমন বাজার পায়নি, এখানেও পাবে না। নাটকের বই বেচে অনেক নাটকের বদনাম। ওরা মজা চায়, ভাঁড়ামি চায়, বক্তৃতা উপদেশ করলে নয় হয় না। আপনি কেমন বড় সিরিয়াস নাটক লেখেন? ঐ হচ্ছে আসল বাজারে যান।

কথাগুলো মনে পড়ে গেল। মধুর স্মৃতি নয়।

চা এসে গিয়েছিল, চুমুক দিতে বললাম—আমার নাটক এখনো অভিনয় হয় নাকি?

—এসব কথা জানি না। বহু পাণ্ডুলিপি আমি দেখেছি।

—আপনার পাণ্ডুলিপির প্রশংসা করতে হয়।

—ডাক্তার দাদা, প্রশংসাটা আপনার নাটকেরই পাওনা।

—খুব হাসালে দিলেন। কিন্তু ইচ্ছে করলেই কি নাটক আর লিখতে পারব।

—খুব পারবেন দাদা, খুব পারবেন। বাচ্চাদের জন্যে একটু কষ্ট আপনাকে করতেই হবে।

চেষ্টা করব ছোটদের নাটক একটা লিখে দিলাম। মন্টুদাকে দিয়েছিলাম কিছুটা। ছিনে জোঁক, সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। অবশেষে বাবার কথা মন্টুদার মুখোমুখি করতে লাগল। কোনোরকমে লিখে দিলাম। কিন্তু অভিনয়ে ছিল দেখেই হল। মন্টুদা কিছুতেই ছাড়ল না। তবে বাবার আগে আমি কথা আদায় করে নিয়েছিলাম যে নাট্যকার হিসেবে কারো কাছে আমার পরিচয় দেওয়া চলবে না। মন্টুদা রাজী। অভিনয় সত্যিই দেখলাম।

দিয়ে দেখলাম ঠকিনি। নতুন একটা অভিজ্ঞতা হল মন্টুদার সম্পর্কে। ভেবেছিলাম মন্টুদার পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দিয়েই নাটক করাচ্ছে। দেখলাম, না, তা নয়। আমাদের পাড়ার ভদ্রলোকদের ছোট বড় বাড়িগুলো আড়াল করে রেখেছে একটা ছন্নছাড়া বস্তিকে, যেমন দেখা যায় এই কলকাতার অনেক এলাকায়। ছোট ছোট কাঁচাঘরের বস্তি, ফিরিওলা আর নানান অদ্ভুত জীবিকার গরীবমানুষের বাস। খবরের, বিড়ি, বোতল। এরই মধ্যে মাচা বেঁধে অভিনয়ের ব্যবস্থা। বস্তির বাসিন্দারাই দর্শক। আমার বসার জায়গা করে দিয়ে মন্টুদা বলল—দাদা, শেষ না হলে পালাবেন না কিন্তু। আমাকে একটি একটু—

—ঠিক আছে, ঠিক আছে…

বসে বসে আপনাদের কথাবার্তা থেকে না বুঝলাম—মন্টুদা শুধু উদ্যোক্তা না পরিচালকই না, সবচেয়ে বড় উৎসাহ ওর। ছেলে বুড়ো সবারই এ মন্টুদা। সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র। কিন্তু এরই মধ্যে একটা প্রশ্ন খুব মনে জাগছিল। মন্টুদা ওদের এত আদরের, এত উপকারী বন্ধু, তবু যেন একটু দূরে থেকে কথা বলছিল ওরা। যেমন দাদার মুখোমুখি আসতে কোনো লোকই সহজে সাহস সম্পর্কে বলতে শোনা যেত সবাইকে কর্তাবাবুদের, কিংবা কিছুটা উদার অভিভাবকের কাছে শোনা যায় অনুরূপ প্রভাব।

অভিনয় কেমন হল সে আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে ওদের উৎসাহ উদ্দীপনার ঘাটতি নেই। শেষ পর্যন্ত দেখে গেলাম।

অভিনয় শেষ হবে মন্টুদা ছুটে এল—কেমন দেখলেন দাদা?

—চমৎকার। ফিরবেন তো এখন?

—হাঁ। দু' মিনিট বসুন।

সহকারীদের কিছু আদেশ-নির্দেশ দিয়ে মন্টুদা বলল—চলুন।

হাঁটতে হাঁটতে মন্টুদা বলল—ডাক্তার দাদা, আপনার জন্যেই ব্যাপারটা হল।

—আরে দূর, নাটকের অভাব আছে নাকি বাজারে।

—ডাক্তার দাদা, একেবারে নতুন নাটক পাচ্ছি কোথায়।

—তাতে কি, আপনি তো আর নাটকের দল করতে যাচ্ছেন না।

—না, তা নয়। ছোটলোকের ছেলে-মেয়েগুলোকে ভালো রাস্তায় রাখার চেষ্টা আর কি।

'ছোটলোক' শব্দটা কানে বাজল—বিশেষ করে যে রকম সহজভাবে মন্টুদা শব্দটা উচ্চারণ করেছিল।

—আপনার চেষ্টার প্রশংসা করি। কিন্তু ছোটলোক বড়লোক কারো ছেলে-মেয়েরাই ভালো থাকছে না, ভালো থাকা সম্ভব নয়।

—ডাক্তার দাদা, চেষ্টা তো করতে হবে।

—নিশ্চয়ই। কিন্তু কিভাবে?

—কেন, আপনি, আমি, আমরা সবাই যদি চেষ্টা করি তাহলেই হবে। মজুমদারের গলায় গভীর বিশ্বাস।

—দেখুন, সেবার মনোভাবটাকে আমি ছোট করে দেখছি না। কিন্তু মানুষকে মানুষের মতো করে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষা আর জীবিকা দুটোরই ব্যবস্থা থাকা দরকার। আপনি আমি ব্যক্তিগত চেষ্টায় কি সে কাজ করতে পারি।

—আজকাল আর, সেটা তো সম্ভব নয়। বড়লোক ছোটলোক চিরকাল ছিল থাকবে। এই তো নিয়ম।

বুঝলাম মজুমদারের কাছে গরিব মানুষ ও ছোটলোক শব্দ দুটির একই অর্থ। যাকগে যাক, মজুমদারের পরকাল নিয়ে আমার মাথা না ঘামালেও চলবে, আমি ভাবছিলাম অন্য কথা।

বললাম—নিয়মটা তৈরি করেছে কে? এটাকে নিয়মই বা বলছেন কেন?

মজুমদার চিন্তিতভাবে প্রায় আধ মিনিট চুপ করে থেকে বলল—আজকাল আর, অত শত বুঝি না বাবা। ছোটলোকদের ভালো করতে চাই। বিবেকানন্দ বলেছেন—ভুলিও না, দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী......

ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম—জানি, জানি। কিন্তু একটা কথার উত্তর দিন তো, এই যে বাচ্চাগুলোকে আপনি সৎপথে চালাবার চেষ্টা-করছেন এরা যখন অভাবের জ্বালায় খাবার চুরি করবে, এদের জন্য হাজত তৈরী করা হবে......

—তৈরি করা হবে? মজুমদার আর্ত-নাদ করে উঠল।

—হ্যাঁ, তৈরি করা হবে। তখন দুঃখ পাওয়া ছাড়া আপনার আর কি করার থাকবে?

—আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না বাবা।

বুঝতে পারছিলাম মজুমদারের মাথায় ভালো করার বাসনা ইতিহাস সমাজ রাজনীতি প্রভৃতি বাস্তব বিষয়গুলির সঙ্গে যুক্ত নয়। ওর ধারণা সমাজে প্রাকৃতিক কারণে বা ঈশ্বরের বিধানেই ধনী ও ছোটলোক (অর্থাৎ গরিব) থাকবে, এবং হাজার হাজার মজুমদার উদ্যোগী হয়ে ছোটলোকদের সেবা শুরু করলেই ওদের মানসিক উন্নতি ঘটবে, মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ওরা শিক্ষা আর জীবিকার উপায়াদি সম্পর্কেও সচেতন হয়ে উঠবে। হায় রে! মজুমদারের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা শুরু করার সময় তখন ছিল না, ভাবলাম পরে একদিন কথা বলতে হবে। মানুষটা ভালো, ওর আন্তরিক প্রয়াসের পেছনে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার। নইলে নিজের নিষ্ক্রিয়তাকে হয়তো নিজেকেই একদিন ধিক্কার দিতে হবে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছিলাম, বললাম—চলি তাহলে আজ। একদিন আপনার সঙ্গে বসব, অনেকগুলো দরকারী কথা আপনাকে বলতে চাই।

কিন্তু সে চেষ্টা করবার সুযোগ আর পাইনি, তার আগেই এমন কিছু ঘটেছিল যাতে আমার বিস্ময়ের কারণ হয়। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

মজুমদারের কাজকর্ম আরো অনেক মধুর দেখলাম। যত দেখলাম, মুগ্ধ হলাম।

পাড়ার মজুমদার বস্তিতে একটা ফ্রী টিউটোরিয়াল মতো চালায়। শিক্ষক সে একাই, বেগার খাটার লোক আর কোথায়। ছাত্রছাত্রীরা কেউ কেউ কর্পোরেশন স্কুলে যায় সময় সুযোগ ও ইচ্ছে হলে। হ্যাঁ, ছেলেমেয়েদের ইচ্ছেটাই প্রধান। কারণ এদের বাপ মায়ের এমন সঙ্গতি নেই যে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে। এবং মানব চরিত্রের একটা স্বাভাবিক দিক হচ্ছে, দীর্ঘকাল দারিদ্র্য অভাবে ভুগলে মানবের মৃত্যু ঘটে। এইসব ছেলেমেয়েদের বাবা-মা 'মানব জীবনে শিক্ষার ভূমিকা' সম্পর্কে একেবারেই অচেতন, কারণ ইস্কুলে পাঠাতে গেলে যদি বা মাইনে লাগে, বইপত্র খাতা পেনসিল সেলেটের জন্য কিছু না কিছু খরচ তো হয় মাসেই করতে হবে। কাজেই 'লেখাপড়ার ফুটানি পরি-বেশ করো না.' এই সমস্ত বিশ্বাস থেকেই কেউ কেউ '[illegible] না বা মুটে ইস্কুলে গেলে খাবে না, পাঠশালা থেকে' বলে ছেলে মেয়েদের ইস্কুল ছাড়িয়ে দেয়। কিন্তু একটু লেখাপড়া করেই যেই বাচ্চারা বুঝে ফেলে [illegible] একটুখানি [illegible] এই হচ্ছে শহরের গরিব বস্তিবাসী মানুষদের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক। এই সবে মজুমদারের এমন চেষ্টা দেখিয়ে ফ্রী টিউটোরিয়াল চালানো সত্যি প্রশংসনীয় [illegible]

অবশ্য এর মধ্যেও যে কিছু কিছু ফল [illegible] না তা নয়। [illegible]—একথা আমার প্রত্যেকেই হাতে হাতে জানি। মজুমদার নিজের হাতের সমর্থনে আমাকে একদিন বলেছিল—বিবেকানন্দ বলেছেন, ভগবান ধ্যান না করে ফুটবল খেলতে যাও, তাতে শরীর তৈরি হবে। তখন অনেক কাজই করতে পারবে। বিবেকানন্দ বলেছিলেন কিনা জানি না, তবে কথাটা মনের মতো। মজুমদার সকালে বস্তির কিছু বাচ্চা ছেলেমেয়েকে ভালো করে পাড়ার মাঠের পাশে বসে কি ট্রিল করায়। বিকেলে একটা রাবারের ফুটবল নিয়ে পাড়ার ছেলেকে ফুটবল খেলায়। ফুটবল বাচ্চারা

নিজেদেরই আয়ত্তে রেখেছ। 'শুধু স্কুল কলেজের জন্য ছাত্রছাত্রীদের অধ্যক্ষ দ্বারা রেখো চাপের হাত থেকে আমায় বিদায়।

কয়েকটা বছর পার হয়ে গেল। ছাত্রছাত্রীর অবস্থা উৎসাহে তার কাজ করে চলেছে। বিদ্যের দক্ষিণ হাতটাকে হাতে হাতে আস্থা করে মুক্তি দিলাম। এই বিষয়ে কি কোনো বাধাই নেই? তবে দাঁড়িয়ে উঠেছে হত নতুন দের কটি ছাত্র-ছাত্রী স্কুলের সীমানা পেরিয়ে কলেজে ঢুকতে পেরেছে। তার শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে থেকে ক'জন ভালো খেলোয়াড় তৈরি হল? ক'জন পেশাগত যোগ্যতা অর্জন করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জীবনে? অবশ্য এসব প্রশ্ন করে ছাত্রছাত্রীদের কখনো বিব্রত করিনি। সুখদুঃখে আমি চিনে রাখিনি, 'শুধু আমার কাছে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের কোনো ছাত্রছাত্রীই স্কুলের চৌকাঠ পেরোতে পারেনি। বেশ কিছু ব্যাপারে মনের ছিনতাইবাজ হয়ে গেছে, কেউ কেউ রোজগারের আশায় বাপের ব্যবসাকে লেগে ঘুরে গেছে, না হয় কেরানিদের ভিড়ে নানা অফিস রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, বাকি—এরা যৌবনের মাঝামাঝি পৌঁছতে না পৌঁছতেই বুড়ি হয়ে যাবে, ঠিক যেভাবে ওদের মা ঠাকুমারা হয়েছে। যাদের বিয়ে হচ্ছে না তাদের অনেকে বাপের সংসারে সাহায্য করতে বাড়ি বাড়ি বাসন মাজার কাজ নিয়েছে, অথবা পথে যোগেশের অধিকার আন্দোলন শাড়ি পরে আমরা রেখে অথবা ঘুরে বেড়াচ্ছে নিয়মিত-যৌবনের মহড়ায়। ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশ দেশের বাইরে নয়। ছাত্রছাত্রীর শুধু থেকে গেছে, তার মধ্যে বিরাম নেই।

তিন চার বছর পরে প্রক্রিয়া চলছিল সবরকম, যেমন বরাবর হয়ে চলে আসছে। মাঝে মাঝে ঢেউ উঠছিল—রাজনীতির সর্বাধীন উত্থানপতনের ঢেউ। হঠাৎ এমনি একটা ঢেউয়ের মাথায় এসে চাপান দেন। নির্বাচন।

অপ্রত্যাশিত উত্তেজনা উপচে উঠেছে। দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার, ফেস্টুন-ফিতে ও ঝিরঝিরে পতাকার রোশনাই পাশাপাশি কাঠামোর মঞ্চে। ট্রামে বাসে ট্রেনে অফিসে পাড়ায় সর্বত্র তর্ক। পত্রিকাগুলোর বড় বড় খবরের কাগজে খবর দিয়ে পরিস্থিতি। (বক্তৃতা+প্রতিশ্রুতি)। অহর্নিশ চলছে।

এতদেশীয় রাজনীতি সম্পর্কে আমি বিতৃষ্ণ, দায়িত্ব অশিক্ষিত অ্যাকাডেমিক আগ্রহ (খবরের পরে যাতে যায় পড়া দেখা যায়) ছাড়া আর কিছু নেই। আসন্ন নির্বাচন আমার মনে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারল না। ভোট দেওয়া একটা অভ্যাস তৈরি হয়ে গেছে, সুযোগ পেলেই ভোট একটা দিয়ে দিই, সেই হিসেবে এবারও ভোট নিশ্চয়ই দেব। তার বেশি আগ্রহ বা মাথা ঘামানোর প্রশ্ন ছিল না।

নির্বাচনের দিন কয়েক আগে বাড়ির

শরৎ এল। ঘরে ঘরে ছুটির নিমন্ত্রণ
পৌঁছে দিল আকাশের লঘুপক্ষ মেঘ।
ফুলের সৌরভে আমোদিত বাতাবরণ।
আসুন। বেরিয়ে পড়ি। ক্লান্ত কোলাহল
থেকে অনেক দূরে প্রকৃতির প্রশান্ত
বিজনতায়। সাদর অভ্যর্থনায়
প্রতীক্ষা-চঞ্চল সিন্ধু। স্থির পর্বত।
আর, মন্দিরের সুপ্রাচীন সুন্দর আঙিনায়।
আপনার এই নিমন্ত্রণের
সানন্দ সঙ্গী আমরাও।

আপনাদের বিনীত সেবায় রত
দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

পাশের পার্কে একটা বিরাট জনসভা হচ্ছিল। অফিস থেকে ফেরার পথে কি খেয়ালে ঢুকে পড়লাম। ভিড় মন্দ হয়নি। পেছনের দিকে দাঁড়ালাম। মঞ্চ থেকে আমার দূরত্ব বেশ খানিকটা। মঞ্চে আলো ছিল, কিন্তু আমার দৃষ্টিশক্তি তেমন জোরালো নয়, মঞ্চের ওপরের লোকজনের চেহারা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাছাড়া তাতে আমার আগ্রহ নেই, শীর্ণকায় যে তিনি বক্তৃতা রাখছিলেন তাঁর গলাটাই শুধু আমার কানে পৌঁছচ্ছিল, বক্তব্য নয়। বরং আপনাদের শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া ও মন্তব্যেই আমি বেশি মনোযোগী ছিলাম ও উপভোগ করছিলাম।

হঠাৎ চমক। মঞ্চের ওপর ও কে? মন্মথবাবু না? ঠাহর করে দেখলাম, হ্যাঁ, মন্মথবাবুই। বুকে ব্যাজ এঁটে ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করছে। এত বছর হয়ে গেল এ পাড়ায়, ওকে কখনো কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করতে দেখিনি বা রাজনীতি নিয়ে একটি কথাও বলতে শুনিনি। তা এই নতুন ভূমিকার হদিস জানার বই কি। মন্মথবাবুর মত ব্যক্তি যে রাজনীতির পথে যুক্ত থাকতে পারে তা যেন আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না।

পরদিন মন্মথবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই বললাম—আরে মশাই, আপনি যে রাজনীতি করেন তা তো এতদিন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি।

—আমি? রাজনীতি? মন্মথবাবু আকাশ থেকে পড়ল, পরক্ষণেই যেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, ও, কাল মিটিংয়ে গিয়েছিলেন বুঝি?

—হ্যাঁ। আপনার ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলুন তো।

—ব্যাপার আর কি, ওরা যেমন চাইল ...এখানকার ছেলেপুলেরা আমাকে একটু মানে-টানে তাই...

—কিন্তু মন্মথবাবু, যাদের জেতাবার কাজে আপনি যেমন করছেন তারা কি কোনোদিন গরিবের ভালো করার চেষ্টা করবে বলে আপনি বিশ্বাস করেন?

—না, করি না। আফটার অল, বড়লোকের ইন্টারেস্ট ছাড়া ওরা কিছু দেখবে না।

আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব তালগোল পাকিয়ে গেল।

বললাম—আপনি যে কি বলছেন মশাই, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। গরিবের জন্যে আপনার এত ভাবনা, অথচ যারা গরিবের ভালো করবে না বলে আপনার বিশ্বাস তাদের দলেই আপনি আছেন!

মন্মথবাবু মৃদু হেসে বলল—আরে দাদা, এটা বুঝতে পারছেন না! আফটার অল, আমি যে ছোটলোকদের ভালো করার চেষ্টা করতে পারছি সেটা আমার কিছু বাড়তি পয়সা আছে বলেই না। এখন ওদের দলের কেউ ক্ষমতায় এসে যদি আইন করে যেটুকু সম্পত্তি টম্পত্তি নিয়ে নেয় তখন ছোটলোকদের ভালো, আফটার অল, আমি করব কি করে?

অবশেষে মন্মথবাবু হাসিমুখে আমার মুখের দিকে সর্বজ্ঞের মত তাকিয়ে রইল আর আমি তখন 'আফটার অল'-এর ধাক্কা খেয়ে হতভম্ব দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার বিস্ময়ের মাত্রা বাড়ছিল।

পুরস্কার যখনই নিজেই সম্মানিত হয়

আত্মত্যাগী টেরেসাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে ভূষিত করে 'নোবেল'
পুরস্কার এবার নিজেই সম্মানিত।
আর সম্মানিত হ'ল এই পশ্চিমবাংলা, যেখানে ঐ বিদেশিনী
মহীয়সী তাঁর জীবনের বৃহত্তর ব্রত শুরু করেছিলেন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে
আর্তের সেবায়। যার আর এক নাম ভালবাসা — মানুষ ও মানুষের
প্রতি স্নেহময়ী জননীর অনাবিল, নিঃস্বার্থ ভালবাসা।
যে মহাহিত আপনার হাতে সেবা ও ভালবাসা অভিন্ন,
যিনি এই বাংলাকে মানবতা ও শান্তির মানচিত্রে চিরকালের জন্য চিহ্নিত
করে গেলেন, সেই মহাপ্রাণকে আমাদের প্রণাম।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

শালের কাঠ আর শালের মঞ্জরী

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

১৯৩৬ সালে, যখন ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করার কথা হচ্ছে তখন, যাদের মধ্যে একদিন এদে-শের বাংলার বাইরের মধ্যে [illegible] ভারতীয় অন্য ভাষার ছাত্র এবং এই সঙ্ঘ স্থাপনের উদ্যোক্তা। প্রগতি সাহিত্যের চরিত্র কী হওয়া উচিত এই প্রশ্নের উত্তরে তখন বলেন, সাহিত্যের ব্যাপারে বলবার কথা আর [illegible] বা [illegible] জানে। একজন বাঙালী ছাত্র সেই আড্ডায় রবীন্দ্রনাথকে উল্লেখ করেন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতিভূ এবং প্রতিক্রিয়াশীল বলে। রবীন্দ্রনাথকে এই হিসেবে ভূষিত করার কথা শুরু হল। এটা তাঁর অবদান, মার্কসীয় আন্দোলনের অবদান।

তখ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অদ্ভুত মন্তব্য করে-ছিলেন যে সম্পর্কে সন্দেহ থাকা খুবই স্বাভাবিক। বিদেশী ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্র-সাহিত্যের বেশি তাঁর জানা থাকার কথা নয়, সুতরাং তাঁর রবীন্দ্রবিচারকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে ১৯৩৮ সালেই যে কোনো কোনো মার্কসবাদী রবীন্দ্র-নাথকে বুর্জোয়া ভাবছিলেন, তা জানা যাচ্ছে সাজ্জাদ জাহীরের স্মৃতিচারণ থেকে (Marxist Cultural Movement in India : Sudhi Pradhan)

সুরেন্দ্রনাথ হয়তো কিছু ভাবেন অন্য কারণে। তাঁর আক্ষেপ রবীন্দ্রনাথ বড়ো বুর্জোয়া মন বলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতে অত্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক। সুরেন্দ্রনাথ নিজেকে মার্কসবাদী মনে করতেন, সুতরাং তাঁর সাহিত্যবিশ্লেষণ স্মরণ করা যেতে পারে। 'সাহিত্যে প্রগতি' প্রবন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ এই রকম।

সাহিত্যের সমাজতত্ত্বকারীরা বলেন, সাহিত্য একটা সমাজের ব্যাপার হলেই চলে, সেই বাড়ে কমে, সেই ধারা দল ও দলের বিকাশ লাভ করে—অতএব সাহিত্যে প্রগতি বা অধোগতি বলে কিছু নেই। সুরেন্দ্রনাথ এই সমাজতত্ত্ব মানেন, কিন্তু তাকে তা স্বীকার করেন না। তাই যে সামাজিক শ্রেণীর প্রভাব থাকে জাতীয় জীবনের সর্ব বিষয়ে যেমন সেই শ্রেণীর ছাপ পড়ে, সাহিত্যেও তেমন পড়ে। অর্থাৎ যে শ্রেণী সমাজে প্রভাব বিস্তার করে সাহিত্যে সেই শ্রেণীরই দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

"সংস্কৃত সাহিত্যে Heroic যুগ থেকে সামন্তযুগীয় সমাজের নিদর্শন পাওয়া যায়। অথচ ভারতবর্ষে আজ পর্যন্ত একটা যথার্থ বুর্জোয়াসমাজ এখনও পরিস্ফুট হয় নাই। এই জন্য সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার নিদর্শন নাই। তবে কথা আসে বাংলা সাহিত্যে কি নাই? বাংলার সমাজ যেভাবে অভি-ব্যক্ত হইতেছে সাহিত্যেও তাহার প্রতিচ্ছবি পড়িতেছে। বাংলা সাহিত্য কিছু আগে পর্যন্তও সংস্কৃতসাহিত্যের পোঁ ধরিয়া চলিয়া-ছিল; এই জন্যই আমরা প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে রাজারাণী, কবিরাজ, ধনপতি প্রভৃতির সংবাদ পাই। [illegible] বাদে বাংলা সমাজে [illegible]। [illegible] প্রভৃতির পাট অনেকদিন আগেই উঠিয়া গিয়াছে। বাংলার সমাজ আজও সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে, এই জন্যই বুর্জোয়ার যোগ সম্পূর্ণ দাঁড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু উন্নতি যুগের আবেষ্টন হইতে কোনো কোনো সাহিত্যিকের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ একটা মধ্যবিত্তীয় সমাজ ভারতের সর্বত্র গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এই দলে তাহার আভাসও কোনো কোনো সাহিত্যিকের লেখার মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। অন্য পক্ষে ভারতীয় সমাজ-পতির মধ্যে একটি [illegible] শক্তি উঠিয়াছে। সেইজন্য তাহারও কিছু কিছু নমুনা আমরা বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যে পাইতেছি।"

সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন, বর্বর থেকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এবং সামন্ততান্ত্রিক থেকে বুর্জোয়া সমাজ এবং বুর্জোয়া থেকে সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদীয় সমাজ অধিকতর প্রগতিশীল। এবং সেই সেই সমাজের প্রতিফলন, বর্বর সাহিত্য থেকে সামন্ত-তান্ত্রিক সাহিত্য, সামন্ততান্ত্রিক সাহিত্য থেকে বুর্জোয়া সাহিত্য, এবং বুর্জোয়া সাহিত্য থেকে সাম্যবাদী সাহিত্য বেশি প্রগতি-শীল। সাহিত্যমধ্যে সমাজের অগ্রসর-শীলতার যোগান, আকাঙ্ক্ষা এবং স্পৃহা থাকলেই সাহিত্য প্রগতিশীল হয়।

সুরেন্দ্রনাথের এই রচনা ১৯৩৭-এর আগে। ১৯৩৭-এ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রগতি' প্রবন্ধ-সংকলনে সুরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আরো কিছু লিখলেন। তিনি বললেন, আজকের সাহিত্যে একটা কাল-ব্যতিক্রম চলছে, আমরা আছি একযুগে কিন্তু সাহিত্যের চিন্তা হচ্ছে অন্যযুগের।

"ইহা সত্য বটে যে, ভারতীয় সমাজ সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এখনও প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু ইংরেজ শাসনের ফলে এবং কলকারখানার ফলে যে মধ্যশ্রেণী বা বুর্জোয়াশ্রেণী সবে উদ্ভূত হইয়াছে এবং যাহারা ভারত শাসনে ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহাদের অভিরুচির চিহ্ন আমাদের সাহিত্যে

কোথায়? অথচ আজকাল যে ভারতের সর্বত্র ধনিক ও কৃষক শ্রমিক হইয়াছে, তাহারাই যে সমাজ শাসনের ভার লইবার অধিকারী বলিয়া দাবী করিতেছে তাহার নিদর্শন সাহিত্যে কৈ? ইহার বদলে আমরা দেখি যে হঠাৎ বাংলায় হিন্দি ও একহাতে বহু ও দুধুমল আর অন্য হাতে বর্ণশ্রমিকের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চুক্তিপত্র নিয়ে কোনখানে আবির্ভূত হয়েছেন 'বিপ্রদাস'! সমস্ত ভারতে আজ গণশক্তির জাগরণ, সর্বত্র কায়েমী স্বার্থ (vested interests) উঠিয়ে দেবার কথা ও আন্দোলন চলিতেছে, নানা দলের কথা উঠিয়াছে। এমন সময় রাষ্ট্রনায়ক ও ধনিকদের উক্ত আদর্শ দেখাইবার জন্য এই Commercial ও Industrial যুগে বিপ্রদাসের আমলের রাজনৈতিক চালবাজী অনেকের নিকট চাপা থাকে নাই। আমরা জানি ধনিবাদী বা কায়েমী স্বার্থ নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য বড় বড় আদর্শ দিয়ে প্রচার কার্য চালাইতেছে। সেইজন্য এই যুগে বিপ্রদাস একাধারে ব্রাহ্মণ ও ধনিকরূপে আবির্ভূত হইয়া এই দুই ধনিবাদী স্বার্থের পক্ষে ওকালতি করাতে আমরা আশ্চর্য হই নাই, যদিও ইহার বাংলা সাহিত্যের anachronism-এর আর একটি প্রমাণ। আমরা বিপ্রদাসকে সেকেলে প্রাণীর প্রতীক বলিয়া গণ্য করি। আর সাহিত্যে এইরূপ ব্যবহার করার উপায় কখনও কোনমতেও গৃহীত হইয়াছে।"

শরৎচন্দ্রের বিপ্রদাস উপন্যাস বিচিত্রা পত্রিকায় বের হয় ১৯৩২-১৯৩৩ সালে, গ্রন্থাকারে ১৯৩৫ সালে। রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ উপন্যাস বিচিত্রা পত্রিকায় বের হয় ১৯২৭-২৮ সালে, গ্রন্থাকারে ১৯২৯ সালে। রবীন্দ্রনাথ অথবা শরৎচন্দ্র, কে নৃপেন্দ্রনাথের সমালোচনার লক্ষ্য বলা মুশকিল, রবীন্দ্রনাথের ধনিক বিপ্রদাস চাইছেনও হতে পারেন, শরৎচন্দ্রের বিপ্রদাস দুজনেও হতে পারেন। যোগাযোগের ধনিক ব্রাহ্মণ বিপ্রদাসের বিপক্ষে আছেন বণিক মধুসূদন ঘোষাল, আর বিপ্রদাসের ধনিক ব্রাহ্মণ বিপ্রদাসের বিপক্ষে আছেন চাষাভূষোদের সমব্যথী দ্বিজদাস। দুটো উপন্যাসেই লেখকের সহানুভূতি ধনিক ব্রাহ্মণের দিকে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র যে নৃপেন্দ্রনাথের লক্ষ্য স্পষ্ট না হলেও, প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে নৃপেন্দ্রনাথের লক্ষ্য যে রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

"বুর্জোয়া সাহিত্যে সামাজিক আদর্শ আধুনিক লোকের চরিত্র অঙ্কিত হইতে দেখি। তাহারা প্রাচীনের ঘোর কাটাইয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৌশলে জগতের ধনসম্পদ ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত। এই জন্য প্রাচীন আইন, বিধিনিষেধ, সমাজের ভেদ ভাঙ্গিয়া সমাজকে নূতন ছাঁচে গড়িতে চায়। প্রেমবন্ধন আমেরিকা, জাপান, জেনেভার চুক্তি প্রভৃতি। কিন্তু আমাদের হালের সাহিত্যে সামাজিক আদর্শের সেই রূপ কোথায়? তাই 'গণনায়ক' বলো দেখি যে নারী যৌবনে সমাজ সংস্কার কর্মে উৎসাহ প্রকাশ করিলেও যখন তাঁহার 'জেলখানার বাড়ী হইল' তখন 'কোনোরকমে পারিবারিক পূর্ব ইতিহাসের এই অন্যায়টাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া সমাজে উঠিবার জন্য তীব্র লোভ চাপিয়া উঠিল। নিজের মেয়েটিকে সমাজে বিবাহ দিবেন এই তাঁর জেদ…শিক্ষিত সংসারে না হইলেও চলে, কেবল চিরজীবনের সুখ বলিদান দিয়াও তিনি সমাজদেবতার প্রসাদলাভের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন।' আবার 'হালদার গোষ্ঠী' পুস্তকে পড়ি—'বড় ঘরের দাবী কি সামান্য দাবী! তাহার যে নিষ্ঠুর হইবার অধিকার আছে। তাহার কাছে কোনো অন্যই তার কিসের কোনো দুঃখী হইবার অল্পজনের অঙ্গুষ্ঠ বা দুঃখ!' ইহাতে আমরা সেই পুরাতন দাবদাহেরই প্রতিধ্বনি শুনি। আবার 'চোখের বালি'র মতো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঘরের কথা নাই, 'অচিন্ত্য কণ্টক' তথায় বিরাজ করিতেছে। তাহার অন্তরে ও অন্তরে অন্তরেরও দাস victim (বলি) বিনোদিনী বলিতেছে, 'ছি ছি, একথা মনে করিতে লজ্জা হয়। আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনও হইতে পারে না। ছি ছি, একথা তুমি মুখে আনিও না।' আবার সে বলিতেছে, 'কিন্তু ছি, ... তুমি বিবাহ করিবে। তোমার উদার যৌবনে মনে মনে গর্ব হইতে পারে, কিন্তু যদি ঘরে ঘরে অপমান কাটি— তোমাকে সমাজে নষ্ট করি, তবে ইহজীবনে আমি আর মাথা তুলিতে পারিব না।' এই পুস্তকে বিনোদিনী victim হিসেবে শুধু আত্মবিলোপী আর পুরুষ লোকেরা চাপা দিয়ে সমাজে অসহায় হইয়া রহিল। এই ব্যাপারে পুরুষ প্রধানতন্ত্রক সমাজের (androcentric theory of society) চিত্র স্পষ্ট হইয়াছে। যদিও এই পুস্তকের দুইটি মনোজ্ঞ ও কৌতূহলী বৈজ্ঞানিক উপন্যাস ও পুরাতন সমাজবিধানের কথা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।"

এর এক বছর পর বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। নৃপেন্দ্রনাথের আক্রমণ ছিল, রবীন্দ্রনাথ সামন্ততান্ত্রিক ব্যাখ্যাকার আড়ালে গেছেন। বুদ্ধদেবের আক্রমণ হল, রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া ব্যাখ্যাকারের চূড়ান্ত রূপ। বুদ্ধদেবের মতে, ১৯৩১ সালেই বাংলাদেশের বুর্জোয়া সমাজ অবক্ষয়ের মুখে এসে গেছে। ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষে মার্কসের কথায় নতুন বুদ্ধিজীবীর দল দিয়েছে, যারা বুর্জোয়া রবীন্দ্রনাথ নিজের

এবং সাহিত্যিক সাহিত্যপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে যেমন এক সুবিস্তীর্ণ ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। হিন্দু-মেলার আন্দোলন, যা রাজনৈতিক বলে পরিচিত, তার অনুপ্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকেছিলেন তা বিশেষ বশ। তাঁর প্রতিভা দুর্বোধ্য সংস্কৃতির সমস্ত গ্রহণীয় ও বর্জনীয় দিককে আত্মস্থ করে নিঃশেষ করে ফেলেছে। কিন্তু যে যুগ রবীন্দ্রনাথকে সৃষ্টি করেছে তা অতিক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্র অনুসারী সাহিত্যের সে-যুগ আজকের আর কোনো দিন নেই। সেই সাহিত্যের দৃষ্টি দিয়ে থেকে বেরিয়ে এসে নতুন সাহিত্যিকদের নতুন সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং ও বাস্তবের সঙ্গে, সমন্বয় করতে হবে, প্রগতিশীল হতে হবে। সব সাহিত্যই প্রগতিশীল, যদিও সব প্রগতিই সাহিত্য নয়। আধুনিক যুগ-সংঘাত না হলে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হবে না।

তারপর কথার সঙ্গে কথা বলার সময় আশাবাদী, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বা বুদ্ধদেব বসু'র নেতৃত্ব সত্য কি মিথ্যা, তা এই প্রবন্ধে বিচার্য নয়। এই সব অভিযোগ রবীন্দ্রনাথের কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, সেটাই রবীন্দ্রনাথকে বোঝার পক্ষে জরুরী।

ভূপেন্দ্রনাথের 'সাহিত্যে প্রগতি' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের গোচরে আসারই কথা, কেননা যে 'প্রগতি' সংকলনে প্রবন্ধটি বের হয়, সেই সংকলনে রবীন্দ্রনাথের রচনাও ছিল। বুদ্ধদেবের সমালোচনা পাঠ হয় ১৯৩৮ সালে কলিকাতায় আহূত ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের দ্বিতীয় নিখিল-ভারত সম্মেলনে, যে সম্মেলনের উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান জানানো হয়েছিল। পৌষ উৎসবে ব্যস্ত রবীন্দ্রনাথ সম্মেলনে না এসে শান্তিনিকেতন থেকে একটি দীর্ঘ ভাষণ পাঠিয়েছিলেন, সেটা পাঠ করে শোনান হয়। আর এর বুদ্ধদেবের সমালোচনার রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন এবং সে বিষয়ে মন্তব্যও করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে আসার আগে মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রে রবীন্দ্রনাথ কতটুকু অবহিত ছিলেন, সেই বিষয়ে কিছু বলে নেওয়া দরকার।

•

সোভিয়েত ইউনিয়নে রক্ষিত নথিপত্র (সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ) থেকে কিছু তথ্য এখানে সাজানো যেতে পারে এই প্রসঙ্গে।

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়া বেড়াচ্ছিলেন, সুদীর্ঘ ইউরোপীয় ভ্রমণের পর, তখন তাঁকে তরুণ সোভিয়েত ইউনিয়নে বেড়াবার নিমন্ত্রণ জানায়। বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের সমিতি হচ্ছে এই তরুণ। ১৯২৩-এ এর গঠন হয়, ১৯৫৮ সালে এটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের তরুণ সোভিয়েত দেশ বেড়াবার নিমন্ত্রণ জানায় আর জানায় ভারতীয় বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের। রবীন্দ্রনাথ এঁদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে এরা জানায়, নতুন রাশিয়াকে তারা আর রাশিয়া বলে না, বহু জাতির স্বাধীন দেশ হওয়ায় তার নাম সোভিয়েত ইউনিয়ন। মনে করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ এই কথায় তেমন গুরুত্ব দেন নি, রাশিয়া থেকে পাঠানো চিঠির সংকলনকে 'রাশিয়ার চিঠি' নামেই অভিহিত করেন এবং সোভিয়েত দেশকে চিঠিপত্রে রাশিয়া বলেই উল্লেখ করে এসেছেন।

এই নিমন্ত্রণ রবীন্দ্রনাথ সানন্দে গ্রহণ করেন। সোভিয়েত সরকারকে টেলিগ্রামে জানান, রাশিয়াকে তিনি দেখবেন এবং তাকে তিনি ভালবাসেন তার মহান সাহিত্য পড়ে। কোন্ কোন্ মহান সাহিত্য তাঁর মনে ছিল অনুমান করা যায় ব্যক্তিগত এক সংবাদদাতার কাছে বলা তাঁর এক কথা থেকে: তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি এবং গোর্কি।

তরুণ জানায়, রাশিয়াতে রবীন্দ্রনাথের লক্ষ লক্ষ পাঠক আছেন। "আপনার অনেকগুলি রচনা রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে আর এমনভাবে পুরোপুরিই বিক্রি হয়ে গেছে যে এখন আপনার জন্য একটি পুরো সেট সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখছি তা পাওয়া সম্ভব নয়।" (রবীন্দ্রনাথকে লেখা তরুণের চিঠি, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯২৮) রবীন্দ্রনাথ এবিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন। একটা বক্তৃতায়, রাশিয়ায় যাবার সময়, তিনি বলেছিলেন, "ইউরোপে চারজনের পরচায় কী পরিণাম ঘটেছিল তা হয়ত আপনারা কেউ কেউ আমার জীবনস্মৃতির অনুবাদে পড়ে থাকবেন।" তবে তরুণের সভাপতি পেত্রোভের একটি বক্তৃতা থেকে জানা যাচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পাঠকেরা জানতেন গীতিকবিতার কবি রবীন্দ্রনাথকে। সমাজ-সচেতন কবি রবীন্দ্রনাথ সেখানে ১৯৩০ সালে পর্যন্ত খুব পরিচিত ছিলেন না।

তরুণের নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য ছিল দুটই সফল। পেত্রোভের ভাষায়, "আমাদের সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা কথা বলা হয় লেখা হয়। শত্রুরা তখন হতাশ হয় আমাদের নামে। বলা হয় আমরা নাকি সংস্কৃতিকে মেরেছি, বিজ্ঞানের অবনতি ঘটিয়েছি। এর উত্তরে আমরা বলি: আসুন স্বচক্ষে দেখে যান।"

রবীন্দ্রনাথ তখন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্ববিশ্রুত কবি। সুতরাং তাঁর সাক্ষ্যের দাম আছে। তাছাড়াও তরুণ আরো উৎসাহী, কারণ "এই প্রতিষ্ঠানের (বিশ্বভারতীর) লক্ষ্য হল ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব থেকে ভারতীয় যুবসমাজকে মুক্ত করা।"

১৯২৮ সালেই তরুণ জানায় সাহি-

বিশেষজ্ঞের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের অধ্যাপক বিনিময়ের যে কথা রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন তাতে [illegible] পূর্বই সম্মতি আছে। কিন্তু এই প্রস্তাব পরে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় কার্যকরী হয় নি, তার একমাত্র কারণ, অনুমান করা সহজ, হয়ত এই আশঙ্কা যে ব্রিটিশ সরকার এই বিনিময় সুচোখে দেখবে না।

ব্রিটিশ সরকার যে তাঁর রাশিয়া ভ্রমণ সুনজরে দেখবে না সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ভালোই জানতেন। রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ [illegible] করেছিলেন, তিনি যা বলবেন তা সবই প্রকাশিত হবে কিনা। "ভারতবর্ষ এখন বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে চলেছে। সেখানে সর্বত্রই [illegible] মধ্যে চলেছে সংগ্রাম। এই পরিবেশে দমিত সর্বত্রই অতি সহজ। অন্যায় নিপীড়ন ঘটনা, যার সঙ্গে রাজনীতির কোনই যোগ নেই, তার প্রচার বন্ধ করা হয়। মনে হয় বুঝি লুকিয়ে চুরিয়ে বিপ্লবের সহায়তা করা হচ্ছে। আমাদের এই অবস্থায় কোন রকম বিপদের ঝুঁকি নেওয়া চলে না। আমেরিকা আর ইংলণ্ডের অবস্থা একেবারেই অন্য: তারা সবাই স্বাধীন। ভারতবর্ষে এখন এমন পরিবেশ রয়েছে যে আমরা যদি এমন কিছু করি যার সঙ্গে আপনাদের দেশের বহুতর সম্পর্ক আছে তবে তার অর্থ অত্যন্ত বিকৃত করা হবে। ওরা বলবে, এ হল বিপ্লবের ভাবধারা, প্রচারের কাজ চালাবার আড্ডাখানা, সুযোগ। আপনারা তো জানেনই আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এই সন্দেহে যাদের উপর পড়েছে ইংরেজ সর্বশক্তির হাতে তাঁদের কী সইতে হয়েছে। তাঁরা জেলখানায় বন্দী হয়ে রয়েছেন। আমার এদেশে আসাটা আমার পক্ষে খুবই সাহসের কাজ। কিন্তু এখনে বেশি দূর যাওয়াটা উচিত হবে না।"

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝেছিলেন। বাংলায় লেখা 'রাশিয়ার চিঠি', ব্রিটিশ সরকার বন্ধ করেছিল, কিন্তু ১৯৩৪ সালে এর ইংরেজি তর্জমা প্রকাশ আটকে দেয়। যাই হোক, সেদিন রবীন্দ্রনাথকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের অনুমতি ছাড়া রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন তা প্রকাশ করা হবে না।

সেইজন্যই সম্ভবতঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের লোকশিক্ষার ব্যাপারেই শুধু রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। তখন সোভিয়েত কেন্দ্রীয় সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সোভিয়েত লেখকদের সংযুক্ত ফেডারেশনের রবীন্দ্রসংবর্ধনায় কবিকে সংবর্ধনা জানিয়ে [illegible], লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একজন খুবই বড়ো কর্মী, সেই জন্যই তিনি আমাদের [illegible] এসেছেন। রবীন্দ্রনাথও জানালেন, তিনি এসেছেন শিখতে জানতে কেমন করে সোভিয়েত কর্মীরা লোকশিক্ষার সমস্যার সমাধান করছেন।

মস্কো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকেরা রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন: ভারতীয় সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ধারা কী কী? তরুণ শ্রমিকরা ভারতীয় সাহিত্যে কি অংশ নেয়? শ্রমিকদের মধ্যে থেকে কোন সাহিত্যিক বেরিয়েছেন কি? শ্রমিকদের সাহিত্যের অনুশীলন দেবার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান ভারতে আছে?

এর স্পষ্ট কোনো উত্তর না দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানালেন, শ্রমজীবীদের শিক্ষার জন্য কোন সংগঠিত প্রচেষ্টা ভারতে নেই।

এর আগেই প্রশ্ন করা হয়েছিল, শান্তিনিকেতনে চাষীমজুর ঘর থেকে ছাত্র আসে কি। রবীন্দ্রনাথ জানান, না, কারণ তাঁর অশিক্ষা সত্ত্বেও শান্তিনিকেতনের ছাত্রেরা পরীক্ষা পাশ করে ডিগ্রি নেওয়ারই উৎসাহ চাকরি পাবার জন্য, তাদের পক্ষে [illegible] ছাত্ররা নাম রাখাতে পারে। সাধারণ ছেলেরাই [illegible] চায়। তাদের জন্য শ্রীনিকেতন খোলা হয়েছে, যেখানে সরকারী বা বেসরকারী অফিসে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার জন্য নয়, পরিপূর্ণ শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি করেছেন।

শ্রমিকশ্রেণীর রচিত সাহিত্য বা শ্রমিকশ্রেণীর জন্য সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিছু বলেন না, এটা লক্ষণীয়। সোভিয়েতের লেখকরা রবীন্দ্রনাথকে কিন্তু গ্রহণ করেছিল রবীন্দ্রসাহিত্যের [illegible]। ১৯৬১-র ২৪ সেপ্টেম্বর সোভিয়েত রবীন্দ্রনাথের [illegible], ১৯২৮, ২৯, ৩১ সালে অনুবাদে প্রকাশিত রবীন্দ্রসাহিত্য ১৯৬১-তেই পুনঃপ্রকাশ হয়ে উঠেছে। "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দেশের যে সব আইডিয়া ও চিন্তাধারা প্রকাশ করেছেন, আমরা সবার প্রতিই মনোযোগ দিই।"

এই [illegible] সার্থকতাই যে সাহিত্য, একথা [illegible] রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন না। ১৯৩০ [illegible] রবীন্দ্রনাথের মধ্যে [illegible] সমালোচকদের আলোচনায় এই প্রসঙ্গ প্রতিফলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শনী ছিল, তাঁর ছবি সম্বন্ধে সবাই কৌতূহলোদ্দীপক। ওখানকার সমালোচকরা আকর্ষিত হয়েছিলেন। তাঁরা এসে কথা বলেছিলেন, [illegible] শিল্পের। তাঁর ছবিতে আছে বলিষ্ঠতা। তাঁর ছবির উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে যৌবনের উদ্দীপনা।

একটি ছবি দেখিয়ে সমালোচকরা জিজ্ঞাসা করলেন, এই ছবিটির আইডিয়াটি কী?

রবীন্দ্রনাথ: কোন আইডিয়াই নেই। এ একটি ছবি। আইডিয়া থাকে কথায়, জীবনে নয়।

সমালোচক: আপনার ছবির কোন নাম আছে কি?

রবীন্দ্রনাথ : কোন মানুষ নেই যেন মানুষের কথা ভাবতেই পারবে না। এরা কীভাবে বর্বরতা ঠেকাবে?

কিন্তু ২৩ সেপ্টেম্বর এক স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সংবর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনের পরিচয় দিলেন এভাবে :

প্রথম যে জিনিসটি নজরে পড়ে সেটি হল শিক্ষার বিস্তার : আপনারা যে আলো আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে এখনো প্রবেশ করতে পারেনি। মানুষের মনে গভীর আনন্দ সঞ্চারিত করে। আমাদের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত চলে যায়, আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এক দিন থেকে আরেক দিনে। জীবনের অন্ধকার পথ পেরিয়ে এমন মুহূর্তে এসে মনে হয় যে আনন্দ দেখেছিলাম তার বর্বরতা হতেছে বনিয়াদিতে। কবি বলছেন তাঁর গভীর মনের মধ্যে সেখান থেকে বেরিয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় জিনিসটি দেখেন। তাতে একটি নারী ছিলেন যাদের তার প্রশংসায়, তার বলার প্রবণতায় প্রশ্নটা যা বলতে সে সবই কি সত্য? সে বারবারই ছিলেন বলতে এটি সবই সত্য। এটি হল বিস্ময়।

সেক্সপীয়র বিষয়, ছবি প্রসঙ্গ আইডিয়া ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ বিশ্লেষণ করে যে উত্তর দিয়েছিলেন, কবিতা প্রসঙ্গে সেই বিশ্লেষণ না করে বিবৃতি আইডিয়াটি বলেছেনই। এটা হতে পারে, তাঁর ছবির বিষয় কী তা তিনি নিজেই জানেন কি, ভেবেছেন ছবি শুধু রং আর রেখার ব্যাপার। কিন্তু আর চাইতেও বড়ো ভাবার কথা হচ্ছে এই, ছবির ভাষা সার্বজনীন, কিন্তু কবিতার ভাষা বিশেষ লোকের। বাংলা বা ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ রুশদের কাছে বাংলা বা ইংরেজি কবিতা পড়তে দিলে তিনি ভাবতে বাধ্য হতেছিলেন, কবিতায় বিশ্বাস কী এবং কেন উদ্ধার পেয়েছিলেন। ছবির ব্যাপারে এই বাধ্যতা ছিল না, অতএব তিনি বিশ্ব সাম্যবাদে বরিয়ে বেঁচে গেছেছিলেন।

সোভিয়েত বিষয়ে সোভিয়েতের চিন্তা-ভাবনা কী, তা রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত মানুষ দের কাছে খুব অবকাশ পান নি। কিন্তু পারস্পরিকভাবে অনেকটাই পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে তখন ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে বই, ম্যাগাজিন, প্রবন্ধ, ছবি, পোস্টার পাঠিয়ে এসেছেন। অবশ্য সেগুলো না পৌঁছলে রবীন্দ্রনাথ সেকথা জানাতেন তখনই। ১৯৩১ সালে ইং, আরিয়াম জানালেন, "আপনাদের পাঠানো সব রইলো তিনি আনন্দের সঙ্গে পড়েন।" এই বইগুলোর মধ্যে আছে Soviet Culture Review, সোভিয়েত সিনেমা, International Literature, ১৯৩৪ সালের International Literature-এর প্রকাশিত সাহিত্যের উপর প্রবন্ধটি প্রতি এই পত্রিকার সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন (২৮শে জানুয়ারী ১৯৩৮)। ঐ সম্পাদক ৩১শে জুলাই ১৯৩৮ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আবার আকর্ষণ করেন 'প্রগতিবাদী ইংরাজী সাহিত্য'-এর দিকে। এই বছরই সম্পাদক জানতে চান এটা জিনেবা, যেমন রুশ সাহিত্য তিনি পড়েছেন, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা কী? তাছাড়া ফ্যাসিবিরোধী সাহিত্য সম্পর্কে তিনি মতো মতোই জানতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ কী ভাবছেন।

বিশ্বপরিচয়ক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত থাকাই স্বাভাবিক। এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের পরিচয় :

১৯২৬, ২০ জুলাই : মুসোলিনীর ইতালির ফ্যাসিস্ট চরিত্রের সমালোচনা করে সি এফ আ্যাণ্ড্রুজকে চিঠি, ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে প্রকাশিত।

১৯৩১ : আঁরি বারবুস, রমাঁ রোলাঁ, আইনস্টাইনের উদ্যোগে প্যারিসে ফ্যাসিজম-বিরোধী সঙ্ঘ। রবীন্দ্রনাথকে লেখা বারবুসের চিঠি এবং এই ফ্যাসিজমবিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের সমর্থনসূচক চিঠি; বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলিতে জুলাই ১৯৩৭এ প্রকাশিত।

১৯৩৭ : স্পেনে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে, রোমাঁ রোলাঁর নেতৃত্বে গঠিত বিশ্বব্যাপী League Against Fascism and War-এর ভারতীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন রবীন্দ্রনাথ। বারবুস, রোলাঁ ও রবীন্দ্রনাথের ছবি এবং আবেদন সহ একটি প্রচার পুস্তিকা বের হয় : Spain।

১৯৩৭ অক্টোবর : জাপানের চীন-আক্রমণ। ফ্যাসিস্ট জাপানের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ। চীনবিরোধী বক্তব্যে প্রতিবাদ।

১৯৩৮ আগস্ট-সেপ্টেম্বর : জাপানের ফ্যাসিজম্ বিরুদ্ধে নোগুচির সঙ্গে তর্ক।

৩১শে অক্টোবর : নাৎসীদের চেকোস্লো-ভাকিয়ার উদ্দেশে 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতা।

রাশিয়াতে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং পরবর্তী দশ বছর তাঁর রাশিয়ার বুদ্ধি-জীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল অনুবাদের মাধ্যমে। সুশোভন সরকার প্রভৃতির সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। যেহেতু এসব কথা তিনি ও সুশোভন লিখেছেন। বুদ্ধদেব বসুর হঠাৎ-সমালোচনায় সভাপতির সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন, যার পরিচয় আমরা পেয়েছি পাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে, দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ কীভাবে বামপন্থী ভাবার কথা বলেছেন এবং কোন প্রকাশ করেছেন। নেপাল মজুমদার তাঁর 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তা এবং রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছেন।

বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া বলেছিলেন। এবং বলেছিলেন সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আর বিশেষ কিছু দেবার

নেই। যেমন বুর্জোয়া যুগ শেষ। একথা বলেছিলেন তিনি কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় শাখা অধিবেশনে, ১৯৩৮ সালের ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর।

এই অধিবেশনের উদ্বোধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ পাঠান, সেটা সাহিত্য বিষয়ে নয়, সেটা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সমস্ত বিশ্বাসী জাতির আক্রান্তের বিষয়ে।

এর পর ১৯৩৯ এর ১লা ফাল্গুন লিখলেন 'নবজাতক' কবিতা।

তার পর ১৭ মার্চ ১৯৩৯ তারিখে লিখলেন অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠি

তারও পর ১০ জুলাই ১৯৩৯ তারিখে লিখলেন অমিয় চক্রবর্তীকে আর একটি চিঠি।

এই দুটো চিঠি আছে, রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র, ১১ খণ্ডে।

সমসাময়িক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যত রাগে বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধে করেছেন, সেটা এমন কিছু গুরুতর নয়, এমন বিদ্রূপ এর আগেও তিনি করেছেন অনেকবার, যেমন ১৯৩০-এ 'পঞ্চাশোর্ধম্' প্রবন্ধে। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে তিনি অনেকগুলো গুরুতর প্রশ্ন তুললেন। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের কাছে সেগুলো প্রশ্ন নয়, সেবিষয়ে তিনি নিজের কাছে নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর দিয়েছিলেন। তবে প্রশ্নগুলো এই :

(১) চেকভ আধুনিক কল-বিপ্লব-কালের পূর্বকার লেখক। তিনি বুর্জোয়া, তাঁর রচনা প্রোলিটারিয়েট যুগের সমাজের সংস্থিতে বসতে পারে কি না বোধ করি এই প্রশ্ন প্রবল ছিল। আমার আশা ছিল তাঁর চেরি অর্চার্ড নাটকখানির অভিনয় দেখবার সুযোগ ঘটবে। সেটা সম্ভব হোলো না।

(২) আমরা একদার কবিতা যদিও রাশিয়ার নই, তবুও আমাদের কবিতাকে প্রোলিটারিয়েট আদর্শে, তাদের দিকে সে চলছে ভালো কি মন্দ তা বিচার না, তাদের দিকে সে বুর্জোয়া কি প্রলিটেরিয়েট তা নিয়ে।

(৩) আমাদের দেশের একজনকে কতকগুলি সাঁওতালি গান সংগ্রহ করেছিল, জানি নে সে গান বুর্জোয়া কি প্রলিটেরিয়েট। না জেনেও তার মধ্যে কোনো কোনো গান খুব ভালো লেগেছিল। তার থেকে প্রমাণ হবে কি যে, সেগুলো বুর্জোয়া।

(৪) উচ্চতে দিয়ে যখন উপনিষদে ঋষিদের প্রবল প্রেরণার চেয়ে সর্বজনের শীতের আকাশ থেকে নেমে এল তখন প্রলিটেরিয়েট মুক্তি বাণীর আদর্শেই কি তাদের যোগ্যতা নির্ণয় করতে হবে।

(৫) সাহিত্যের প্রলিটেরিয়েট বুর্জোয়া অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক শ্রেণীভেদের চাপ সাহিত্যে যে অদ্ভুত উত্তেজনা আমাদের দেশে দেখা দেল দেখ ঐ একই উত্তেজনার অনীভূত। সাহিত্যে এরকম শ্রেণীভেদ অত্যন্ত দুর্ভর শান্তি নেই, যেমনা অত্যন্ত অসংগত।

(৬) আমরা অর্থনীতি বা রাজনীতিতে যে বলেই লোক হই আমাদের সেই বলাবলি যে সাহিত্যকে বিশেষ ছাঁচে গড়ে তুলবেই এমন কোনো কথা নেই। ব্যক্তি থেকে মানুষের আলোচনা সাধ্য কোনো মতকে মানতে বাধ্য নয়। আমার মতটা হয়তো সোশ্যালিস্ট, আমার কম-থেকে তা ভিতর থেকে প্রকাশ পেতেও পারে কিন্তু জীবনী কবিতাকে সে স্পর্শও করে না। গানের ঠাট আর গানের রচনার প্রকাশ বহন।

রাশিয়ার চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া শব্দের মানে করেছিলেন পরশ্রমজীবী। তিনি নিজেকেও পরশ্রমজীবী মনে করতেন এবং রাশিয়ার চিঠি লেখার সময় রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠিতে আত্মধিক্কার দিয়ে ছিলেন এই পরশ্রমজীবীতার জন্য। কিন্তু এই দুটো চিঠিতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে বুর্জোয়া বলাতে তিনি অসন্তুষ্ট হচ্ছেন। আবার প্রলিটেরিয়েটকে তিনি ভাবছেন সমাজের দুঃখ সাধন পাপ বলে, যদিও রাশিয়ার চিঠিতে বিপ্লবের ভূমিকা হয়েছিল সমাজের নিকৃষ্ট এই প্রলিটেরিয়েটের দিকে।

চিঠি দুটোর প্রথমটাতে রবীন্দ্রনাথ অনুমান করেছিলেন যে চেকভ বুর্জোয়া লেখক বলে চেকভের নাটক তাঁকে দেখানো হয়নি। উদাহরণ 'কল বিপ্লব কালের পূর্বকার লেখক' এবং 'বুর্জোয়া' ছিলেন, কিন্তু তাঁর নাটক দেখানোর তিনি দেখেছিলেন সেই ব্যাপারেই।

আশ্চর্য হবার বিষয়, রাশিয়ার সমাজতন্ত্রে তাঁর নিজেরই অন্য দেশীয় বলে মনে হয়েছিল এই অত্যন্ত অনভীত নিজের নীতির আর সেটাতেই তাঁর নিজের রুচির যে সোভিয়েট আদর্শে তাঁর কবিতার স্বীকৃতির আছে।

তৃতীয়তঃ, মার্কসীয় মতবাদের কয়েকটি প্রাথমিক সূত্র তিনি অনুধাবন করেন নি, যদিও তখন তাঁর দেশে এই বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে। সমাজতান্ত্রিক রচনা বা ভাবও পূর্বকার জীবন চালনার সমসাময়িক রচনাও সাহিত্য এবং সেই সাহিত্যের রসগ্রহণে আধুনিক বুর্জোয়া বা সমাজতান্ত্রিক সমাজেও বাধা হয় না। জীবন ইতিহাস জানাতে গেলে পাঠকের মানসিকতা দিয়ে যাওয়া অনিবার্য নয়।

চতুর্থতঃ, মার্কসীয় মতবাদের যে দুর্বল সূত্র, অর্থনীতির সঙ্গে সাহিত্যের যে সম্পর্ক নয়, সেটা রবীন্দ্রনাথ অবাস্তব কল্পনা বলে মনে করেছেন। অর্থনীতি এবং সাহিত্য

দুটো পৃথক জগৎ, কারণেক্ষে সাহিত্যিক লোকপ্রিয় হক বা না হক, তার সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নেই—এই রবীন্দ্রনাথের সত্যিকার বাসনা।

স্বদেশী সমাজের প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ, কবিতাধিরাজ দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক লেখকদের তুলনায় অনেক এগিয়ে গিয়েছিলেন সত্য। সুতরাং, আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে রাণী চন্দ যখন ২১ মে ১৯৪১-এর রবীন্দ্রনাথের কথা লিপিবদ্ধ করেন, তখন আমরা লেখনী থামাতে বাধ্য।

'আজ যারা সাহিত্যের আসরে প্রলেটারিয়েট, সর্বহারা—এসব কথা বলে চেঁচাচ্ছে। তাদের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে—কোন্খানে তোমরা কাজ করছ। ইঁদিরে বিবিদে কথা বলা না, তোমরা তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছ? সাহিত্যে এসব কথার মধ্যে অন্যথা থাকতে পারে—কিন্তু এটা সেক্ষেত্র নয়। এখানে হাতে কলমে কাজ করতে হবে।...আমাকে বুর্জোয়া বলে—আমি তো করেছি এইসব কাজ। কিন্তু যারা তা নয়। তারা কী করছে।'

রবীন্দ্রনাথ 'বুর্জোয়া' শব্দকে নিন্দাসূচক শব্দ বলে গ্রহণ করেছিলেন। মার্কসীয় মতে অবশ্য বুর্জোয়া শব্দটি নিছক নিন্দা বা প্রশংসাসূচক শব্দ ছিল না, ছিল সভ্যতার ইতিহাসে ক্রমাগ্রসর শ্রেণীর বর্ণনাসূচক শব্দ। কিন্তু মার্কসে শব্দটি মূলতঃ যেভাবেই ব্যবহৃত হোক, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় বাংলাসাহিত্যের আলোচনায় শব্দটি ছিল নিন্দাসূচক শব্দই। বিমল ঘোষ তাঁর 'নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা' গ্রন্থে (ডিসেম্বর ১৯৪০) রবীন্দ্রনাথকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন এইভাবে:

'এইবার নিশ্চয়ই বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনে কেন উপনিষদের অত প্রভাব হয়েছে, কেন তিনি বস্তুবাদ অস্বীকারে অধীর হয়ে সামন্ততন্ত্রের মহাস্থিত প্রতিবেশের মধ্যে, প্রাক পৌরাণিক যুগের মত, ত্রাণ ও মুক্তির পথ আবার খুঁজেছেন, কেন তিনি বিশ্বমানবতার সন্ধান পেয়েছেন, সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজা মহারাজা ও ধনিকগোষ্ঠির, পরোক্ষে ও অন্যত্র পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং কেন তাঁর নিখুঁত কৃপাগ্রাহক সম্প্রদায় পরলোকে স্বর্গীয় প্রীতির মহাকীর্তন করেছে।'

কিন্তু ঘোষের বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ প্রীতিতে এই যাবে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য শুনে যান নি, কিন্তু ঘোষের এই নিরাশ্রয় ভাবনা আক্রমণের সেই একই ভাবনা প্রত্যাক্রমণ করেছেন অমল ঘোষ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরের দিন সত্ত কেন্দ্রী রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে:

এই সব সমালোচকেরা মার্কিস্ট বুলি আউড়িয়ে, অক্ষরের কসরতে Illusion আর Reality-তে গুলিয়ে ফেলে চেঁচাতে শুরু করেছেন---এঁদের মার্কিস্ট কোলাহলে কয়েকটা কাটি করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া, অতএব তিনি ত্যাজ্য। তাঁরা: নূতন সাহিত্য ও সমালোচনায় যাবে এই সব বিভ্রান্তি বোঝাতে চাইছেন আমাদের—আমি আবার তাঁদের কথা উদ্ধার করছি যে—রবীন্দ্রনাথের কাছে 'মানুষ বা জনগণের কথা হয় নি'; তাঁর 'অসার চিন্তাও বোঝে' আত্মার হিসেবে দাম দিত মনের কাঙালি,' তিনি 'বাস্তবের চাকা উর্ধের আবর্তমান মধ্যযুগের নির্জন নির্বাণের প্রকোষ্ঠে বসে আছেন, তিনি 'সামন্ততন্ত্রের মহাস্থিত প্রতিবেশের মধ্যে—মুক্তির আশা খুঁজেছেন'; তিনি 'সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজা মহারাজা ও ধনিকগোষ্ঠির---পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং তাঁর নিখুঁত কৃপাগ্রাহক সম্প্রদায় মানবপ্রেম পরলোকে স্বর্গীয় মহিমাকীর্তন করছে।' এই সমালোচকেরা ভাবাতে চান যে, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ চোখে আঙুলে দেখিয়ে দেন নি এঁদের সাহিত্যের যাথ ঢাকেন না, সেইহেতু তাঁর সাহিত্য সেই যেন যোগাতে পারছে না, যার অভাবে আমাদের দিনে মানুষের মতো বাঁচা আর ঘটবে না।

অথচ হোক এই কথাগুলো বলে সমস্ত দেশের উদাহরণ দিয়ে জানাচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি কোনদিকে, দরিদ্রের প্রতি কী রকম ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও অনেকবার তাঁর ছোট গল্পের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, তাঁর সাহিত্য নিছক বড়োলোকের জন্য নয়।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এখানে নিজেকেই পর্যালোচনা করছেন। গানের কাঠ আর গানের মধ্যে প্রকাশ পেত, যিনি বলেছিলেন, তিনিও বলছেন, ছোটো গল্পের মধ্যেই তাঁর 'সোশিয়ালিস্ট মন' ফুটে উঠেছে।

১৯২০-৩০-এর যুগে বাংলা সাহিত্যে যে সর্বহারাদের নিয়ে গল্প উপন্যাস লেখার চল হয়েছিল, সেটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের খাঁটি মনে হয় নি। সাহিত্যে নবত্ব প্রবন্ধে তিনি ১৯২৭ সালে এই দারিদ্র্য নিয়ে গল্প লেখাকে বলেছিলেন, 'এটা কেবল য়ুরোপসাহিত্যের নূতনত্বের ধার করা অনুকরণে সর্বদাই কাজ চলে এমন ব্যবহার' করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দৈন্যভাবের সাধকে প্রশংসা করেন, প্রবাসীর প্রবন্ধে সেটা থাকলেও পরবর্তী গ্রন্থ সংস্করণে প্রবন্ধটি থেকে এই অংশটি বাদ দিয়ে দেন। দরিদ্রের দিয়ে এই দারিদ্র্যের ক্যাম্প রবীন্দ্রনাথের আরো কাজ লাগে নি: দারিদ্র্য বা কোনো সচিত্র ছিন্নবস্ত্র যদি ওক নবীন বেশে দেখা দেন, তাকে টুপি পরে যে কোনো উপলক্ষেই হোক তবে আমাদের দেশের দৈন্য যাচাই

অভিভূত হয়ে পড়েন অবশেষে যে সব নিরীহ মানুষকে নিজেদের স্বজন বলে ভাবতে চিরদিন অভ্যস্ত তাদের উপর উপনিবেশবাদী শাসিতবর্গ দেশবাসীদের কড়া নিয়ম জারি করে অত্যাচারের তোড়ে ভাসায় করেন।

প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের এই আক্রমণের উত্তর দিয়েছিলেন রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রতিক্রিয়া প্রবন্ধে। তিনি বলেছিলেন, বাংলা সাহিত্যের এই নতুন ধরনের সাফল্যে হয়তো তেমন উঁচু স্তরের না, কিন্তু লেখকদের এই নতুন দলের দিকে দুটি জোরালো কলম, 'বাস্তবতার অলৌকিক কাহিনী অথবা ... কল্পনাকথা আমাদের সাহিত্যে দখল করিয়াছে। জীবনের সংগ্রাম ও উত্থানবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের অতলে অন্ধকারে, হীন-জীবনের প্রতিরূপ ফুটিয়েছি। ইহাকে কেহ যেন ভয় না করেন। অর্থনীতিরও ইহা একটি অধ্যায় নহে। একটা নূতন অভিজ্ঞতা ইহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। মানবজীবনকে আরও বড়, আরও সত্য, আরও সুন্দর করিয়া দেখিবার ইহা একটি বিপুল আগ্রহ।'

শারদ শুভেচ্ছা

বাংলার দুঃস্থ তাঁতশিল্পীদের সেবায় এবং অনুরাগী ক্রেতাসাধারণের স্বার্থে—

—ঃ তন্তুশ্রী ঃ—

কলকাতার দোকানগুলিতে, কর্পোরেশনের নিজস্ব প্রকল্পে তৈরী হস্তচালিত রেশম ও তাঁতবস্ত্রের বিচিত্র সমারোহ।

তন্তুশ্রীর বস্ত্রসম্ভারে আপনার উৎসবের দিন মুখরিত হোক।

বিক্রয় কেন্দ্র—পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র, নয়াদিল্লী, গুয়াহাটি এবং আগরতলা (ত্রিপুরা)

ওয়েষ্ট বেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম এণ্ড পাওয়ারলুম

ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিমিটেড

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা

৬৩, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০১৩

মা

মিহির আচার্য

পড়ার ঘরে অন্ধকারে বসে পূর্ণেন্দু বিষণ্ণ। বাইরে হিন্দোলের কে এক নিয়ে এসেছে তার করুণ সুর। অন্ধকারে যেন ঢেউ তুলে দিচ্ছে।

মনোজিনীর কষ্ট হয়ে আসা চুলগুলো অবিন্যস্ত। অস্তগোধূলির এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে হয়ে গেল। থামছেন। মুখ শুকনো। নিষ্প্রাণ কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে।

গত বছরে স্বামীর মারা যাবার পর ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি প্রাণ দিয়ে আগলে রেখেছেন সংসার। উঁচুতে দাঁড়িয়েছিল বাইরে। মেয়ে বড়ো আগামী বছর বোর্ডের পরীক্ষা দেবে। বড় বি, এস, সি পাস করে আর পড়ল না। ছোট একটা কারখানায় চাকরি নিয়েছে। চাকরিটা উপলক্ষ্যমাত্র, ইউনিয়নের সে একজন ভালো কর্মী। মার আছে, ... ভালোবাসে।

বড়ো ছেলের এই আদর্শবাদিতার জন্য মনোজিনীর গর্ববোধ আছে। আবার ভেবে এই কঠিন যুগে আরো দশজন যুবকের মতো সুখ জীবন কাটাবেনা। সে স্বার্থপর নয়। দশজনের জন্য বাড়িয়েছে তার জীবনধারণকে অর্থপূর্ণ করেছে। ছেলের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস মনোজিনীর। ও শুধু আমার ছেলেই নয়, বন্ধু। ওর চোখ দিয়ে জীবনকে দেখায় গৌরববোধ করেন তিনি।

কিন্তু, এখন এই আলো অন্ধকারে তাঁর সামনে বসে পূর্ণেন্দু। একভাবে অন্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কতদিন এ বাড়িতে এসেছে। দুজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক করেছে, পড়াশুনো করেছে। আর, মনোজিনী বাড়িতে থাকলে তাদের চা-খাবার জুগিয়েছেন। পূর্ণেন্দুর মা শৈশবে মারা গেছে। মনোজিনীকে অনায়াসে 'মা' বলে ডেকে হয়তো মার স্নেহকে বুঝতে চেয়েছে সে। একদিন গম্ভীর হ'য়ে জ্বর নিয়ে এল পূর্ণেন্দু। তারপর অনেক এক বাড়াবাড়ি হয়ে সহজ বাড়ি যেতে পারল না। আকাশ এল। টাইফয়েড। প্রায় মাসখানেক এই বাড়িতেই সে রোগশয্যায় পড়ে রইল। ওর বাবা না কাকারা দু'একদিন এসেছে। কিন্তু মনোজিনী বুঝতে পারলেন রাজনীতি করার অপরাধেই সম্ভবত এই বাঁকের টুকরো ছেলেটাকে কেউ চায় না। আকৃতি বোঝা বলে মনে করে। মা থাকলে এমনটি হত না। আহা, মনোজিনী সেদিন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছেন। রাজনীতি করাকে সবাই কেন আপত্তি করে, বুঝি না। এই দেশে এত সমস্যা, সেখানে রাজনীতি ছাড়া মানুষ আর কী আছে। দেশের কথা ভাবতে হবে না, দেশকে ভালবাসতে হবে না? মনোজিনী ভাবেন, সবাই নিজের নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকলে দেশের মানুষের কথা কে ভাববে? বাঁচা মানে তো স্বার্থপরতা নয়, সকলের জন্য বাঁচা। অমলের বাবাও তাই ছিল। অমলও তাই হয়েছে। পূর্ণেন্দু

আমাদের কেন হবে? সে যেন ঠাট্টা করে বলেছিল: 'এদের রাজনৈতিক পরিবার।' মনোজিনীর শুনে ঠাট্টা মনে হয়নি, বরং দুঃখই বোধ করেছেন। স্বাধীনতার বত্রিশটি বছর তো চোখের সামনেই দেখলেন মনোজিনী। একরকম স্বাচ্ছন্দ্য-সুবিধে পেয়ে দেশের প্রকৃত অবস্থার কথা ভুলে গেছে, যেন মায়ে তাদের কাছে নিজেদের সুখ।

সেই পূর্ণেন্দু পর পর কয়েকদিন এসে অরুণের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া। মনোজিনী চা পাঠিয়ে দিয়ে আর ওদের মধ্যে আসেননি। ওরা ঝগড়া করছে করুক। মনে মনে হেসে বলেছেন, ওরা তো নিজেদের জন্য ঝগড়া করছে না, আদর্শের জন্য। ওদের সমস্যা, মতবিরোধ, ওরা নিজেরাই দূর করতে পারবে। যত বড় দেশের কাজে জটিলতা থাকবে, প্রশ্ন তো থাকবে, সে সব নিজেরাই ওরা মেটাবে। কী যেন কথাটা? 'কাজ করতে করতে চিন্তা করতে হবে, চিন্তাকেই কাজে রূপ দিতে হবে।' অথবা মা পূর্ণেন্দু একদিন কথাগুলো বলেছিল। আর কথাগুলোকে মনে রেখেছেন মনোজিনী। শুধু আবেগ দিয়ে তো দেশের জটিল কাজের সমাধান হয় না! আবেগ ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু যুক্তির ভাঙা না থাকলে এক সময় কোথায় ওরা যাবে! ওরা যে নির্বিবাদে সব কিছু মেনে নেয়না, বিচার-বিশ্লেষণ করে, সেটাই ওদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। অথচ একেকদিন ওদের চড়া গলা রাস্তার ও বাড়ি থেকে শোনা গেলে ধমক দিয়ে ওদের শান্ত হতে বলেছেন বই কী। বলেছেন এই কারণে যে দিনকাল ভালো নয়। দেশের লোকই যে ওদের শত্রু হতে পারে। পারে না? মনোজিনী যেন চিন্তা করে নিজেই উত্তর খাড়া করেন। সাধারণ মানুষের যোগাযোগকেও কিছুটা প্রাধান্য দিতে হবে। দিতে হবেনা? এটা তো করলেই হয়। তাদের বিশ্বাস-যোগ্যতাকে কাজে লাগাতে হবে। কারণ যেদিন এরা ব্যাপারটাকে ওদের যোগশক্তির ব্যাপারের মধ্যে পাবে, তখন আর চেষ্টা করতে হবে না। [illegible] কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। একদিন ওদের বাবার দিকে দিয়ে ওদের মধ্যে ঢুকিয়ে পড়েছিলেন মনোজিনী। মনে পড়ে। অরুণ বোঝাতে চাইছিল: 'জনগণ এখনো এই পথটাকেই বিশ্বাস করে। যতদিন না তাদের বিশ্বাস কাটছে ততদিন আমাদের অন্য পথ ধরবার উপায় নেই। সেটা হবে হঠকারিতা, ভুল।' পূর্ণেন্দু মান দেয়নি। জবাব দেয়: 'জনগণের দোহাই পেড়োনা। কোনো দিন কী তাদের সামনে বিকল্প পথ রাখা হয়েছে? স্বাধীনতার পর থেকে আমরা আজো এমন কিছু করলাম না যাতে লোকে ভাবে [illegible] ব্যবস্থার পরিবর্তন চাই।' অরুণ যেন কী বলল? বলল: 'সেন্টিমেন্ট। তার মানে অ্যানার্কির ভূমিকা আমরা নেবো?'

পূর্ণেন্দুকে আবো অন্ধকারে পাথরের মূর্তির মতো দেখাচ্ছে। রুক্ষ চুল, শীর্ণ মুখ, আর ওর চোখের ভাষা পড়তে চাইছিলেন মনোজিনী। এত দীর্ঘকাল আর এ বাড়িতে আসেনি পূর্ণেন্দু। বাইরে ওদের যোগাযোগ ছিল কিনা তাও জানেন না তিনি। অরুণের মুখেও এই দীর্ঘ সময় পূর্ণেন্দুর কথা শোনেননি।

'কে?'

'মা, আমি—' চাপা গলা।

'চমকিয়ে দিলে। সন্ধ্যার আগে ফিরতে পারিসনে।'

'একটু দেরি হয়ে গেল, মা।'

মনোজিনী লক্ষ্য করলেন এই যে দেরি করে ফেরার জন্য মেয়েকে বকলেন এই কটাবারেও পূর্ণেন্দু নড়ে বসেনি। যেমনি পাথরের মতো কঠিন, স্থির।

মনোজিনী অন্য সময় হলে মায়াকে কারণে মেয়েকে বকতেন না। আজকে সামনে পূর্ণেন্দুর [illegible] অস্বস্তি, পরিস্থিতির চাপ থেকে সরিয়ে [illegible] পাবার জন্য তিনি [illegible] একটা আয়োজন খুঁজে বের করেছিলেন। কিন্তু কোনো কাজ হল না।

পূর্ণেন্দু যদি রুক্ষ হত, যদি চিৎকার করে এতক্ষণ কথা বলত তাহলেও অনেক স্বস্তি পেতেন মনোজিনী। সে ঠান্ডা গলায় কথাগুলো বলে গেল, একটুও না-হেসে, না উত্তেজিত হয়ে। যেন কঠোর প্রতিজ্ঞা অন্তরের ভেতর থেকে [illegible] একটা একটা করে উঠে আসছে। আর, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূর্ণেন্দুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] মনোজিনী থাকবেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] আমার [illegible] আছে। তাই পূর্ণেন্দুর [illegible] [illegible] দরকার নেই, দরকার [illegible]। পূর্ণেন্দু সোজা থেকে [illegible] না বলে [illegible] সেই রাস্তা। সে কাজে মানুষ আমার কাছে নিজের সন্তানকে দূর করে আবর্জিত হচ্ছেনা। সেখানে পূর্ণেন্দুর অধিকার আছে।

'একটু বোসো। আমি আসছি'

মনোজিনী স্বাভাবিকভাবে হাসতে কিছু খেতে দেবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ভেতরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। জোরে নিশ্বাস নিলেন। তারপর মায়া দুর্ঘটনার [illegible] [illegible] [illegible]

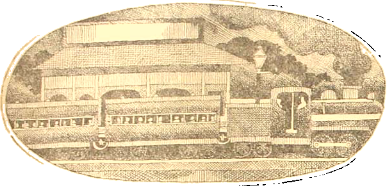

"ভবানীপুরের তেতলা বাড়িতে
আলাপ চলছে সরু মোটা গলায় —
এবার আবু পাহাড় না মদুরা,
না ডালহৌসি কিম্বা পুরী,
না সেই চিরকেলে চেনা লোকের দার্জিলিঙ?।"

যেখানেই যান না কেন,
আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।

পূর্ব রেলওয়ে

কৌশলে উঠল তাঁর। বড় বড় ফোঁটা অপমানের মতো তাঁর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। যার কাঁদা চলে না। কাঁদা একটা দুর্বলতাই নয়, এই ভেবে এক হাতে চোখের জল মোছেন, আর অবর্ণন কাঁদেন।

একটু পরে শান্ত হয়ে এক কাপ চা নিয়ে আবার হাজির হলেন পূর্ণেন্দুর কাছে। পূর্ণেন্দু তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে বাইরের জমাট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে।

কেমন ভাবে মনোজিনী ওর অস্থিরতা জানেন। পূর্ণেন্দুর রাগে, অসহের রাগে, বিরোধও রাগে।

'পূর্ণেন্দু।'

'উঁ—'

'চাটা খেয়ে নাও।'

পূর্ণেন্দু চায়ের কাপ হাতে তুলে নিল। ওর আঙুলগুলো একটুও কাঁপল না। একটু অস্থিরতা নয়, চঞ্চলতা নয়।

'এমনও হতে পারে তোমাদের কোথাও একটা ভুল হয়েছে।' মনোজিনী একটা কিছু আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করলেন।

'ভুল!' পূর্ণেন্দু যেন শব্দটা নতুন শুনল।

'ভুল কী হতে পারেনা? তোমার ভুল?'

'ভুল হতে পারে। হওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক নয়।' পূর্ণেন্দু ঘুমের মতো উচ্চারণ করল: 'একটা বড় কাজে ভুল হতে পারে। আমারও হতে পারে, ওরও। সেটা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু এক পক্ষ যদি দাবি করে সে-ই শুধু, অন্য পক্ষের সবটাই ভুল তাহলে এই ভুল থেকে কারুরই কোনো শিক্ষা নেবার নেই।'

'না, তা কেন?' মনোজিনী উত্তর খুঁজে পেলেন না।

'ও যখন আমায় সমালোচনা করে তখন আমাকে শত্রু বলে চিহ্নিত করে।'

'শত্রু!' মনোজিনী আবার অবাক হলেন যোগেশ, বিস্ময়।

'হ্যাঁ শত্রু। অথচ ওর এমন কোনো দলই নেই যাতে সে বলতে পারে ওর দলই ঠিক। অধিকারই আমাদের বিচারক। ওরা আমারও। শেষ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবার কোনো অধিকারই আমাদের নেই।'

মনোজিনী নিশ্চুপ। একটা আবেগ তাঁকে স্থির করে দিল।

পূর্ণেন্দু আপনমনের মতো বলে যায়: 'আমার অপরাধ ওরা যা বাইরের মানুষ অথচ কাকে কাছে না আমরা তা হতে কাজে লাগতে পেরেছি। তাহলে আমরা শত্রু হলাম কী করে? দলে আর কাদের মধ্যে সংগতি আনতে হবে না? তার চেষ্টা করতে হবে না? সর্বজনীন হাওয়া তো আছে, সে সবাই নিশ্চয়ই চলবে। আমার অপরাধ আমি প্রতিপক্ষের রক্ষিতে চাই। কিছুদিন থেকে ওদের রাজনৈতিক প্রাণ নিচ্ছি। সংগঠন আত্মসমালোচনা করছে না প্রতিপক্ষের সর্বনৈতিক বাইরে ব্যক্তিগত শিক্ষা নেয়া হচ্ছে না? শুনুন, আমি কী অন্যায় করেছি? ও আমাকে প্রতিপক্ষের সামনে ছোটো করে, সমস্ত শিবিরে খুঁজে বেড়ায়? শুধু তাই নয়, গতকাল সে একরকম জোরে আমায় শিবিরে ঢোকাতে দিয়েছিল, ওরা আমাকে খুনও করতে পারত।'

মনোজিনী আর্ত চিৎকার করে উঠলেন।

পূর্ণেন্দু বলল: 'এটা যদি আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার হত তাহলে আমি আপনাকে একথা বলতাম না। এর মধ্যে একটা বিধান, পদ্ধতি জড়িত, দলের অধিক সংবাদ মেটে যাওয়া বাইরের স্বার্থ···। ব্যক্তি হিসেবে অজয় বা পূর্ণেন্দুর এখানে কোনো প্রশ্নই নেই। আমাদের কোনো আত্মদ্বন্দ্বই বিচ্ছিন্ন কোনো অস্তিত্ব নেই, তার সঙ্গে বৃহত্তর মানুষের ভবিষ্যত জড়িত।' একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে পূর্ণেন্দু শেষ করে: 'অথচ সে আমাকে শত্রু ভাবে! ওদিকে ওর আর আমার যে আসল শত্রু সে নিরাপদ দূরে থেকে হাসে। জানে সে জানে আমাদের এই পারস্পরিক অবিশ্বাসই ওদের আয়ুকে দীর্ঘ করবে।'

পূর্ণেন্দু উঠে দাঁড়াল। খদ্দর পাঞ্জাবি পরল। এবার মনোজিনীকে অন্ধকার বুকে ফেলে রেখে সে হঠাৎ দূরে বাইরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গভীর নিশুতি রাত বাড়ে। রাত অধিক রাত জাগতে পারে না। সে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরে অন্ধকার জিভ দিয়ে চাটছে। দূরে কোথায় একটানা ঝিঁঝিঁ ডাকছে। অজয়ের ফেরার সময় হয়েছে। ও এই ঘরে ফেরে এসে কোনোদিন দুশ্চিন্তা করেন নি মনোজিনী। ছুটির পরও তাকে ইউনিয়ন আপিসে কাজ করতে হয়।

অজয় এখন এসে পড়বে। আজ ওর আসার দুশ্চিন্তা নতুন করে ঠেকছে মনোজিনীর কাছে। আর, চারিদিক, জেগেয়। অজয় আসার আগে, আবারি বকেয়ারে··· বিধান ফেললেন মনোজিনী। রোজকার মতো আজও ওর ঘরে খাবার ঢাকা। অজয় ঘরে ঢুকে অপেক্ষা করতে বারণ করে। তাই অনেকদিনই মনোজিনীকে খেয়ে নিতে হয়। নিজের ভালো না। অজয় যতক্ষণ না ফেরে জেগে থাকতে হয়। অধিক ওর বাইরের দিকের দরজাটা ও চাবি দিয়ে ও দিকেই খুলে আসিতে ঢোকে। আজ মনোজিনীর মনে হচ্ছে দুটো যদি কোনোরকমে শেষে যেত তাহলে বেঁচে যেতেন। পূর্ণেন্দুর সঙ্গে এতক্ষণ কথাবার্তার পর তাঁর ক্লান্তি লাগছে। ক্লান্তি আর ভিক্ষা। কিছু একটা যেন চুরি হয়ে গেছে। বাড়ীর প্রকোষ্ঠে

যেন বন্দুক করে রাখছে। মানুষ মানেই একটা দায়িত্ব, মনোজিনী বিশ্বাস করে বললেন। কিন্তু মানুষের কি এমন মানুষের গৌরব বোধ করে! অথচ, আমার ছেলে, এর কাজকর্মের দায়িত্ব কী সে একাই বহন করে, পরিবারের থেকে তার কী কোনো আলাদা অস্তিত্ব আছে। সে কী নিজেকে স্বাধীন মনে করে? 'স্বাধীন' শব্দটাকে উদ্বেগের সঙ্গে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন মনোজিনী। একই পরিবারে বাস করে তার মধ্যে কী কোনো স্বাধীনতা থাকে, থাকতে পারে! সে কী ভাবে না সে একজনের ছেলে, একজনের ভাই। এই সম্পর্কগুলোকে সে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না। পারলে তাকে পরিপূর্ণ স্বাধীন হতে হয়। এ বাড়ির কেউ নয়। মনোজিনীর মুখের রেখা কঠোর হতে লাগল। শুধু মনের ভেতরটাই সাধিকারহীন হতে নয়।

অজয় এখনো বাড়িতে পা দেয় নি। হয়তো আজ দেরি হচ্ছে। আর এই দেরিটাই আশাতরা শক্তি দিচ্ছে মনোজিনীকে। কি করে তিনি মুখ দেখাবেন অজয়কে। এত দিনের অভ্যাস একটা ভবিষ্যৎ যে আমি ভেঙে দিয়েছি। অজয় হয়তো ভাবতেও পারে যে পূর্ণেন্দু তার বাড়িতে আসতে পারে। অজয় ঘটনা তাকে জানাতে পারে। তার বাইরের কোনো আচরণে যার কাছে যে অনধিকারচর্চা করতে হতে পারে সে কথাও ভাবতে পারে নি। অথচ, অজয়, তোমার আজ উচিত ছিল না কি, তুমি আমাদের একজন, তুমিও এই পরিবারের অন্তর্গত। সেই দাবিতেই তুমি এ বাড়ির একজন।

চিন্তাগুলো এখন জট পাকিয়ে যাচ্ছে মনোজিনীর মনে। অথচ জট নিয়ে বাস করা যায় না, পরিষ্কার করতে হবে। খাঁচাটা অস্পষ্ট হলে চলে না। প্রত্যক্ষ, বাস্তব হওয়া চাই।

আমি জানি বিশ্বাস না করলে পূর্ণেন্দুর বিষয়টা অজয় আমাকে বলবে না। বিশ্বাস করলে নিশ্চিত উত্তর দেবে: 'বাইরের ব্যাপারে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই।' তার মানে যেন রাজনীতিটা উচ্চারণের বস্তু, তা আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরা বুঝতে পারবে না। যা সবার ওপরে অদ্ভুত ধারণা। আসলে যার প্রকৃত অর্থ নেই। যেন ছুরিকা মুখের সামনে ধারাল এগিয়ে দিতে পারলেই সব দায়িত্ব চুকিয়ে যায়।

চিন্তার জেদ শক্ত মনোজিনীর। পরিচিত শব্দ। ওর পায়ের শব্দের সঙ্গে যেন মনোজিনীর নাড়ী জড়িয়ে রয়েছে। অজয়, আমার সন্তান, অজয়...

হাঁ অজয় দরজায় উঠে এসেছে। ওর ঘরের তালা খুলেছে। আলো জ্বলে উঠল ওর ঘরে।

পাশের ঘরে অন্ধকারে প্রেতের মতো মনোজিনী! নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। জেগে তোলার বাধা হচ্ছে। ভোঁতা অনুভূতি।

অজয় চলে গেল। ফিরে এল। এখন খেতে বসেছে।

মা জেগে আছে কিনা জানবার প্রয়োজন নেই। কিংবা দাদাদিদের ধকলের পর রাতে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে দেখতে চায় ও। যার ওপর ওর প্রভুত্ব না কিনা। ছেলেরা বড় হলে বিদেশীর মতো করে থাকে কেটে দেয়। মা যে একটা সত্তা, আমার থেকে তোমার আলাদা কর নয়, বুঝতে পারে না'।

এখন খাওয়া হয়ে গেছে নিশ্চয় অজয়ের। ঘুমোতে ওর দেরি হয়। রাত জেগে পড়াশোনা করে। দাদাদিদের এইটেই তার পছন্দ নয়।

অন্ধকারে নির্জীবের মতো পড়ে থেকেও ঘুম আসছে না। আলো নেভে নয়। মুখের রেখাগুলো কঠোর হয়ে উঠছে। চোখ জ্বালা করছে।

মনোজিনী উঠে দাঁড়ালেন। দুর্বল হলে চলবে না। তিনি মা। মায়ের দায়িত্ব, গৌরব...।

'অজয়—'

'মা।'

'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'এত রাত্রিতে। এখন।'

'হাঁ। এই তার সময়। সমস্ত পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন একজন মা আর তার সন্তান মুখোমুখি।'

'মা—'

'পূর্ণেন্দু এসেছিল।'

'মা—'

'আমি সব জেনেছি।'

'পূর্ণেন্দু এ বাড়িতে আসতে সাহস পেয়েছে!'

'পেয়েছে। যেমন তুমি পেয়েছ।'

'মা।'

'মা কিছু জানে না বলেই তোমাকে এতদিন সাহস দেখাতে হয়নি।'

'পূর্ণেন্দু তোমাকে আমার বিরুদ্ধে লাগিয়েছে। তুমি ওকে প্রশ্রয় দেবে বলে...'

'অজয়! আমরা মা-ছেলে কখন দুজনে কাকে প্রশ্রয় দিই সে তোমার বোঝার কথা নয়।'

'আমি চাইনে যে পূর্ণেন্দু এ বাড়িতে আসুক।'

'সন্তানের অধিকার বলেই কী তুমি আশা করো এ বাড়িতে তোমার রাজত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করেছ?'

'মা, পূর্ণেন্দুর পক্ষ নিয়ে তুমি আমার ওপর শুধু শুধু রাগ করছ। জানো, ও কী করেছে? একটা ক্রাইম...'

'তোমাদের কাজের সঙ্গে না মিললেই রাতারাতি একজন ক্রিমিনাল হয়ে যায়। জীবনের বিচার অত সহজ নয়। আমি পূর্ণেন্দুকে

বা মনে করিবে। এ বাড়ির একটা ইট-কাঠও তা মনে করে না। এ বাড়িতেই একদম হয়ে তুমি আমাদের মত লোকের করতে পারো না। তাহলে এ বাড়ি থেকে তোমার সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করতে হয়। তোমার স্বাধীন মতের বাহির তুমি আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারো না।'

অজয় আশ্চর্য বেদনায় বলল, 'মা, তুমি আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছ?'

সরোজিনী বললেন, 'আমার সাধ্য কী তোমাকে তাড়িয়ে দিতে পারি। তোমার নিজস্ব মতই তোমাকে এ বাড়ি থেকে আলাদা করে দিয়েছে। আজ রাত্তিরটা কোথায় যাবে এখানেই থাকো। সকালে আলো ওঠবার আগেই তুমি চলে যেও। যাবার সময় তোমাকে না-দেখতে পেলেই সব দিক থেকে ব্যাপারটা শোভন হবে।'

'মা, তুমি আমার ওপর অবিচার করছ'

'আমি না', সন্তানের প্রতি অবিচার কোনো মা-ই করতে পারে না। আমিও করিনি। এখন থেকে আমাকে উদ্বেগ-দুশ্চিন্তায় কাটাতে হবে। তোমার, পূর্ণেন্দু দুবেলাই নিরাপত্তার অভাব, যে আজে পোষা গুণ্ডারা সবসময় ঘুরছিল ওদের বুকে ছোরা বসিয়ে দেবে। ...যা হওয়া একটা বাহির, তোমার যা বুঝতে পারছি না...।

সংস্কৃতি সংরক্ষণ বিষয়ক

সিদ্ধার্থ ঘোষ

অফিসটা খাঁ খাঁ করছে দেখল সেনগুপ্ত। ঘড়ি দেখার মতন তাকিয়ে নিল আরো আধ ঘণ্টা এই অবস্থাই থাকবে। গট-গট করে ঠেলে ঢুকে পড়ল। না, ধুলো ঝেড়ে বসার বিড়ম্বনাটা পোয়াতে হবেনা। হাইনাস-এর অন্ততঃ 'সরকারী অফিস' চেহারাটা বদলায়নি।

সেনগুপ্ত এখনো বসেনি। চার বছর পর এই অফিস ঘরটাকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। অপরিচিত লোক দেখলে ভাববে অফিসে নতুন জয়েন্ করেছে কিংবা সদ্য বদলি হয়ে এসেছে। টেবিলের ওপর কাচের দুপাট ফাঁসিয়ে দিচ্ছে, যা দিয়ে গতবারের কোন প্রতিযোগিতার পুনরাবৃত্তি হয়নি। খুশিতে ছিল সেনগুপ্ত।

দেওয়ালের গায়ে ফ্রিজের বোর্ডটার ওপর চোখ রেখে একটা সিগারেট মুখে গুঁজে নিল সেনগুপ্ত। অফস ধরবার তোড়জোড়। লাল ও সবুজ-মাখা শিল্প ধারা। একটা বিরাট পোস্টার, আধুনিক-তম—বেকার যুবকদের নিয়োগ প্রকল্প। শিল্পীর লেটারিংয়ের হাতটা ভাল! কিন্তু সেনগুপ্ত যা খুঁজছে নেই। অমনোযোগ বশতঃ দশ বছর পার করে দিয়েছে, শেষ দু' বছর অবধি, তাতেই চোখ তো আর ধরের দৈন্যতে বর্ণরাজী হবে চাইবেই। বোর্ডটার একেবারে মাঝখানে চমৎ কাটিং মাসের চটীর পত্রিকাদের বসন দেখেছে, তাকে দুর্বলতা তার বুকের ওপর প্রায় চড়ে বসেছে। সেনগুপ্ত পত্রিকাদের চতুর্দশী আবর্জনা দূর করে, কাঁচি হাতে চলমানটাকে খুলে চোখ দিয়ে আলে উত্তরণের কাছে। রাজ্যের সংবাদ অফুল খুঁজছে। তবে এখানেই থাকে। এটা অবশ্য পোকা কথা, কিন্তু যা দিয়ের চোখে দেখে এসেছে সেনগুপ্ত চারপাশ পোকা কখনও খায় কেটে গেছে অনেক। ট্রাফিক আইন করায় ম্যাপচিত্রে তা আগের কোথেকে! অথচ কথা হ'লো যাতে যে অন্তর আদিবাসী বর্ণমালার সন্ধান পাবে? সেনগুপ্তই কি পরের দিন আগে আমাকে সাঁওতাল পরগণার মস্তাপাহাড়ীতে কি রোমাঞ্চ আছে। কিন্তু সেটা বা আমার অনেক কারণ রয়েছে। অমনোযোগ অভিবক্তার কর্মক্ষেত্র হেড-অফিস, টোটাল প্ল্যানিং-এর কাজ। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যেই তো আঞ্চলিক অফিস হয়েছে। আশ্চর্য, রাজ্যবর্গের কোথাও কোন জায়গায় ওপরেই লাল ফুটকি পড়েনি ম্যাপটাতে! ইডিয়ট্স! অথচ সেনগুপ্ত এখানে বসেও দেখতে পাচ্ছে লাল-কালোর অজস্র ঢোল বাজছে যেন সবুজ ঢেউয়ের মাথায় মাথায়। চুলে আঁকা ফুল গুঁজে হাতে হাত ধরে গান গাইতে গাইতে এগোচ্ছে। সাঁওতাল পরগণার মস্তা-পাহাড়ীতে বারো বছর কেটেছে সেনগুপ্তের, আর সেই দেখাই তাকে সচেতন করিয়ে দিয়েছে যে তার এক্তিয়ারের মধ্যে প্রাগৈতিহাসের গন্ধ-মাখা ধ্বনি যৌবন আছে। মস্তাপাহাড়ীর মহুয়ার নেশা যেন আজ তার কাটেনা। শাল-পলাশের বন, মস্তা বিছানো পথ, সিঁদুরে রাঙা পাহাড় আর বারো পরবের তুফান। আদিবাসীদের বনজোৎস্নার কবিত্ব বর্ণনায় আছে, আর সাঁওতালদের বারো পরব আছে বাঁশিতে মাদলে, নৃত্যে, নাচে গানে, তীর ধনুকে অন্যটিতে। কার পক্ষ আগে দাঁড়িয়ে হাত ছিন্ন করতে পারে দিয়ে—খেলায় জীবনে একাকার। আবার যাবে সেনগুপ্ত, এবার নোটবুকই পাবে, এবারের সময়।

'পরে—চায় আনবো?'

সাঁওতাল পরগণা থেকে ফেরে আসল ঘাম বোঝা যা।

'হ্যাঁ—চা দিয়ে যা আর বেয়ারিজা-বাবুকে ডেকে দিস্।' সেনগুপ্ত চেয়ারে বসে ওপরের ফাইলটা টেনে নিল।

'কোই বাবু তো আভি আয়েনি।' কাঠের পার্টিশানের আড়ালের বেঞ্চিতে টি-পট্ টাকে ধন-দোলাই করতে করতে বা জানায়।

ঘড়ির দিকে তাকাল সেনগুপ্ত। আসার সময় হয়ে গেছে। 'এলেই যেন দেখা করে।'

সেনগুপ্ত ফাইলে মন লাগাতে শুরু করে।

'আওর ক্যা?'

'নাহ্ হেন্। এক মিনিট র'সো, ফাইল দুটো ছেড়ে দিচ্ছি।'

দেবাশিস চেয়ারের ওপাশে বসেছে। মাঝামাঝি জনক-চারেক ফাঁকেও সেনগুপ্ত দেখতে পায়। আনুষ্ঠানিক ভিন্ন করছে। হাত দুটো টেবিলের ওপর রেখে আবার নামিয়ে নিয়েছে। একটা ফাইল রয়েছে কোলের ওপর। দেবাশিসের স্টাইল কাজেটা সেনগুপ্তর পছন্দ হয়, এর মধ্যে মাত্রা আছে। অথচ সেনগুপ্ত ভুতুড়ে হলে আসতে পারত অতীতের ঘটনার মতোই সব আছে না তখন এবং ভেবে সম্ভবতঃ খুশি হতে পারত না।

'ওক্, পনেরো দিন আসিনি হাতেই একেবারে—' সেনগুপ্ত চেয়ারে ঠেস দিয়ে পিছনে হেলে পড়ল। 'আরে, তুমি যে দাঁড়িয়ে—ওদিকের পাখাটা অন্ করে দাও না।'

'না না—ঠিক আছে!' দেবাশিস কপাল মুছতে পকেট ভুল করে উঠে দাঁড়াল।

'আর বাবে, মোটের ওপরটা। হাঁ—হাঁ—তারপর? বলো!' চশমাটার কাচ মুছতে মুছতে তাকাল সেনগুপ্ত। বিনা চশমায় চাউনিতে চোখের তারাদের ঘটিয়ে দিয়ে দেবাশিসকে কোথাও আনতে হচ্ছে।

দেবাশিস কনুই দুটো টেবিলের ওপর রেখে আরেকটু এগিয়ে বসে, আবার হাত নামিয়ে নেয়, শেষে গলা খাঁকরে ছোটো গলায় বলে, 'আপনি ডেকেছিলেন স্যার?'

'হ্যাঁ। কি খবর এখন?'

তাড়াতাড়ি হাতের ফাইলটাকে সমর্পণ করে দেয় দেবাশিস, 'আপনি বলেছিলেন কয়েকটা নতুন ধরনের বিজ্ঞাপনের খসড়া পাঠাতে। এইটা—'

সেনগুপ্ত চশমা পরে ফাইল তুলে নেয়।

'শহরের বিভিন্ন দোকানে মধ্যে আলোক-মালায় উদ্ভাসিত যে বিজ্ঞাপনগুলি সেটাই সব নয় বিজ্ঞান—'। বিড়বিড় পড়া শোনা যায়।

'বিজ্ঞ... কাজি? বিজ্ঞানটা কি পদার্থ?'

সেনগুপ্তর প্রশ্নোত্তর দৃষ্টি সামনে এই রকম সময় বিশেষেই মানুষ আত্ম প্রভাব মন-শক্তি আয়ত্তে না থাকার অভাব বোধ করে। দেবাশিস কিছুই বলতে পারল না, শুধু আরেকটু সরে বসে বাকি টুকরো অবোধ্যভাবে টেবিলে খুঁজিয়ে দিল।

'এটা কি? বিজ্ঞান...' বিজ্ঞাপনের কাগজটা এগিয়ে দিল সেনগুপ্ত।

'না, মানে বিজ্ঞাপন হবে। ছাপার ভুল।'

'এটা বিজ্ঞাপন তো? ভেবে দেখিয়েছে, নাকি?'

'ইয়েস স্যার।'

স্যার মানে সর্বশেষেই এর করে পয়সা খরচ করেছে। বেশ—বেশ ঠিক্ ঠিক্, নতুন। পাবলিক নাকি, দেবাশিস! তোমার ওপর আমার অনেক ভরসা। তোমাকে আরো টেলিফোনেই ও দিতে হবে।'

'আমি একবার দিয়ে দেখছি স্যার। ক্লিক করাতে যদি ভুল না থাকে তাহলে দিন্ আটেক দেবো।'

সেনগুপ্ত ফাইলটা রেখে টেবিলের ওপর ঝুঁকে বসল। ঠোঁটটা হাত দিয়ে কামড়ে খুঁটিয়ে নিঃশব্দে খাক রাখল, যার মানে না—না—না—, তারপর সেই কথাটাই বলে রাখল, 'কিছু হচ্ছে না!'

'স্যার?'

'বলছি কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। এসবই শুধু কলি—অ্যাস্থেটিক কোন্ কাজটা হচ্ছে বলতে পারো? না না, আমি ইন্টিগ্রেটেড কাজের কথা বলছি না। সে তো দশটা পাঁচটার হাজিরা খাতায় সইয়ের মতো নিয়মিত। যাই না যাই, তুমি আজ কটায় এসেছ?'

'দশটা পনেরো, মানে...'

'না না দেবাশিস, তোমার আমার পনের মিনিট দেরি কথা আর একজন মানুষের তুলনায় ... যাবা, দুই দশমিক যাও, কেমন ভেবেছিলাম। দুধের ফিগারটি ঠেকাই দেখতে হবে। শুধু কথার কথা নয়, কাজ—অ্যাকশান চাই।'

'আমাদের লোকাল অ্যাডের যদি বাজেটটা ...'

'না, আরেক কান দিয়ে যাও?' এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে দেবাশিস আর খেয়াল গেল না।

'শোনো দেবাশিস আমি তোমার একটা কাজের ভার দিতে চাই। তোমার চ্যালেঞ্জ বলে। উৎসাহ ছাড়া কিছু'

'কিসের স্যার?' চোখে চোখের পর এই সময় ... নাম দেখার সুযোগ পেয়েছে।

দেবাশিস নিঃশ্বাস পড়বার সেনগুপ্তর অভিজ্ঞতার কথা শুনল, উৎসাহিত করতে লাগল, উদ্দেশ্য প্রকাশ করে ... পরিচয় পরিবর্তনের সংযোগ ... ভূমিকা নির্ধারিত করতে হবে।

'স্যার—আমাদের কমার্শ্যাল ... একটা ট্রায় তোমার মনে দেখি পারবে। আমি দায় দেব। আমাদের টেন ডেকটার দিয়ে। দিন পনেরো দুই ... করতে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড তুলে দেওয়া যাবে। আর ওপীক... না হয়...'

'ওয়ান মিনিট। তুমি কিন্তু ভেবেচিন্তে ... এর মধ্যে নাক গলিয়ো না। ওরা অনেকেই ইন্ডাস্ট্রিজ তোমার দিয়েছে। কিছু অন্যতো অন্তর্গত হ্যান্ডিক্যাপ্ট, তার লোক পাবার দুঃখে, তাদের দেখা করার এক পরিকল্পনা। আমো তো, এদের ইন্ডিপেনডেন্ট ... ফোন দিয়ে ...—রোজগার এই একই কাজ করে আসছে। বেছে বেছে এই রকম কিছু লোককে চাকরি দিয়ে দিয়ে এসেছে—একেবারে পরিবার শুদ্ধু—'

সেনগুপ্ত কথা থামাতেই দেবাশিস

...পকারার পূরণ করতে শুরু করে দিল। আর ...ফিরতার পরিচয় পেশ করতে পারবে ...রছে। 'বুঝেছি স্যার—আমারও এই আইডিয়া।'

'বেশ! তাহলে তুমি লেগে যাও। পুরো ফ্রন্ট পেজ! ধরো না হয় প্রথম ছেড়ে দেবে আমরা—'

'কভারের পাতায় তো তাহলে দু'টো কি আড়াইটা পোর্ট্রেট করতে হবে।'

'আমার ওপর ছেড়ে দাও। পোর্ট্রেট করা, কোয়ার্টারের ব্যবস্থা—আমার দায়িত্ব। তুমি আগে থেকে চলে গিয়ে শিল্পী সংগ্রহ করো।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার!'

সেনগুপ্ত চেয়ারে ঠেস দেবে ছোট্ট শিস্ দেওয়ার মতো একটা অদ্ভুত শব্দ করে আঙুলের পাঁচ থেকে আসা হুঙ্কারের একটা বিচিত্র মুদ্রা করল। 'যেখানেই যাক—!'

২

যেমা দেখছে সেনগুপ্ত। পঞ্চায়েতের রজতজয়ন্তী উৎসবে সেনগুপ্তকে বিশেষ অতিথি করে এনেছে পঞ্চায়েত হাত অধিকার। বিরাট মেলার আয়োজন করেছে। বাইরে অতিরিক্ত জ্বলছে সন্ধ্যাদীপ। বাজনাদের মেকেলে মুখস্থতার পুতিয়ার মতো হিটলারের কৌতুকের ছবিতে দেখা হচ্ছে—'ও পাখী কৃষ্ণ বলো বা-বা-বা'। এখনোও কম্পানির বাড়ি তৈরির ভাবিষ নিতে নিতে ঘটেছে এ প্রশ্ন কানে এল সেনগুপ্তর। 'ও, আপনাদের কম্পানির নাম একাডেমি জানেন? একাডেমি তো হিমালয়!'—'উঁ তুমি বুঝেছি, হিমালয়ের উপরেও উঠারা কোঠা বানাইছে যে!'

সেনগুপ্তকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে পঞ্চায়েতের অধিকারিক। বেশ ফুর্তিবাজ ছেলে। এক থেকে দেখাবিস্ত্রার কথা মনে পড়ে। জাপানদের দিয়ে সেই উপজাতি নৃত্য ইউনিট গঠন করা। তা আট বছর হবে গেল। দেখাবিস্ত্রার আইডিয়া ফেরার করে-ছিল। পরদূতী দরকার না এলে ওই প্রজেক্ট অ্যাপ্রিসিয়েশনের বিলম্ব না। দেখাবিস্ত্রার এখন প্রমোশন হয়ে গেছে। ডিপার্টমেন্টও বদল হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো সেনগুপ্তর কাছে সে কৃতজ্ঞ। সুযোগটা একেবারে পেয়ে এসে ওর হাতে গুঁজে দিয়েছিল। দেখাবিস্ত্রাও অবশ্য সেজন্য কম করেনি। শুধু তো আট জন শিল্পী সংগ্রহ করে চাকরিতে বসিয়ে দেওয়া নয়, একটা আকাট মূর্খের দলকে চালানো। নাচে, গানে অভ্যস্তের কিছুই তো তখন বুঝত না ওরা। যখন একটা কোয়ার্টার দেওয়া হল, কয়েকজনের সে কোন আটিস্ট বড়ো বেঁধ, টেপ—বোতলা করে—বাপ্ রে! এমন শুধু বাপ মায়াতেই প্রায় একটি বছর লেগেছে। সিনেমা, থিয়েটার, খবর-কাগজ—কোন কিছু বুঝিয়েই আকর্ষণ করা যায়নি। শুধুও যে টিকে গেছল, সে শুধু খাবার লোভে। খাওয়া আর ঘুম। তবে তাতেও মন ছিল না, গাঁয়ে ফেরার জন্যে মাঝে মাঝেই চঞ্চল হয়ে উঠত। প্রথম প্রোগ্রামের সব রিহার্সাল, বিরাট আয়োজন, পাবলিসিটি—হঠাৎ এক দলে আট জন বেঁকে বসল। বাড়া পরবের দিন বাবা-মুখকে পুজো না দিলেই নয়। যেতে যাবেই। কিছুতেই আটকানো গেল না। দেখাবিস্ত্রাকেও শেষ পর্যন্ত ওদের সঙ্গে ছুটতে হল। দু' দিনের জায়গায় চারদিন কাটিয়ে অনেক অনুনয়ে কার্ড-বড় খুঁজিয়ে তবে দলকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল।

পঞ্চায়েত অধিকারিক সান্যাল বলে, 'মিস্টার সেনগুপ্ত, এই স্পটটা খুব ইন্টারেস্টিং। আমরা রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী থেকে কিছু ডুপ্লিকেট পুঁথি দিয়ে এসেছি প্রদর্শনীতে।'

'আচ্ছা!' বলেও উৎসাহ প্রকাশ না করেও সান্যালকে অবহিতি দেখতে চায় না সেনগুপ্ত। আপাততঃ কোন ত্রুটি রাখেনি।

'রামকৃষ্ণ লাইব্রেরীর গ্রান্টের টাকাটা আরো বাড়িয়ে দেবার জন্যেই ওদের বলে-ছিলাম স্টলটা দিতে। তবে তো বোঝানো যাবে যে টাকাটা শুধু নষ্ট হচ্ছে না। কেনার জন্যে দেওয়া হচ্ছে না। মেয়ার অনুরোধে দিচ্ছে তো করা একটা কন্ট্রোভার্সি অ্যাভয়েড।'

'সে তো বটেই। আচ্ছা, ওঁদের কোন স্টল হয়নি?' সেনগুপ্ত প্রশ্ন করে।

'নিশ্চয়! ওই ধারে। দেখবেন?'

'হ্যাঁ, ভাবছিলাম দেখতে হবে, কিন্তু পার্টিসিপেট করা হবে।'

গাড়ি থেকে সেনগুপ্ত এক রকম বাধ্য করল সান্যালকে চায়ের স্টলের বাইরের বেঞ্চিতে আসন নিতে। বড়বাবুদের হাতে ভাড় দেখে চারপাশ থেকেই 'এখানে কেন? এখানে কেন?'—হাহাকার তো আর লোকেদের ভিড় জমাবার মতন ঘটেছিল কিন্তু সান্যাল তাদের দেখার ইশারা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে। গাড়িতে বসে সবার হাওয়া বুকে-মুখে মেখে দু' চুমুক চা খাবার ইচ্ছে জেগেছে সেনগুপ্ত সাহেবের। কিন্তু যা মাঝেই সাত-সতেরো প্রশ্ন অভিযোগ, প্রতি-কারের আবেদন। আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই তো মঞ্চে উঠতে হবে। মেলার শেষ দিন হলেও তবেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেনগুপ্ত আজকের উদ্বোধনী ভাষণ দেবেন।

চায়ের ভাঁড় শেষ করে দু'জনে সরে উঠে দাঁড়িয়েছে হঠাৎ একটা হৈ হল্লা কানে এল। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখা গেল একটা জটলা এগিয়ে আসছে। জটলার আকর্ষণের বস্তু হয়েছে কেন্দ্রস্থলে। বুনো আটের পুরুষ, মাথায় হাত করা বেশী পাখির পোকা, খালি গা, কোমরে মাদল বাটো ধুতি।

সেনগুপ্ত চমকে গেল। সাঁওতালদের মতো দেখতে লাগছে না? পরক্ষণেই ভুল ভেঙে গেল। না:, এমন মনে হল, গায়ের রঙও কালো না হয় কালো-কালো। আর সব-চেয়ে দৃষ্টিকটু মাথার পালকগুলো। সাঁও-তাল নাচ দেখেছে, এক পলকেই চিনে নেবে দেখনদারীদের।

সেনগুপ্তর দৃষ্টি অনুসরণ করে লাহা'ম বলল, 'আমাদের সাঁওতালী নাচ আছে। কলা-কুশলীরা সব সেজে বেরিয়েছেন।'

সেনগুপ্তর ঠোঁটে হাসি খেলে। ইমি-টেশন—ইমিটেশন বিনা কিছুই হয় না। যতদিন সেনগুপ্ত, দেবাদিত্য হাল ধরেছিল, ততদিন—তারপরেই যথাপূর্বং। এরা অবশ্য জানে না যে কতখানি মাথার একটা দামী সাঁওতালী ইউনিট আছে।

সেনগুপ্ত একোণে ওকোণে বলল, 'কিন্তু লাহাবাবু, এদের দেখলাম ঠিক হয়নি। সাঁওতালদের নাচ যারা দেখেছে—তাদের খুব চোখে ঠেকবে। আদিবাসী নৃত্য তো, শিল্পীদের বেশ খাপ খাওয়া আরো যত্নের হওয়া দরকার।'

'হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। ব্যাপারটা অন্-ফিসিয়াল না হলে—'

'তুমি তো অনায়াসে মাথার পালক দিতে পারতে।'

'তাইতো দিয়েছি স্যার। এরা অন-দলের আর্টিষ্ট।'

'না:—ন্যাশনাল! না না, ওদের তো সাঁওতালী ইউনিটই আছে একটা।'

'এক্সক্লুসিভ কি স্যার। এটাই তো সাঁওতালী ইউনিট। আমি নিজে চিঠি দিয়ে ব্যবস্থা করেছি।'

'আরে সাঁওতালী ইউনিট শুধু নামেই নয়, দস্তুরমত সাঁওতালদের দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে।' কথাটা মুখে এসে গেছল সেনগুপ্তর। কিন্তু না বলে ভালই করেছে, সেনগুপ্ত তো জানে না, ইতিমধ্যে সাঁওতাল ইউনিটের শিল্পীবৃন্দের মধ্যে বিলক্ষণ আনা-গোনার মহকুমা শাসকের বদলির মতো হাওয়া পেয়েছে। একদলের ছেলে লাইন পেয়েছে একদলের সেই মেয়ে ও তৃতীয় দলের মেয়ে অন্য শাখায় পড়েছে। সেনগুপ্তর এখন দেবাদিত্য ওদের একটু ডিরেক্টর কিছু করার সুযোগ রাখেনি।

সেনগুপ্ত গলা কিছু করে খবর উচ্চারণ করল, 'এখন থেকে ওদের সাঁওতাল নাচের দিকে আরো নজর দেওয়া উচিত।'

প্রেতশান্তি

অশোককুমার সেনগুপ্ত

কাহু ভটচায দুকড়ির বাপ কালুর প্রেতে দাতে তিনপোয়া রোদ চাপিয়ে দিলেন। সামনে জামাইষষ্ঠী। এ বছরই বড় মেয়ের বিয়ে দিলেন। প্রথম জামাইষষ্ঠী। খরচ খরচা হবে। এদিকে যাজমান সেবা ছাড়া এ মাসে কিছুই জুটল না। নারায়ণ রাখলেন। নিত্যসেবার পাওনাগণ্ডা মোটা-মুটি টাকা মাসেকের মত। চাল দুধ থেকে বাতাসা পর্যন্ত হিসেব করে। কিন্তু সংসারটি তো ছোট নয়। [illegible]। সব ক্রিয়া-কর্মই বড়। একটা আয়ও নেই।

সকালে স্নান সেরে খালি গায় আওড়াতে আওড়াতে ঘরে ঢুকলেন। গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় মানুষটি শাঁসে জলে বেশই টলটলে। গোলমাথায় কাঁচাপাকা চুল, গোলগাল চোখ, উঁচু টিকিহীন তামার মত টাক। গলায় পৈতেটি বেশ মোটাসোটা। জোয়ান বুকে পড়ে থাকে দড়ির মত। কোমরে মোটা লালপেড়ে ধুতি। গায়ে জড়ান গামছা। মাঝ উঠোনে একবার থমকে দাঁড়ালেন। তারপর পূর্বমুখী হলেন।

প্রাতঃস্মরণ বড়ই নির্ভর। অড়জন দুরিম বস আছে। ফলে যৌবন প্রণতা সকাল আটটাতেই আকাশজোড়া দেবতা সবেই মর্তের পথে প্রণাম করে চলেছেন। ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং ভটচায বেশ জোরে গলায় আওড়ে দিলেন। করজোড়ে পৈতেগোছা আঙুলবন্দী করে প্রণাম জানালেন। বড় বড় শক্তিশালী। সংস্কৃত মন্ত্র সব শব্দগুলো কেটি করেই দিনযাপন। বক্তিমাত্রে সামনে পয় চড়াতেই হয়। তারের পর গভীর নিঃশ্বাস হয়েছে। দুকড়িকে দেখে একগাল হেসে নারায়ণের সাথে দুষ্টামি করছে। উঠোন থেকে সবে দাওয়ায় পা দিয়ে উঠবার কথা মনে হল না। বললেন, 'কিরে দুকড়ি সকালবেলা?'

ভটচায ভাবেন, কালুর প্রেত দেখা দিয়েছে। ঘটনা শোকে মাঝরাতে বাইরে দাঁড়াতে বেরিয়েছিল। চোখে পড়েছে ধবধবে সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরে কালু দাদের ডোবা থেকে উঠে আসছে। সর্বনাশ কাণ্ড। একথা মনে ভাবেনই দিকে আসছে। বৌয়েরও নজর পড়েছে। স্বামী স্ত্রী সোরগোল তুলে পাশাপাশি ঘরের মানুষগুলো বেরিয়ে এসেছে।

এক উঠোনে ছ'ঘর বসতি। বংশের ব্যাপারটা সমর্থন করেছে গোঁসাই। সেও মাঝরাতে উঠে উঠোনে দেখেছে দূরে। তবে আবার ঘরে ঢুকেছে সে। ওই সাদা ধুতি পাঞ্জাবীতে প্রেতের সাজে। বাকীই কথা। জীবিত অবস্থায় লোকটার অঙ্গে এসব পরিচ্ছদ জোটে নি। আড়াই হাত চৌকা, উদোম গা। নীচে বৌয়ের লাল-পেড়ে কাপড়টাই চাদর হত। মারা যেতে হরিমবাবু পুরোন ধুতি পাঞ্জাবী দিয়েছেন। ও দুটি পরানো হয়েছিল শবকে। প্রেত হয়ে ওই পরিচ্ছদই ভোগ করবে বৈকি। দেখা শুধু নয়, কালু শিশির ঘরের চালে নাকি রাত্রিকালে শব্দ হয়েছে। কি যেন খুঁটিয়ে পড়ল। পরপর তিনবার। সমাপের মেয়ে জ্যোৎস্না সন্ধ্যাতে 'খ গ কিঠা দাড়িম বইছে' বলে অজ্ঞান হয়ে গেল। এরপর আর সন্দেহ থাকে না দুকড়ির বাপকে দোষ লেগেছে।

আর এই দোষ কাটান দিতে কাহু ভটচাযকে চাই। সাড়ে তিনপোয়া রোদ অনেকদিন মোটামুটি ঠিক করেই রাখা হয়েছে। পুরো চারপোয়া চাপান যেত। কিন্তু চারপোয়া রোদে পুরো হয়। ছেলেদের ভাত খেয়ে দিয়ে যায়। চিন

খোঁড়ে। ও কেমন করে খেলেন। কোনও কাজ যখন হচ্ছে না, কি আর করা যায়। পাওনা গণ্ডা, নিয়ে নাবছা খণ্ডিদা কিছুটা করবে। গোলদার!

ফুলকি উঠোনে দাঁড়িয়েছিল। ললাটে ঘুম। শুকনো পাতায় ঘড়ি বেঁধে দেয়। মাথায় কৌতূহল চুল। খোঁচা দাড়ি গোঁফ। চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ণ, কৌতুকও বটে। বলল, 'সবাই বলছেন বাপের ঘুম লেগেছে।'

'সবাই বলছে? তুই বুঝতে পারছিস না?' ভ্রূ বেঁকা চাপিয়ে প্রশ্ন করলেন ভটচায।

'না। বাপ আমাকে খুবই ভালোবাসত। আমাকে কষ্ট দিয়েছে না। দুঃখও দিয়েছে না।'

'পাপের ভাগী হতে হয়।' ভটচায মাথা দোলায়। মনে মনে হিসেব কষাকষি, 'তোর তোর কাছে কর্ম দিয়ে কি করব? মোটা পঞ্চাশ টাকা জোগাড় কর। শাস্ত্র বিধি শোন তোর মনে কথা।'

'পঞ্চাশ টাকা!' থমকে যায় ফুলকি। চোখ কৌতুকায় হয়।

'পাঁচশ হত।' ভটচায চেঁচিয়েই একেবারে বাদে চুকে যান, 'পশুপতি মোড়লের মায়ের বেলগো দোষ লেগেছিল। পাকা পাঁচশ লেগেছে। তারপর তো ব্রাহ্মণ ভোজন আছে। তোর বেলাতে—। বলতে গেলে আমি তো'—

ভটচায বহুৎ। ফুলকি হিসেব করে দেখে ঘরে চারটে মুরগী। বিক্রি করলে পঞ্চাশ হবে না। তারপর তিন বলিদে কিছু ছাগ কলার মতলব আছে। অথচ তিন হলে বিক্রি। তিন দিন হোলাকী তিন পয়সায় কেন ঘুম দেয়।

ভটচায বোঝেন টাকাতে কাহিল হয়েছে মেটো। বললেন, 'তোর পঞ্চাশের মধ্যে কিছুর ব্যবস্থা করছি আমি।'

ফুলকি আশায় চোখে তাকায়। ঠাকুরমশাইয়ের দরদভরা বিধানের চেয়ে কিছুই বেশি থাকে।

'তা হবেক। যদি সে দেখছেন।'

কাগজ ফেলে,পাঞ্জায় টুলে বসে ভটচায চোখে চশমা আঁটিলেন। লাল কাগজের ধারে কেবে পাতি গুনলেন। পাতা উল্টোলেন আস্তে আস্তে। তারপর বললেন, 'উদ সকালে মরলে দোষই লাগত না। মাহেন্দ্রযোগ। তাড়ী তাল নক্ষত্র ছিল যে।' আঙুলের কড়ে গুনে বিড়বিড় করলেন। মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'দোষ ত্রিপাদ। তার মধ্যে একপোয়া নষ্টই দিয়েছে। বাকী আড়াই পোয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তুই পুত্র। যত কষ্টই হোক পিতৃদেব পাপ তোকেই করতে হবে বাবা।'

ভাবে ফুলকি। সে জন্মেই এসেছে। মরার মেয়েমানুষটিও এ ব্যাপারে কাহী খাবতা। আমার পাতি যত যত না তার চেয়ে কম বেশি। চাষব শাবন এলে হাজির হয়। এর মধ্যে দুপুর বেলাতে নাকি ও শুয়ে থাকে। বাপ বলছে, 'ও বৌ চাল দুপাত বলছে। তাও হবেক।' তারপর চাষী ছেলেমেয়ে। এদের উপরে দুটি মা নষ্ট। তাদের খাটাই মনোবেদনার বড়বেশী দশা। বাপকে ছাড় দিয়েছিল। কিন্তু ফুলকির মা, দু ভাই, তিন বোনকে চেয়ে খান আগেই নিয়েছে। তিন বোনের একটিও বিয়ে দিতে হয়নি। বৌ তাই হয়েছে, তব, বাপের দুধ না থাকাতে লাগে। খাওয়া কম।

ব্যবস্থা কর—বলা সোজা। কিন্তু করা কঠিন। তবে করতেই হবে। ভটচাযের কথা শুনে ফুলকির কেমন মনে হয় বাপটা তার মোটেই অবিবেচক ছিল না। বরদের তাকে খুঁজে বেড়ে ধন নষ্ট বাংলাদেশী নিয়েও খরের উঠোনে খান বেঁধা থাকলে কাজ ভাঙাড়। বসে বসে পথ কাটত। কেবল পাড়ার ভালোই দুরন্ত। দুইপক্ষ ব্যবহারও নষ্ট করেনি। অতগুলো সন্তানের মধ্যে সে কৌশিক বলে জন্মগতে থাকত, ঠাকুর ফুলকিকে আদর দাঁড়িয়ে দেখ। খাওয়া দাওয়া খোঁজ খবর নিত। ফুলকি ভাবে, বাপ থাকলে সকালেই মরত। মোটেই বিবেচনা করত না। পাড়ির কথা বাবা ভাবলে কি করে।

ভটচায ফুলকির পাতে দুধ দেখে বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই। দুর্গা কি না নাহেই বলেছে পুণ্যবানরাই দোষ পায়। দোষ কাটিয়ে দিয়ে আর একটা লাভ হয়। দুটো খরচ খর্চের বদলে তাড়াতাড়ি মুক্ত যায়।'

ফুলকির মোট টাকায় অন্তর কাতর তত মন উদগ্রীব করছিল। না জানি কি বলে। বাপ স্বর্গে যাবে কি না তার কষ্টে কোনও চিন্তা নেই। বুঝিয় সে। কিন্তু কাজ কোথা। বাজার বাড়ি কেনার কাজ পেয়েছিল। কাঁচিয় তার দেয়। বাপের হাড় খাড়, আত্মীয় ভোজন, আত্মায় করবে আশি টাকা রোজগারে দেখা। বাকি ছিল একটা। বিক্রি হয়েছে। ওটা বেচে পাটি কিনে ছাগল বাড়াবার মতলব ছিল। বৌ শাহুবাবুর ঘরে কাজ নাবে। খাছ বরে থাকে। কিন্তু বড় কঠিন ছিল!

'কি রে, কি ভাবছিস?'

'আজ্ঞে খরচ বড্ড।'

তা করতেই করতে হবে। তোর অবস্থা তো জানিরে। আমাকেই বানিয়ে দিতে হয়। শুধু নিয়মটুকু পালন, ব্যস। এ সব পুরো কাজ। সামান্য দক্ষিণাতে পুরোহিতকেও

'আমার বাবাদের চারিদিকের দেবস্থানে খড় চাপাতে হবে। তাহলে আর কোনটাই লাগে না। খড় তোর চাহিদা লাগবে। আমি একটু বেশি বেশি বললাম। বাঁশও লাগে আছে। খেতে বাড়া করে দে। আর তো দুদিন দিতে পারব না বাবু।'

ভট্টচায বললেন, 'পরের টাকা হাত পাতে পঞ্চাশ টাকা দেব। ঘরে হাত আছে?'

দুকড়ি কেমন করে বোঝায়, কষ্টীপাথরে তাকে ঘরে ফিরোতে পারে না। না খেয়েই পিঠটান দেয়। রোজই কথা। বাবিনন্দা হাড়ি, ছেঁড়া কাঁথা, তালাই। না দুধ না মুড়ো না আগুন না জল কিছুই। কিসের টানেই বা থাকবেন! দুকড়ি ভট্টচাজকে চটাতে চায় না। কাজটা উদ্ধার করতে হবে। পরের টাকা নেই উজল হোক!

দুকড়ি বলল, 'ঘরে তুমুই না ঠাকুর-মশাই।'

'ব্যবস্থা কর দুকড়ি পিতৃদেব মহাশয়। অপরিশোধ্য। তর্পণ দান কেবল দুধ দেওয়া। আসল বাকীই থাকে।'

'হ্যাঁ কথার ঠাকুর-মশাই। কি ভেবে এসে পড়েছি—।' আপনা থেকেই দুকড়ির হাত জোড় হয়ে যায়।

'তাহলে কর্ তো শোন। পাঁচটা বামুনে দু'পলা, এক জোড়া কাপড়ে ধুতি! হ'পক মাকিন। বোতলটা। দিয়ে দিই দিয়ে যাবে একপাই করে চাল, ডাল, নুন, আলু। দিয়ে দিচ্ছ একটা করে সিকি। তারপর আমার—।'

তবে জোর লাভ নাই। দুকড়ি বলল- 'ঘেটে দূর। আর মোটা বিশেষ টাকা দূর। কি চাল থেকে ফেলবেন না'!

'অসম্ভব!' ভট্টচাজ টাকমাথা দোলান। বললেন, 'আরে এদি বোঝানো যায় না চাবো জিনিস যে হজম হবে! বিস্তিতে ভরণ করে দিলেন বলেছি। যাতে পারলৌকিক না আছে ছুঁইও না বলিস, তোর বাপের আত্মাও নষ্ট হয়। কম করলে কপে কি চালা হবে! বলিস না বাবা, প্রেত নিয়ে আমাকে পাপভর্য করতে বলিস না। অবশ্য মহাকপাল হবে। যেন না হবিন দন্ত বাপের কাজ করলাম। তা নতুবার বাপ না চাল খেয়ে তা দেবার কথা। তিনার কত এক বছরের চালের। ভোরবেলা শরীর। ঝরিয়ে বাকী হলাম চল্লিশ দেবে। ও বলেছিল পঞ্চাশ দেয় দেবে। পরে বলল 'না ঠাকুরমশাই, আপনি না বলেন! কেন? বিচার করে দেখেই তো! নাকি!'

বড়ো বাপ একবছরে যে চাল খেত, তার দিতে হবে। বড়ো বাপও চাল খায়! বিস্ময়ে দুকড়ি নিজের দুঃখ ভোলে।

দুকড়ি বাঁশ কাড়ে। বড় বেশার। চল্লিশ হাত দীর্ঘ, তিন হাতের কাছাকাছি প্রস্থ ভট্টচাজের থাবার বাড়ী। চারিদিকে বেড়া। চাল বলে যাবা বেড়াতে গোঁজা খুঁটিগুলোও নষ্ট হয়েছে। জায়গায় জায়গায় মাটিও দিতে হচ্ছে।

এদিকে বৈশাখের গোড়াতেই বড়ো নারদ অন্দরেবাড়ি কালবৈশাখী আসতে না দিয়ে শাসনের চাবুক হেনে যাচ্ছেন। আকাশের চলবা দা দোয়ার। তিন হাত দিচে ইঁদারার জল। তুলে শুরু পেটে চালান করে দিয়ে আরও কাহিল হয়ে পড়ে সে। ভট্টচাজের বাবার্থ বড়ই কম। শাস্ত্র যাই বলুক, বাঁচলে বেঁচে থাকা কঠিন হয় বৈ। কাকাজেঠাকদের তিনি কাটও ছুঁতে দেন। কঞ্চা বইতে থাকেন। সিদ্ধি ভুলবার একটু যাতিক্রম। দুকড়িকে চায়ের সঙ্গে একখানা রুটিও দেন। কিন্তু বৈশাখের দীর্ঘবেলা দিনের শেষে তুফানও মুখে কষের ফোঁটা বারিবিন্দু!

তৃষ্ণা মেটেনা। দুঃশিপাসা উগ্র হয়। ঘরে বৌ রোগজ্বরে ছেলেদের আগলেটা দেয়। বাগীর কতো ভুলে যাবে। দুকড়ির দিব্যি বলতে আটকায় না, 'ভট্টচাজ ঘরে খেয়ে এসেছি, তুই খা।'

তিনদিনের দিন কিন্তু সে টের পায়। দিব্যি আর বৌ মানুষের শরীর মানবে না। বেড়াতে বসে দড়ি বাঁধতে একটু জোর দিতেই পাকা কলার মত টুপ করে বসে পড়ে। তারাতারা পাশেই শব চাচ্ছিল। কলী। খুঁটি দেখেই হৈ হৈ করে ওঠে। জল দাও করতে আসে হার বাড়ী। পেরিয়ে যাচ্ছিল তাদিনের বেচারা। নইলে কি যে হত! ভট্টচাজ তো ছুঁতে পারে না। বামায়ণের শীতল দিতে হয় মাথার বিবেকের মুখে। অবেলায় স্নান করলে শরীর কি নষ্ট করবে পারত। নারায়ণ বাঁচিয়েছেন।

তবে অজ্ঞান হওয়ার বেলাতে ভট্টচাজ সিদ্ধি কলা দে পায়। একখানা মুড়ি, পেঁয়াজ, এক ভেলা গুড়, জল দেন। ভট্টচাজ চাপ চাপ চোখে দেখেন। সিদ্ধিকে চোখ পাকান। অজ্ঞান হয়েছে বলে ছুটি দিতে হবে। মেয়েমানুষের জাত বলেছে কাকে। হাম উঠতে উঠল!

লোকের সামনে অবশ্য বললেন, 'যা দুকড়ি, দেটপুরে খা। না খেয়ে এসে মাথা ঘুরে ত পড়বিই। তা এসে বলতে কি হয়েছিল। খালি পেটে আমার ঘরে কাজ করছিস, এতে যে আমার অকল্যাণ হয়।' পরে সিদ্ধিকে ভর্ৎসনা করেন চাপা-স্বরের ভিতর, 'কাজ দুটির দায়! একখানা বার করে দিলে যে! আরো কত দুটির। নইলে মরে না।'

দুকড়ির কেমন মনে হয়েছিল, অজ্ঞান হলে কি ভট্টচাজগিন্নি রোজই তাকে একখান করে মুড়ি দেবে।

ভট্টচাজ চারদিন বললেও, কাজ পাঁচদিনেও হবার নয়। দুকড়ি রোগা প্যাংলা বটে, তবে খাটতে পারে দড়ো পর্যন্ত। খেটে তার সাথে চারদিন কাজ শেষ হল।

'তাহলে হাঙ্গামির ব্যবস্থা করুন। তাকেও আমিশিশির দুয়োর ঠেলছিল বাপের ভূত। আবার ভূত হয়ে নাকি কাঁদছিল টেঁপিদের দুয়োরে!'

'দেরী হচ্ছে তো! প্রেত উক্ত হচ্ছে।' একটা লম্বা শ্বাস ফেলেন ভট্টচাজ। বলেন, 'কিন্তু বাকী টাকা! আরে, চুপ করে আছে

দেব। যদি তোরা কি জানিস এখন। পোষ মাস বললি, পরের টাকা দেব এখন। তোর মামা বাপ থাকুক!'

থামতে উঠল ফুলকি, 'মামা বা কি হয় ঠাকুরমশাই? তো পরের ফুলকী আমারে খুশির আগেই বলেছে। আমার ফিরেছে একটা। আলগা কাঠ করতে হবে।'

'তাই হয়।' ভটচায অনতিদূর সমাধে বললেন, 'এ তোমার থেকেই তো ফিরিয়ে পত্র নিতে হবে। কিন্তু যদি—'।

'গৌট পাড়ুবাবুর ঘরে বাসন মাজে। দু'মাসের দশ টাকা আমার আনবে।'

ভটচায দুবে হেসে ফেলেন, 'এইখানেই হল দুঃখ। যদি থাকলা তো বটেই ফেলে দিল। অথচ চুপ করে আছিস। ঠিক আছে মাসের দিন একটা দেশলাই আনি। চার বছরই পাকি দেখব।'

'একটুখানি থামারা করবেন।'

বাপের বোন কাটানর বেটীকে পাড়ার লোক পাঁচকথা শোনাচ্ছে। কোন নাকি এখন পাড়ায় চড়াবে। অবশ্য পাড়ায় থাকে। ঘরে ঘরে বলেও দেব নিয়ে, যদি চেষ্টা।

দাদামশির কাঠ চুরিতে দু'কড়ি উঠোনে বসে মত পড়ে থাকে। পরের দুটো কাটিতে দিতে থাকে। সেটাকে আগলে রেখেছে। ফুফুল হাত ছাড়া অবধি তো নেই। ছিঁড়ে পড়বে চার কড়ির ঘর। তবু বেঁচে থেকে খাওয়া থাকতেই হয়। তারপর আছে অদ্ভুত শরীরে রৌদ্রের প্রতাপ। জল নেই, বৃষ্টি নেই। দিন দুপুরে অভিশাপ হেনে যাচ্ছে আকাশের ক্রুদ্ধ দেবতা। সবেবেলাই পড়ে থেকে হাত পাওলোকে সে নিজের করে পাবার চেষ্টা করে। পায় না। আলগা সব ঝিমায়। ঝিমুনের বাইরে। তারপরেই ঘুম আসে।

কথা এলেই কেমন উল্টো কথা বোঝায়। কথা নাড়িতে ভার দিয়েছে। ফণিবাবুর সঙ্গে বোঝে। ফণিবাবু চাইছেন বাকির। বারো টাকা মাসে মিটিয়ে দেবে। পাড়াতে আসে। কোনদিন ফুলকিকে বলে। যায়নি।

কথা এসে বলল, 'ফুলকিয়া, আমাদের বৌয়ের কাছে গুমোর নয়। কাজীরা সব বলেছে। যদি কুমারের বাপ পারেন। যত বাবুদের আবার পাবে। দিনেরা যে বলতে বলেছে। কুফুটুর সব দিবো।'

ফুলকি চলল। ভাবল, এ সব ওদেরই সাজেই কথা বল বলেই তো তোমাদের বলে যাইনি। ভাতের বিবিমার কথায় বলল, 'একটু বিড়ি খাবে ছুবে।' দিয়ে মরিবে কাপড়ে ঠেঁসে চলল।'

'থাইছ, এক পয়সা নেই না! ঘরে চাড়ি চড়বে না। বাবুদের কাছে দুবার টাকা আদায় কর। যা, তোর থাকুক।' কথা আরও কথা বলল। বলাই সার। সৌজা হয়ে বইল ফুলকি। কথাকে উঠে যেতে দেখে শুধু বলল, 'দে আর একটা বিড়ি ধরেলো বসে ঝিমঝিম কাঠ কাটা হল। আর একদিন হবে। তার মানে বার টাকা। পাড়ুবাবুর দশ টাকা। শুধু পাঁচদিন হয় না। মুরগী জোড়া বিক্রী করতে হবে।

এদিকে আর এক বিপত্তি। বাপের ক্ষেত দিতে বলল কিনা ভটচাযের ছেলে গেছেন।

বিকেলে আর একবার ঠাকুরমশাইকে ধরতে কাছে গিয়েছে ফুলকি। কিন্তু উঠোনে পা দিতেই অবাক। আলসেতে দাঁড়া পা নাড়ী পরে ভটচাযের খোকা কাগজের মত কাগজ খেয়ে কেমন যেন মিষ্টি মিষ্টি হাসে। মাথার চুল এলোমেলো। বুকের পাঁজর পরে দিয়ে দর্ভীর হাড় দেখা যাচ্ছে। হাসির মধ্যেই বলল, 'আয় বাবা ফুলকি! আমি তোর বাপ।'

ফুলকি পাথরপ্রতিম হয়ে যায়।

'আমার খাবার আমায় দাও বউ। খাবারেরচেতনা যায়? তাহলে ঘুম আসবে কি করে ভাতের খেয়ে।'

ভটচায চিৎ হাঁকেন, 'ওরে তোমার পাবে। খবর পেয়ে তোমাকে বলছি।' তারপরেই ফুলকির দিকে ফিরে বলেন, 'এই যে এই যে এসেছে তার বেকারা। তোর বাপের মুখ আবার মরচুকল। আজা-বাড়ি টাকা তোমার দরু। সকালে হবে না পরের বলতে যাবে। মুখ ডাক্তারও বড় আছে। দেখছিলাম, আজাবাড়ি কর [illegible] আমাদের চেয়ে কথা বলল না।'

[illegible]

যে মরদের ঠিক জোগাড় এটাই বাপের ভাগ্য। তারপর কে আবার জেগে উঠবে? বাঁচিয়ে বসে আছে কিনা! আমাদেরও আবার ঘর পাঠাতে হবে। সব ঠিক হবে। কেবল এটা বেআইনীও হতে পারে। চুলের মুঠি ধরে টানা আর টেনে বাড়ি থেকে কাটিয়ে দূরে সরে যাচ্ছি?

ভটচাযের কথা শুনে ফুলকির মাথার পৃথিবীটা টলমল করে। যারা হতে পারে না সে। অবাধ পরিশ্রম যেন এক

West Bengal State Federation of Wholesale Consumers' Co-operative Societies limited

P-1, Hide Lane : AKBAR MANSION : 3rd Floor, Calcutta-700 012

(Phone Nos 27 7012 & 27-7013)

Join Consumers Co-operative Movement

Visit Your Nearest Co-operative Stores Or Us For :—

1) PULSES
2) Spices / Soda Ash / 'Confed W. B' Brand Hurricane Lantern
3) Textiles (Controlled and Non-Controlled)
4) Amul Products : Amul Spray, Amul Whole Milk, Amul Butter Etc.
5) Customs Confiscated Foreign Goods
6) Dalda, Vanaspati / Photo Films
7) 'Coop' Brand Mustard Oil (Ag-Mark)
8) Bangalipi, Tamralipi, Barnalipi, Chatralipi (From Concessional Paper)
9) Common Salt
10) Cycle, Ricksaw Tyres And Tubes
11) P. D. S. Items

Also Visit

RETAIL UNIT
P-12, New C. I. T. Scheme Extension
C. I. T. Buildings
Calcutta-700 012

MEDICAL UNIT
Co operative Medical Stores
88, College Street,
Calcutta Medical College Campus
(Near Gate No. 3)
Calcutta-700 012

ENROL YOURSELF AS MEMBER

SEND CONSTRUCTIVE SUGGESTION AS MEMBER

CHAIRMAN

Sri Bhabani Chatterjee, M. L. A.

টাকার অভাব বিনাস অবধির দিকে ছুড় খাবার তার চেয়ারের চাপ লাগানোর মত টেনে ধরে। দু'কথে চার পথে প্রাণবন্ত। বাসনটা হয় বড়।

'ঠাকুরমশাই! এখন টাকা দুধা—।'

ভটচায চোখ পাকায়। কপাল খুব টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। শেষ কালে যেন না ফুলকিকে। কখন মনে যেন অঠাম, 'জানি না, শুনতে চাই না। বিয়ে দিচ্ছে যে, বাপ জেনে দিয়ে দে—।' বলতে বলতে থমকে থাম। যেমন, কোনটা বড় কাহিল হয়ে পড়েছে। হাত উঁচিয়েছে পড়ার, বুকের, পিঠের, কপালে ফুল, কাপাসে চাউনি। আর একটা প্রেম তৈরী হচ্ছে। বৌ প্রেম পাত্তিকই করবে। তার পর বৌয়ের প্রেম! তার কে করবে! ছেলেমেয়েরা, আত্মীয় স্বজন, পাড়ার মানুষ। বাড়াবাড়িকতা থাকবেই। এখন টাকা চাইই চাই।

'শোন, কিরণের আসল কাজ কি করতে চাই। যা এখন। পুরো এখন আবদি কাজ।'

কথা শুনে হা হা করে হাসল। তারপর বলল 'তাই কথা বটে ত। শেষে মাথা নাড়ু দিয়ে ধরল ভটচায্যির বিড়িকে

তা শুনেও দিশেহারা। ফুলকির কথার হাসিটা যেন বিদ্যুৎ আলো দেয়।

'তাহলে খুব একবার ফুলকিয়া। মানুষের মত ভাবেও দুবে বিয়েকে তোমার মুখ আনলে এই ভটচায। বিড়িতে তাই বলেছে। আর তুমি তাই মানুষ হয়েও বুঝতে পেরেছ! যা জান হচ্ছে। বুকলে, উঠে দাঁড়ে বসে হাত, বাপ খুড় হয়ে কি করছেন, আমি কি জানি! বলে দাও, নিজের বিড়ি খেয়ে পাতিটাতি ভক্ষণ করায়। উঠেই বাপ আমার উদ্ধার হবেন।'

'ঠাকুরমশাইকে উ কথা বলে

'হ'।

এখন টাকা তোমার কথা [illegible] যেন হঠাৎ চমকে অপারে ফুলকির যেন সুখবৃদ্ধি হইল। কপাল কথা উঠবে দিন ভটচায্যের কাছে।

ভটচায বুঝি বলেন দৈ কি! [illegible] ক্ষোভ পরে চাপা দিয়ে বললেন, 'কিন্তু ফুলকি পাত্রেই বলেছে খুব ভাল কিছু-কিনা জানা। পুরোহিতের পুত্রের দিয়ে পুত্র উৎপাদন করে বর্গের [illegible] হয়। এ কথা আমার কথা নয়। শাস্ত্রের কথা। তোমার ত বাপ বুঝি নাই।'

ফুলকির এতক্ষণে মনে হল কথা ঠিক হয়েছে। ঠাকুরমশাইকে তার বাপের [illegible]

[illegible]

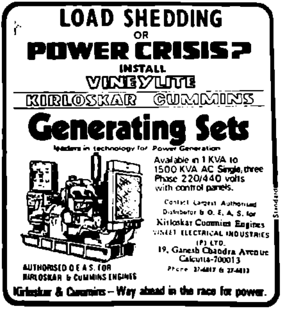

সমন্বয়ের সমালোচকদের উদ্দেশে / বীরেন কর্মকার

সি পি আই (এম) এর জন্ম পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়েছিল। সেখানকার মানুষ সংগঠিত ও আন্দোলিত। আজকাকার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এবং সি পি আই (এম)-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকার করতে শুরু করেছে।

১৯৬৪ সালে পার্টি সম্পর্কে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা বলতো, উগ্রপন্থী ; কেন্দ্রের সরকার, পুঁজিপতি মহল আনন্দবাজার গোষ্ঠীর কাগজ বলতো, সি পি আই (এম) চরমপন্থী। ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ও তীব্র গণ আন্দোলনে সি পি আই (এম) নেতার ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে দীর্ঘ গণসংগ্রামের প্রতিফলন স্পষ্ট হয়। দীর্ঘকাল কংগ্রেস আসীন থাকেন অপ্রতিহত বলে একটা ধারণা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। সেটা ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে ভেঙে যায় এবং মানুষ রাজ্য আসনে, উৎসাহে মেতে উঠেছিল।

তখন কোন কোন মহল থেকে সংশয় দেখা দিয়েছিল যে-কমিউনিস্টরা বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থার ভিতরে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করে এসেছে, তারা সেই শাসন ব্যবস্থায় সরকারে যাবে কিনা। কিন্তু এ প্রশ্নের সমাধান পরবর্তীকালের ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে সুস্পষ্ট হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি যোগ দেওয়ার পর যেহেতু সি পি আই (এম)-কে প্রধান শরিক দলে সরকার গঠনের প্রশ্ন এল, তখন এ প্রশ্ন আবার উঠল। কারণ সি পি আই (এম) ই এ সরকারের কমিউনিস্ট আদর্শকে বশ দিয়েছে, জনগণের তার একটা বিরাট প্রভাব পড়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ ভোট দিয়ে অকংগ্রেসীদের জিতিয়েছে, কংগ্রেসকে পরাজিত করেছে, শুধু সাময়িক একটা প্রতিশোধমূলক মনোভাব থেকে নয়, জিতিয়েছে এ রাজ্যের শাসনভার অকংগ্রেসীদেরই হাতে তুলে দেবার জন্য। জনগণের সংগ্রামী দৃঢ়তায় বুর্জোয়া সমাজের সংকট দেখেই পড়ে। কারণই যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন, মজুরি, সেটা বৃহৎ পুঁজিপতি, বৃহৎ ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে কিছু নির্বাচনে অকংগ্রেসীরা জনগণের কাছে আবেদন করেছিল, রাজ্যের শাসনভার তাদের হাতেই দেওয়া হোক। জনগণ সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়ে দেখেছেন, অকংগ্রেসী হলেই সরকার টিকে থাকতে পারে না, প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার অকংগ্রেসী এম এল এ-দের টাকার বিনিময়ে দলত্যাগ ঘটিয়ে পতন ঘটাতে পারেন রাজ্য সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে ১৯৬৭ সালের সরকার ভেঙে দেন। এর বিরুদ্ধে জনগণ গর্জিত হয়। এই অভিজ্ঞতার পর ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস বিরোধী ভোট ঐক্যবদ্ধ হয়। একথা সবাই জানেন, কংগ্রেসকে পরাস্ত করাই ছিল জনগণের আকাঙ্ক্ষা। দেখছি ভোট যাতে ভাগাভাগি না হয়, তার জন্য বড় শরিক হিসেবে সি পি আই (এম) কেই সব চাইতে বেশি আসন ছাড়তে হয়। অন্যান্য দলগুলি তাদের দাবি ছাড়তে না পারলেও, যে যতটা পারে কুড়িয়ে নিল। সি পি আই (এম) অকংগ্রেসী দলগুলির মধ্যে তা সত্ত্বেও সব চাইতে বেশি আসন পেল। যুক্তফ্রন্টের ভোট ১৯৬৭ সালের ছিল, ১৯৬৯ সালের ছিল যে, কংগ্রেস হেরে যাক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সি পি আই (এম)-এর যেন শক্তি না বাড়ে। কিন্তু সি পি আই (এম)-এর শক্তিকে আসন-সংখ্যা কমিয়ে বা মুখ্যমন্ত্রিত্ব না দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। সেদিকের পাতা উল্টালে দেখা যাবে, সি পি আই (এম) সবচেয়ে বেশি আসন পাওয়া সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী সি পি আই (এম) থেকে হোক, এ দাবি কেউ সমর্থন করল না। এবং এস ইউ সি এবং সি পি আই প্রকাশ্যে বারবার বিবৃতি দিল মুখ্যমন্ত্রিত্ব অজয় মুখার্জীকে দিতে হবে। সি পি আই (এম) তা-ও মেনে নিয়েছিল। তবে সবাই জানে হবার মতো সি পি আই (এম) অনমনীয় ছিল ঠিকই। কারণ ১৯৬৭ সালে প্রবন্ধের নিয়ে এবং অজয় মুখার্জী যাই নিয়ে যে কাণ্ডকারখানা করেছিলেন, তাতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনই ত্বরান্বিত হয়েছিল। সি পি আই, এস ইউ সি-র প্রকাশ্য বিবৃতি এবং অন্যান্য দলের আকাঙ্ক্ষিত নেতা অজয় মুখার্জী কী বিশ্বাসঘাতকতা করলেন, সেটা আজকে নূতনের কথা নয়।

কংগ্রেসকে নরম দেবার ব্যাপারে সি পি আই-এর প্রকাশ্য জাতীয় নীতি তারা অতি সহজে পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর করতে পারেনি। কারণ এখানে কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব জনগণের মধ্যে প্রবল। ১৯৭১ সালে সি পি আই পশ্চিমবঙ্গে সেই পথ

দিল। কেউ বলতে পারেন, ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে আসন সংখ্যায় সি পি আই (এম)-ই অগ্রগামী হয়েছে। এর উত্তর ১৯৭১ সালের নির্বাচনে পাওয়া যাবে। যখন সি পি আই (এম) কে সম্পূর্ণ পৃথক করে দিয়ে অন্যান্য দলগুলি নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে নিল। অন্যদিকে কংগ্রেস একে আক্রমণ। কংগ্রেস ও অন্যান্য সমস্ত দলের প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়াল সি পি আই (এম)। কিন্তু এই নির্বাচনে জোট-বাঁট করেকটি দল মিলে লড়াই করে সি পি আই (এম) সবচেয়ে বেশি আসনে পশ্চিমবঙ্গে একক বৃহত্তম দলে পরিণত হয়। ১৯৬৯ সালে সি পি আই (এম)-এর আসন সংখ্যা ছিল ৮০, ১৯৭১ সালে একাকী লড়াই করে পেল ১১১ কংগ্রেস পেল ১১১। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা হেমন্ত বসুকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে সঙ্গে সঙ্গেই রেডিও ও সংবাদপত্রের প্রচারে তার দোষ চাপায় সি পি আই (এম)এর ওপর। কংগ্রেসের এই ষড়যন্ত্র কাজ ও প্রচারে ধরে ফেলে ফরওয়ার্ড ব্লক নয় সমর্থ হল। তা না হলে সি পি আই (এম) এর আসন সংখ্যা আরও বাড়ত। ১৯৬৭ সালে ও ১৯৬৯ সালে সরকারের মধ্যে থেকে সরকারের সমালোচনা ও বিরোধিতা করে সমর্থ হল। সেদিন সি পি আই (এম) বাংলার সব চাইতে শক্তিশালী পার্টি হিসেবে নিজের মর্যাদাকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল।

১৯৭২ সালের নির্বাচনে সি পি আই ভোটটা খুলে জনগণের চিহ্নিত শত্রু কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলায়। তাছাড়া বামপন্থী হয়ে অন্যান্য ছোটখাট দলগুলি সি পি আই (এম) বিরোধিতায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় আসলে সেখেই। বাম বামপন্থী দলগুলি নিজেদের ঐক্য ও বোঝাপড়ার উপলব্ধি করে আবার সি পি আই (এম)-এর সঙ্গে এসে জোট বাঁধে। ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭২ সালের কংগ্রেসের সুপরিকল্পিত হত্যা অভিযানে সি পি আই (এম) এর অসংখ্য কর্মী খুন হয়। চারদিকে সন্ত্রাসের অন্ধকার। গণতান্ত্রিক অধিকার শুধু কাগজে কলমেই লিপিবদ্ধ থাকল। এই পরিস্থিতির পটভূমিতে সি পি আই (এম)-এর প্রভাব বেড়েছে এবং সি পি আই (এম) সংগ্রাম থেকে মুহূর্তের জন্য বিচ্যুত হয়নি, বিরত থেকেনি। জনগণের কাছে কংগ্রেস-বিরোধী সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য শক্তি সি পি আই (এম)। জনগণের মধ্যে সেই ধারণা গত দশ বছরে আরও বেশি বদ্ধমূল হয়েছে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনী ফলাফলের অভিজ্ঞতায়। ১৯৭২ সালে কংগ্রেস আর কোন ঝুঁকি না নিয়ে গোটা নির্বাচনকেই জুয়াচুরি ওজারী করে প্রহসনে পরিণত করে। সি পি আই ছিল এই ঘটনার কংগ্রেসের সঙ্গী সাথী। এখানে সি পি আই গোটা তিরিশেক আসনও চুরি জোচ্চুরি-ওজারি করে পাইয়ে দিল। সি পি আই তখনও বুঝল না, জনগণের চোখে তার মুখ ও নিজস্ব সত্তা হয়ে উঠল। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তারা শুরু করে ১৯৮০ সালে। তাতে পার্টি দুর্বল হয়ে গেল।

১৯৭০ সালের পর ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত যে আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস কায়েম হয়, যা গোটা ভারতে বিস্তার। কংগ্রেসের বিবৃতি ও রেডিও, দূরদর্শন সংবাদপত্রে প্রচার হয়, সি পি আই (এম) নিঃশেষ। সি পি আই (এম)-এর অসংখ্য কর্মী খুন হয়ে যায়, চরম ঘাতক বাহিনী সমর্থিত ছাড়া, কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন অফিস কংগ্রেসী গুণ্ডাবাহিনী দখল করে। অসংখ্য সি পি আই (এম) অফিস নিশ্চিহ্ন হয়। এত আক্রমণ কোন পার্টিকে সইতে হয় নি। এই আক্রমণ গোটা দেশের মানুষের ওপর বিস্তার লাভ করল। সি পি আই (এম)-কে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় নি। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে জনতার জয়, আর এস পি কে নিয়ে সি পি আই (এম) নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লককে তারা অনেক আসন ছেড়ে দেয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে আসনও ত্যাগ করে। তবু সি পি আই (এম)-এর একার আসন সংখ্যা এত যে, তারা একাই পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করতে পারে।

১৯৭৭ সালের নির্বাচনের ফলাফলে, [illegible] সি পি আই (এম)। [illegible] সবচেয়ে বেশি আসন সি পি আই (এম) একটা পার্টিকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিল। একটা পার্টি সেই [illegible] বিপুল সংখ্যাধিক্যে এই প্রথম বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। সি পি আই (এম) একাই সরকার গঠনের [illegible] সি পি আই (এম) এর বিপুল [illegible] না থাকলে এটা হত?

বামফ্রন্ট সরকার এবার ক্ষমতায় আসার ফলে ১৯৬৭ সালের বা ১৯৬৯ সালের সমস্যাগুলি আর রইল না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের, বিশেষতঃ সি পি আই (এম)-এর শত্রুরা থেমে থাকেনি।

বামপন্থীদের উত্থান-পতনের কাহিনীর উল্লেখ করা দরকার। ১৯৬৭ সালে সি পি আই (এম) ছিল প্রধান শক্তি, এখন [illegible] বামপন্থী রাজনীতির ক্ষেত্রে সব পার্টির [illegible] তা সি পি আই (এম) বিরোধিতার দুর্বলতা [illegible]। গোটা ৮০ সালে [illegible]

হয়। ১৯৬৯ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে আবার তা শুরু হয়। সরকার পতনের পর কংগ্রেসী-পুলিশ সব একাকার হয়ে যায় বলে মনে করেন। নকশাল-পন্থীরা যেখানে সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে হিংস্র অভিযান চালায়, তারা কংগ্রেসের সাথে হিংস্র খতম করেছিলেন, পুলিশের তৎকালীন কর্তাব্যক্তি চারুবাবুর সর্বোপরি বিশেষ উদ্দেশ্য। মার্কসবিরোধীরা একটা বিপ্লবী সার্টিফিকেট দেন। এই সুযোগে পুলিশ, কংগ্রেস, মার্কসবিরোধীরা নকশালদের হাত ধরে সমস্ত রকমের সামরিক কার্যকলাপ করে যেতে লাগল। নকশাল-পন্থীরা তার ফলে প্রতিবিপ্লবী হয়ে গৌরববোধ করে বলতেন যত দুর্নাম হোক, দুর্নীতিপরায়ণ কংগ্রেসী, প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী, মার্কসবিরোধীরা বলে বলে নকশাল-পন্থী হয়ে গেল, তাদের বিপ্লবী হয় বল, যে যত বেশি মার্কসবিরোধী কাজ করবে সে তত বেশি বিপ্লবী।

কাজেই মার্কসবাদটাকে বাদ দিয়ে এই ভাবে ক্ষমে দিতে হবে। কোন কোন বেদনাশী মানুষের কাছে এর প্রতিক্রিয়া নকশালপন্থীরা বোঝেও বোঝেনি। কেবল একমাত্র সি পি আই (এম) ছাড়া কোন দল এর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে রুখে দাঁড়ায়নি, সি পি আই (এম)-এর অগণিত কর্মী ও নেতাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। আর আজ সি পি আই (এম) হয় কার? গোটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিপর্যস্ত করতে যেমন শ্রীমতী গান্ধীর স্বৈরতন্ত্র কার্যকলাপে সহায়তা করে গেল নকশালপন্থীরা। এই রাজনৈতিক ব্যর্থতা যখন দেখলাম, তখন আবার এদের বিভিন্নভাবে কোন কোন জায়গায় কায়েমী স্বার্থ ও জোতদারের ছেলেরা এসব নকশালপন্থী আখ্যা দিয়ে গরিব কৃষকের বিরুদ্ধে নেমেছে, বামপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে তো বটেই। জোতদাররা এই হাতিয়ার এখন ব্যবহার করছে।

কয়েকটি সাময়িকে প্রচার চালানো হচ্ছে, সি পি আই (এম) সংশোধনবাদী হয়ে উঠেছে। টাকা চুরির দায়ে বহিষ্কৃত এক আজ্ঞে সাপ্তাহিক '[illegible]' পত্রিকার মুখপত্র আবরণের প্রতি কটাক্ষ করে লিখছেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার ছিল সংগ্রামের হাতিয়ার, আর বামফ্রন্ট সরকার চলছে সেরকম সরকার। সমস্ত সমালোচনার সবচেয়ে জোরালো হয়েছে, সি পি আই (এম) ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে কারণ নাকি এদের সাহায্যে সরকার না চলে।

একথা ঠিকই, কংগ্রেস সরকার থাকলে সংগ্রামের এক রূপ এবং বামফ্রন্ট সরকার থাকলে সংগ্রামের অন্য রূপ। কংগ্রেস ছিল সংগ্রামী জেহাদী মানুষের শত্রু, বামফ্রন্ট সরকার জেহাদী মানুষের বন্ধু। আগে জোতদার পুঁজিপতি মালিকের বিরুদ্ধে একদিকে, অন্যদিকে তাদের সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিক কৃষক জেহাদী মানুষকে আন্দোলন করতে হোত। এখন মানুষকে একটা পক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হচ্ছে, বামফ্রন্ট সরকার এই সংগ্রামে সহায়তা করছে। ১৫ লক্ষ শ্রমিক; সরকারী দরে ধর্মঘট করেছে। কোথাও শিলেক্ট-এর ঘটনা ঘটেনি, পুলিশের একটি লাঠিও উঁচু হয়নি, মালিকের গুণ্ডা পুলিশী সাহায্যের অভাবে গুণ্ডামি সাহস করেনি। মালিকের আর্থিক শোষণ আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে দমননীতির অস্ত্র তার হাতে নেই। কং সরকারের সঙ্গে এই পার্থক্য ফ্রন্ট সরকারের বোঝার মতো শক্তিও যাদের নেই, বামফ্রন্ট সরকারের সমালোচনা তাদের থাকবে স্বাভাবিকই। শ্রমিকরা মালিকের কাছ থেকে, এবং কৃষকরা গ্রামের জোতদার কায়েমী স্বার্থের হাত থেকে নিরাপদে অনেক কিছু আদায় করতে পারছে। এটাকে কেউ আখ্যা দিতে পারে 'আপিয়ে দেওয়া', কেউ বলতে পারে আপো-ষের কথা। কিন্তু যেতে বাধিত যারা কার্যকারণ ধারা লক্ষ করবেন, তাঁরা এই দুই সরকারের পার্থক্য বুঝতে পারবেন, সি পি আই (এম) এর রাজনৈতিক কথা তাই। শুধু তাই নয়, আজ ইন্দিরা কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের মানুষও বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে পার্থক্য বিচার করে নিজেদের চেত-না বাড়াতে পারছে। গণতান্ত্রিক আন্দো-লনে বামফ্রন্ট সরকার সহায়তা করছে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই। যারা এই সরকারকে সাহায্য নয়, এই সরকারের সঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেস শাসিত সরকারের পার্থক্যকে অস্বীকার করার অর্থ কংগ্রেসী সরকারের সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারকে এক করে দেখা, তারা জনগণের শত্রুদেরই সহায়তা করছে।

সরকার চালানোর জন্য বামফ্রন্ট ইন্দিরার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে এটা বামফ্রন্টের কথা নেওয়া, যা ইন্দিরা গান্ধীকে সার্টিফিকেট দেওয়া যে, শ্রীমতী গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এত গণতান্ত্রিক পরিবেশ রাখতে চান। স্বৈরতন্ত্রীকে গণতন্ত্রী বানাবার এ এক অদ্ভুত চেষ্টা। জনগণের সংগঠিত শক্তিই বামফ্রন্টের রক্ষাকবচ। কারণ জন-গণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ চায়, সেইজন্য চায় বামফ্রন্ট সরকারকে, সেটা শ্রীমতী গান্ধীর দান।

বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেসী সরকারকে এক করে দেখার কিছু কেউ বলেছে বৈকি। যেমন ভূমি সংস্কার সম্পূর্ণ হয়নি, যেমন পুঁজিপতিদের শোষণ বন্ধ হয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি। বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে যা দিয়েছে, তা-ই এর জবাব। অর্থাৎ আমূল কোন পরিবর্তন বা মৌলিক সমস্যার কোন সমাধান বামফ্রন্ট সরকার করতে পারবে না। এখানেও পার্থক্য হল, কংগ্রেস জনগণকে এই সত্য কথাটুকুও বলে না যে, মৌলিক সমস্যার

সমাধান কংগ্রেসের দ্বারা হবে না, তাকে রেখে তাদের দেশে ইন্দিরা কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা তুলিয়ে থাকা সত্ত্বেও, সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও।

বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে সমাধানের প্রতিষ্ঠা করবে, এই আশা কেউ করে থাকলে তিনি মূর্খ। তবে বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য বিরাট বড় হবেও এতে কি কেউ সন্দেহ? বসু মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তিনি এতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট নন। কারণ জনগণের ও তাদের সমস্যার কোন শেষ নেই, সন্তুষ্টিরও কোন সীমারেখা নেই।

বামপন্থী আন্দোলনের অনেক ভক্ত-অনুরাগীর এই প্রচারে বিভ্রান্ত হওয়ার মূলে দুশ্চিন্তার কারণ। বাঙালি সাম্রাজ্যবাদের খোলাখুলি সমর্থক, বহু কমিউনিস্ট বিরোধী, দেশের সমস্ত ধনী প্রতিক্রিয়াশীলদের খাঁটি সহযোগী, ইন্দিরা কংগ্রেসের সেবক-ভক্ত দুখন্ত আনন্দবাজার পত্রিকা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যত রকম কুৎসিত চক্রান্ত করা যায় করে যাচ্ছে। সত্যতা, ভব্যতা, লাজ লজ্জা, সামাজিক মূল্যবোধ, সাংবাদিক আচার আচরণ সব কিছু বিসর্জন দিয়ে এরা দুর্নাম রটিয়েছে। কিন্তু তথাকথিত বামপন্থীদের প্রচার আর আনন্দবাজারের প্রচারে একটা জায়গায় মিল রয়েছে। কেউ প্রকাশ্যে কেউ বা প্রচ্ছন্ন ভাবে এই প্রচারকে শক্ত করার চেষ্টা করছে। উদ্দেশ্য একই সি পি আই (এম)-এর প্রতিরোধ। শত্রুরা যখন এত আক্রমণ করছে, তখন ধরে নেওয়া যায় সি পি আই (এম) ঠিক পথেই চলছে।

তবে এর মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার সমালোচনাকে গ্রাহ্য করছে না, এটাও ঠিক নয়। সমালোচনা সবসময়ই থাকে, বামফ্রন্ট কমিটিতে তা আলোচনা করা হচ্ছে, সংশোধন করার চেষ্টা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও সমালোচনা কিছু নিশ্চয়ই থাকতে পারে, কিন্তু সংশোধনের প্রচেষ্টা ও বাস্তবিক সাফল্যের আলোকে সেই সমালোচনার অংশের বিচার করতে হবে। কোথায় কোন্ অফিসার নিয়োগ হল, কোন্ সরকারী দাবি ডিরেক্টরের জায়গায় পাঠানো গেল, কোন্ মন্ত্রী বলে পর্যন্ত দশ টাকার মাল কিনে দশের টাকায় কিনল, কোন্ মন্ত্রী পাশ করে না পেলে কোন্ দিন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গেল, কোন্ চিঠির উত্তর যেতে দু বছর দেরি হল, কোন্ অফিসে দুই মন্ত্রীর দুই মত থাকল—এগুলো মধ্যেই সমালোচনা সীমাবদ্ধ; বৃহৎ পরিকল্পনায় এর বাইরে বামফ্রন্টের সাফল্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

আরেকটা সমালোচনা শুনিয়ে তোলার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে যে, সি পি আই (এম) সমর্থকরা চাকরি পেল কেন, তারা টিকিট পেল কেন, বিভিন্ন সরকারী কমিটিতে সি পি আই (এম)-এর সমর্থক থাকবে কেন ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ সি পি আই (এম)-এর সমর্থক জনগণের যেন কোন অধিকারই নেই চাকরি পাবার, টিকিট পাবার; মুখ্যমন্ত্রীসহ বামফ্রন্টের এক এক জন যেমন ক্ষেত্রে নির্বাচিত হয়েছেন সেসব ক্ষেত্রে কোন ট্রাইব্যুনাল, স্কুল, হাসপাতাল হতে পারবে না, ইন্দিরা কংগ্রেস ও জনতা এর এক আমলেই সব করতে হবে—এটাই যেন দাবি সকলের। পুলিশ অফিসারের কার হওয়া উচিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কার হওয়া উচিত, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিব কার হওয়া উচিত, এ বিষয়ে তো আনন্দবাজার পত্রিকার নিজস্ব একটা তালিকা আছে, কোন মন্ত্রী কী দপ্তর পাওয়া উচিত, তারা তারও উল্লেখ করেছে। আকারে-ইঙ্গিতে এই ভাবধারাও তারা প্রচার করতে দ্বিধা বোধ করেনি যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিত্বের জন্য একমাত্র যোগ্য লোক বরুণ সেনগুপ্ত। তাদের মতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতে পারেন, জীবন দাস ও শিল্পমন্ত্রী, গৌর কিশোর ঘোষ সংস্কৃতি মন্ত্রী, আশু ঘোষ অর্থমন্ত্রী, সুভাষ মজুমদার শিক্ষামন্ত্রী, অশোক সরকার বিজ্ঞাপন-দপ্তরের মন্ত্রী—এরকম হলে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ফিরে যেত।

কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে প্রত্যেক দেশেই শত্রুরা কুৎসা ও অপপ্রচার চালায়। ভারতেও এর ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু এখানে এই প্রচারে অনেক সময় বামপন্থীদের বিভ্রান্ত হতে দেখা যায়। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রচারের কৌশলও নিত্যনতুন হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে কোন কোন কমিউনিস্ট নেতাদের সমালোচনা করা হয়, সমাজ বিকাশে বিচ্যুতির কথা বলা হয়, বামপন্থী যেমন আত্মসমালোচনা করেন, কমিউনিস্টদের সম্পর্কে সমালোচনা করতে হয়। কমিউনিস্ট পার্টির অনেক দুর্বলতা থাকতে পারে, সে ভুল বা দুর্বলতা সম্পর্কে পার্টিকে স্বীকার করে সংশোধনের চেষ্টা অব্যাহত থাকে। কিন্তু তাই বলে কমিউনিস্টদের শত্রুদের সেবা করাটা বৈপ্লবিক কাজ?

বামপন্থী, ডানপন্থী সবই এক—আসল কথা—প্রকাশ্যে এই মতাদর্শের এক ধরনের লোক দেখা যায়। এই সব সুবিধাবাদীদের অবস্থা হল, কবির কথায়—'জনগণ আর ধনিক শ্রেণীর মাঝখানেই তাদের স্থিতি—এর কোনটাই আর হাস্যকর মাঝখানে থেকে—চূর্ণ বিচূর্ণ হবার ভয় সেখানে তিনিই দিবেন।'

বাংলা ছবির ষাট বছর : সফলতা ও ব্যর্থতা

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ছবি নির্বাক যুগের সেই ১৯১৯ সালে মুক্তিলাভ করে কাহিনী-চিত্র ম্যাডান কোম্পানি প্রযোজিত ও রুস্তমজী ধোতিওয়ালা পরিচালিত 'বিল্বমঙ্গল' থেকে শুরু করে কত উত্থান পতন, কত ঝড়, সফলতা ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে পর পর ষাটটি বসন্ত অতিক্রম করে গেল। অন্য শিল্পের ইতিহাসে ষাট বছর খুব একটা দীর্ঘ সময় অবশ্যই নয়, তবু যেহেতু এটি সর্বকনিষ্ঠ শিল্প—সর্বকনিষ্ঠ শিল্পমাধ্যম হিসাবে এই বর্ধিষ্ণুর মধ্য দিয়ে যেতে যৌবন— যেহেতু এর অভাবনীয় অগ্রগতি যে যুগে, ভুলে গেলে চলবে না। সেই বিচারে এই ষাট বছর খুব কম সময়ও নয়।

নির্বাক বাংলা ছবির সাক্ষাৎ পাওয়ার সম্ভাবনা আজ আর নেই। তবে কেউ যদি সেই সেকেলে আদ্যিকালের ছবি ফিরে ফিরে তাকান, তবে দেখতে পাবেন ছবির সেই শৈশব দশাতেই অনেক সময় অভিনিবেশের (আজকের দৃষ্টিতে) অভাবের মধ্যেও বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে পৌরাণিক ও আরবী কাহিনীর অনেক প্রচলিত উপাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে। সে যুগের বাস্তব কাহিনীর কিছু কিছু খণ্ডিত মুহূর্তে দুর্লভ দৃশ্য পর্দায় দেখা গেছে, যা আজকের ছবিতে বিরল এবং বড় বিস্ময়ের ব্যাপার।

নির্বাক যুগের বাংলা সবাক ছবির পর্যালোচনা করলেও দেখতে পাব বিস্ময়ের সঙ্গে—অভিনয়ে অনুরূপ ছবির ভিতরে এক একটি ছবি কি অসাধারণ গুণ সাফল্যের দ্যুতি দিয়ে চিহ্নিত হয়েছে। প্রথম যুগে বাংলা ছবি গড়েছেন ধীরেন গাঙ্গুলী, অনাদি বসু, নীতিন লাহিড়ী, দেবকী বোস, জ্যোতিষ সরকার প্রমুখের অবদান অনস্বীকার্য। বীরেন্দ্রনাথ সরকার নিউ থিয়েটার্স কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে সত্যিকারের বাংলা ছবির স্বর্ণযুগের ইতিহাস সৃষ্টি করেন। সে সময় ভাগ্যবন্তী শিল্পীগণ, যারা ছিলেন, আলো ছিলেন, সাইকেলিস্ট ছিলেন ইত্যাদি সংযোগ দক্ষিণ ছিল সন্তোষজনক। চৌকষ টেকনিক ছিল অবিশ্বাস্য অর্থবহ। সে যুগে টেকনিক্যালি ছবির প্রযোজনা কম, আজকের মত তবু তাড়া খাটেনা। প্রতিটি টুকিটাকি ছিল নিখুঁত নিপুণ ইঙ্গিত। দাদিক সাহিত্যিক শিল্পী কলাকুশলীরা নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করতেন। আজকের মত দীর্ঘবছরের নিছক ভেঁড়া আত্মপ্রচারের অবস্থা ছিলনা। আত্মপ্রচার আন্দোলনে অবনত ছিলনা তখন চিত্রলোক।

এদেশে ১৯৩১ সাল থেকে বাংলা ছবি সবাক হতে শুরু করেছে এবং ১৯৩২ সালেই দেবকী বসু নিউ থিয়েটার্সের হয়ে 'চণ্ডীদাস' ছবিটি উপহার দিয়ে সাড়াজাগানো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। অনবদ্য সঙ্গীতময় ও মনোজ্ঞ ছবিটির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করে দেবকীবাবু চমৎকৃত হন। সবাকের অগ্রগতিতে প্রতি উৎকর্ষ দিয়ে সবাকের মাধ্যমে ও সংযোগ এবং নির্ভুল শব্দগ্রহণের তীব্র অভিনয় ছবিটিকে সে যুগেই যেমন করে মহিমায় চিহ্নিত করেছিল, তেমনি আঙ্গিক পারিপাট্যে তা বর্ণনীয় ছিল। ১৯৩৫ সালে প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস' ছবিটি নিউ থিয়েটার্সের গৌরবকে আরও উচ্চ দিয়েছিল, তা নয়, ভারতীয় চলচ্চিত্রে যুগান্তর এনে দিল। প্রেমের তীব্র আবেগ ও বিরহ দুঃখ সেলুলয়েডের ফ্রেমে ফ্রেমে যে ভাব ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছিল সবাক ছবির শুরুর চার বছরের মধ্যেই, তা আজ প্রবুদ্ধ দর্শকদের দৃষ্টি বিস্ময়ই করে। প্রত্যক্ষ বিচারে পরোক্ষ ইঙ্গিত মাধ্যমে ছবিতে তুলে প্রতীকী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা বড়ুয়া পরিচালনার সর্বাধিক অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এ ছবিতে তা নতুন করে মাত্রা দিয়েছেই। সে যুগে প্রমথেশ বেশ কিছু পাশ্চাত্য টেকনিক ভারতীয় পর্দায় প্রথম প্রয়োগ করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। 'ডাকসেবা' ছবিতে ফ্ল্যাশব্যাক, 'দেবদাস'-এ ইন্টারকাট টেলিপ্যাথিক শটের প্রয়োগ, 'গৃহদাহ' ছবিতে দিবাস্বপ্ন শট, 'মুক্তি'তে বর্ডার নিয়েছেন, 'অধিকার'-এ ডুয়াল ইমোশনের শট, 'রজত জয়ন্তী'তে সাবজেক্টিভ ক্যামেরার কাজও উল্লেখ্য হয়ে আছে। 'মুক্তি' ছবির মাধ্যমেই চলচ্চিত্রে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে। ধনী নির্ধনের বৈষম্য ও সামাজিক ব্যবধানের প্রসঙ্গ তুলে 'অধিকার' ছবিটি সেই দিন জনকে হয়েছে প্রগতিশীলতার দাবী রেখেছিল।

দেবকী বসু নিউ থিয়েটার্স ছাড়াও 'চণ্ডীদাস' ছাড়াও নির্মাণ করেছেন 'মীরাবাঈ', 'বিদ্যাপতি,' 'সাপুড়ে'র মত চমৎকার

ভাবাবেগী ছবি। নীতিন বসুর এক পরিচালনায় 'ভাগ্যচক্র', 'দিদি', 'জীবন মরণ', 'পরিচয়', 'দেশের মাটি', প্রভৃতি ছবির শব্দ আবেদনে স্মরণীয়। 'জীবন মরণ' ছবিতেই প্রথম স্থির চিত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মধু বসুর 'আলিবাবা', 'অভিনয়', 'রাজনর্তকী' ছবি ছিল স্মরণীয়। প্রমথেশ বড়ুয়ার সহকারী চারুদের মধ্যে সুশীল মজুমদারকৃত [illegible] অবলম্বনে '[illegible]', বিমল রায়ের 'উদয়ের পথে', 'অঞ্জনগড়', '[illegible]', ফণী মজুমদার পরিচালিত 'সাথী', 'ডাক্তার', নীরেন লাহিড়ীর 'ভাবীকাল', সৌমেন মুখোপাধ্যায়ের '[illegible]' প্রভৃতি ছবি উল্লেখের দাবী রাখে। [illegible] সূচনার ও পরিচালক তুলসী লাহিড়ী অনেক ছবি বানালেও [illegible] একটি মাত্র [illegible] প্রেমমূলক ছবি তৈরী করেছিলেন, যার নাম '[illegible]' এবং সে ছবিতেই প্রথম লক্ষ্য করি আমাদের [illegible] সংলাপ, যা আজ বিরল হয়ে আছে। দেবেন মিত্রের 'মধ্যরাত', নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল', দেবেন বসুর 'ভুলি নাই', সুধীর মুখার্জীর 'বাঁধের জেলা' প্রভৃতি ছবিও সুদের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশংসনীয়। কিন্তু সেকালে আরও যত ছবিই তো হয়েছিল, হারিয়ে গেল সবই অপদার্থ পরিচালনার গুণে।

'চণ্ডীদাস' ছবিতে প্রথম আবহ সঙ্গীত প্রয়োগ হয় এবং 'ভাগ্যচক্র' ছবিতে প্রথম নেপথ্য প্রথার প্রবর্তন। প্রথমে মুকুন্দ [illegible] ব্যাপারের অবদান এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেকালের ছবিতে প্রমথেশ বড়ুয়ার অভিনয় ছিল যেমন চলচ্চিত্রধর্মী স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, তেমনি দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় ছিল নাটকীয় মঞ্চ বিশিষ্ট। নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ী নিজে সচল হলেও 'টকী অব টকীজ' ছবিতে উল্লেখ্য অভিনয় করেছিলেন। নট-

সূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী ও নটশেখর নরেশ মিত্র চিত্রাভিনয়ে স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন। বাণীচিত্রের [illegible] সাহিত্যে তাঁর নাটকীয় ভঙ্গী দিয়েই ছবির অভিনয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। ছবি বিশ্বাস, কানন গাঙ্গুলী, তুলসী চক্রবর্তী, জহর গাঙ্গুলী, পাহাড়ী সান্যাল, অহর [illegible] প্রমুখ শিল্পী যে যুগের ছবিতে অভিনয় করিয়ে দেখিয়েছেন তা অতুলনীয়। প্রকৃতপক্ষে, নায়ক ও নায়িকাদের [illegible] কিন্তু [illegible] কানন দেবী, [illegible], উমাশশী ও কানন দেবী ছিলেন সেযুগের ছবির সেরা নায়িকা। চন্দ্রাবতী, নিভাননী, মলিনা, রেণুকা দেবীর অভিনয়ও কিছু কমতে উল্লেখযোগ্য ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক মূল্যবোধের যে রূপান্তর ঘটে, তার ছাপ চলচ্চিত্র জগতেও এসে পড়ে। ফলে যেকোন রুচি পড়ে গোটা ছবির জগৎটাকে বলে দেখলে দুর্বলী। তাতে প্রচুর কালোটাকা দিয়ে দেশ কিছু বড়লোক লোক ছবির ব্যবসাতে নামল, নানা রকম করে তাদের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হল ছবির পরিচালনায় যোগে পড়ল। এইভাবে বাংলা ছবির দুর্দিনের দেখা দিল চরম রূপে দশা—অপদার্থ ছবির সংখ্যা বাড়তে লাগল। 'চিত্রা রহিমার' মার্কা ছবির দিকে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের চিতাই বুঝি রচনা হচ্ছিল! তারই মধ্যে দু একটি ছবি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হলেও, সঠিক কথায় অবাঞ্ছিত আগাছায় ভরে গেল বাংলা ছবির বাজার—যার ফল হল শোচনীয়। অবশ্য ছবিগুলি বাজার মাত করল, ব্যবসাতে দেখা দিল জোয়ার জোয়ার মন্দাবস্থা। স্টুডিওগুলির ক্রমশঃ ঝাঁপ দুয়ে পড়তে লাগল এক এক। যে স্টুডিওগুলি থেকে একদা বাংলা ছিলি [illegible] জোরাবী ছবি তৈরী হয়ে সারাভারত

ছাড়িয়ে আসাম, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ থেকে প্রযোজকরা ছবি করতে এখানে ছুটে আসতেন—সেই স্টুডিওগুলির হল বেহাল অবস্থা!

দেশে স্বাধীনতা এল, দেশ বিভক্ত। আর এক অভাবের অবস্থার সৃষ্টি হল। বাংলা ছবির বাজার হল সংকীর্ণ। ব্যবসাতে প্রচুর আঘাত পড়ায় স্টুডিওগুলি অর্থহীন হয়ে পড়ল—বন্ধ হয়ে গেল নিউথিয়েটার্সের কোম্পানি। ছবি নির্মাণের উৎসাহে পড়ল ভাটা।

১৯৫২ সালে কলকাতায় প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব। ইতালী, জাপান ও আমেরিকার নতুন আঙ্গিকের ছবিগুলি এদেশের চলচ্চিত্র জগতে এক আলোড়ন নিয়ে আসে। মহারাজের ছবিগুলি এদেশের তরুণ চিত্রশিল্পীদের মনে নতুন উৎসাহের সঞ্চার করে। সত্যজিৎ রায় তাঁর 'পথের পাঁচালী' ছবিটি সেই সময়েই এদেশে তৈরী করেন। তাঁর সম্পূর্ণ এদেশ কিছু উৎসাহী তরুণ নতুন দেশের পথ। এঁদের পরিকল্পিত ও সঙ্কুচিত সৃষ্টি হয় দিয়েই আমরা দেখেছি সত্যজিৎ রায়ের হাত থেকে ১৯৫৫ সালে অনবদ্য সৃষ্টি 'পথের পাঁচালী'। অবশ্য ১৯৫২ সালে ঋত্বিক ঘটক প্রথম ছবি 'নাগরিক' নির্মাণ করেন নতুন উদ্দীপনায়। ছবিটি সে সময় কিন্তু মুক্তিলাভ করতে পারেনি। মুক্তি পেয়েছিল যখন সত্যর দশকের শেষ দিকে, তখন সেই জীর্ণ ফিল্মের প্রিন্টটি দর্শক দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন—পঁচিশ বছর আগে বাংলা ছবির বাস্তবতা নির্মাতা ও অভিনয়াদির কি অনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীতে মুক্তির ভূমিকা নিয়েছিলেন সিনেমাটির বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গীর বিপুলতায়। 'পথের পাঁচালী'র পূর্বে 'নাগরিক' মুক্তি পেলে ছবিটি নিশ্চয়ই মহত্তরের অধিকারকে স্পষ্ট চিহ্নিত করতে পারত। কিন্তু তা হয়নি—'পথের পাঁচালী' এ দেশের

মাটিতে রোমান্টিক শৌখিনতা প্রচার নবযুগের সূচনা করে অভিনব সৃষ্টি পৌঁছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের যে কাহিনী ছেড়ে, সেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সত্যজিৎ রায়কে আকৃষ্ট করেছিল। বাংলা সাহিত্যে যে বিস্তার ঘটনা ও অকৃত্রিমতা, তা তাঁর শিল্পী মানসিকতার পরিপন্থী। তিনি তৈরী করলেন 'অপু ট্রিলজি' —'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসার'। এ দেশের ছবি জগতে এল নবযুগের জোয়ার। আন্তর্জাতিক সম্মানে ও স্বীকৃতিতে ভরে তিনি হলেন বিখ্যাত। ইতিমধ্যে ঋত্বিক ঘটক অনাড়ম্বর ছবি 'অযান্ত্রিক' তৈরী করে ফেলেছেন। তাদের সমকালে, তরফদার, তপন গুহঠাকুরতা, এ. সি. গাঙ্গুলী, হরিসাধন দাশগুপ্ত, সন্দীপ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত প্রভৃতি নতুন ধারার ছবির পরিচালনায় নেমে পড়লেন। তপন সিংহ ও মৃণাল সেন আগেই ছবির জগতে এসেছিলেন। নতুন আবহাওয়ায় তাঁরা হলেন নতুনভাবে অনুপ্রাণিত। সত্যজিতের সৃষ্টিকর্ম অব্যাহত গতিতে চলল।

'জলসাঘর', 'দেবী' 'পরশপাথর', 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ', 'অতিথি', তিন কন্যা, 'একই অঙ্গে এত রূপ', 'তেরো নদীর পারে', 'নিমন্ত্রণ', 'অতিথি', 'কাবুলিওয়ালা,' 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'বাইশে শ্রাবণ', 'প্রতিনিধি' প্রভৃতি ছবিকে নবযুগের স্বাক্ষর হিসেবে উল্লেখ করা যায়। সত্যজিতের 'অভিযান', 'মহানগর', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'অভিযান' 'চারুলতা', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' প্রভৃতি ছবি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'সুবর্ণরেখা', 'তিতাস একটি নদীর নাম' ও 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' ছবিতে বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর বাংলা ও বাঙালীর বিস্ময়কর চিত্রণ আমরা লক্ষ্য করি। ছবির বক্তব্য যেমন জীবন মুখী, সামাজিক অবক্ষয়ের অভিজ্ঞ সমস্যা তুলে তেমনি দর্শকের কাছে প্রশ্নবাণী।

পঞ্চাশ দশকের মধ্য পথে সত্যজিতের আবির্ভাবকে অনেকে আকস্মিক ও অভাবনীয় বলে মনে করেন। কিন্তু অতীত ঐতিহ্যবাহী চিত্রজগতের বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরা সেই আবির্ভাব-সম্পূর্ণ ব্যাপারকে আকস্মিক বলে মেনে নেবেন না। মনে করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে যে, একদা রেনোয়া নতুন ছবিতে যে শৈল্পিক ও ভাব মাধুর্যের আস্বাদ পাওয়া গিয়েছিল, তারই পরিণত রূপ ঘটেছে পরবর্তীকালের অনুকূল পরিবেশের জন্য তৈরী সত্যজিতের ছবিতে। এবং প্রথমেই 'উদয়ের পথে' ছবির যে গভীর জাতীয় চেতনা বাস্তবতা ও অনুভব, পরের যুগে তাই অভিজাত ছবিতে পূর্ণ মৌলিকতায় প্রকাশ পেয়েছিল। সৃষ্টিকর্মের ধারাবাহিকতা থাকে—কখনো সেটা বাঁক নেয় নতুন দিকে উজ্জ্বল নিশানায়। দু'ই-কোণ কেউ নয়।

সত্যজিৎ যেহেতু রোমান্টিক চলচ্চিত্রকার, সেইহেতু তিনি যখন সমকালকে ছবির মাধ্যমে তুলে ধরায় প্রয়াসী হন 'অরণ্যের দিন রাত্রি' 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'সীমাবদ্ধ' 'জন অরণ্য' প্রভৃতি ছবি করেন, তখন তিনি জীবন বিমুখ প্রগতি বিরোধী চিন্তার শিকার হয়ে পড়েন। ছবিগুলির আংশিক পরিপাট্য বর্ণনীয় হলেও বিষয়বস্তুতে সমাজ সচেতন সঠিক দৃষ্টিকোণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। নির্দিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তার ধারা না থাকার ফলে প্রধান যেমন ছাব-বৈশিষ্ট্য ছবিগুলি সৃষ্টি করার গোলমাল নষ্ট করে, ফিরে প্রভাব দৃষ্টিতে তুলতে পারে না।

সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী' ছবি থেকে নবযুগের যে সূচনা হল, তা আজ ব্যর্থ বলেই মনে হয়। নতুন উৎসাহে যাঁরা ছবি করতে নেমেছিলেন, কিন্তু তাঁদের সৃষ্টি উপহার দিতে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা যেমন যেন বিভ্রান্ত ও হতোদ্যম হয়ে পড়লেন। কেউ কেউ চিত্র পরিচালনা থেকে বিদায়ও নিলেন। আজ যেন মনে হয় সেটা ছিল ক্ষণিকের উত্তেজনা। সত্যজিৎ নব কোন ধারার প্রবর্তন করতে পারেন নি। সৃষ্টি করতে পারেন নি বাংলা ছবির ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব। তাই দেখি, বেশীর ভাগই অধিকাংশ বাংলা ছবি তৈরী হয়ে চলেছে, যেখানে নেই কোন জীবনের যোগ, নেই কোন শিল্পকলার স্পর্শও। আবার তারই মধ্যে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করি, এক একটি উৎসাহী তরুণ নতুন আঙ্গিকের বাস্তবধর্মী ছবি করতে এগিয়ে আসছেন। তাঁদের মধ্যেই কেউ হয়তো নতুন ধারায় বাংলা ছবির পরিচয় হয়ে দেখা দেবেন। তখন হয়তো আরও বেশী সংখ্যায় বাংলা ছবি জীবনের স্পন্দন পেয়ে সজীব হয়ে উঠবে। অনেক ব্যর্থতা ও কিছু সফলতার এই যাত্রাটি বহুর আমাদেরকে করেছে কখনো বেদনাহত, কখনো বা হর্ষোৎফুল্ল। বিদেশের মহলে বাংলা ছবি সমাদৃত ও পুরস্কৃত হলেও প্রাচীনের মোহে অন্ধকারের মধ্যেই বাংলা ছবির অগ্রগতি আজ অবরুদ্ধ। আলোর ঝলক সেখানে এখনো দেখা নেই। আশা করা যায়, অভিজ্ঞতার পথের দিকে বাংলা ছবি দিক ফিরিয়েই নতুন পরিচয়ে দীপ্ত হয়ে উঠবে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে, পর্ষদ প্রকাশিত

কয়েকটি বাংলা বই

১। প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস / ডঃ রেবতীমোহন লাহিড়ী / ২১'০০

২। ফরাসী বিপ্লব / শ্রীপ্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী / ২১'০০

৩। পেলোপনেসীয় যুদ্ধ / শ্রীমতী রেবা সেনগুপ্ত / ২৪'০০

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা ১৩

পুজোর সময় দিনগুলি আনন্দমুখী হলেও কলকাতা পুরসভার মত সংস্থার কাছে এই সময়টা নিরানন্দকর কয়েকটি কথাও চিন্তা করে।

এটা পুরসভার চিন্তার বিষয় নয়, কর্তব্যের বোঝা। এই চিন্তাগুলির মধ্যে এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যার মূল রয়েছে নাগরিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ পুজো উপলক্ষে রাস্তাঘাটে ভিড় বাড়ে, হকারের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং হঠাৎ যেন জঞ্জালের পরিমাণটাও বেড়ে যায়। তাছাড়া আছে অধিক বিদ্যুতের চাহিদা, অধিক জলের প্রয়োজন এবং নাগরিকদের কাছ থেকে অধিক সহযোগ দাবী পাওয়া।

এর মধ্যে পুজোর প্যাণ্ডেল তৈরী করবার জন্য রাস্তা খোঁড়া বা অবরোধের কথা না মানলেও পুজোর সময় নগর জীবনের সমস্যাটা পুরসভার কাছে অনেক বেড়ে যায়। সেইজন্য এই আনন্দের দিনকটিতে যাতে পুরসেবার ভূমিকাটি আমরা সঠিকভাবে পালন করতে পারি, সেজন্য আমাদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যাচ্ছে। আমরা তাতে অপ্রস্তুত নই। তবে সঙ্গে সঙ্গে একটা নিবেদনও করতে চাই।

প্রয়োজনের তুলনায় যেন অ-প্রয়োজনীয় কাজ বেশী না হয়ে পড়ে। শৃঙ্খলা যেন একটু বেশী থাকে। না হলে আনন্দের দিন এমনিতেই একটু ম্লান হয়ে যায়।

কলকাতা পুরসভা কর্তৃক প্রচারিত

দুর্গাপূজোর আনন্দঘন দিনগুলি আবার এল।
অমঙ্গল আর দারিদ্র্যের হোক চির অবসান,
বিজয়ী হোক প্রগতি আর শুভচেতনা। আজকের
শুভক্ষণে জীবন বীমা নিগমের
এই একমাত্র কামনা।

ভারতীয় জীবন বীমা নিগম